প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৬৭



প্রকাশিকা / সান্ত্বনা দে, পত্রপুট, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রক / বিজয় চক্রবর্তী, মুদ্রণায়ন, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম পর্ব : ব্রুকলিন

১. শেয়ালশিকারী

ঘরের ভেতর ভ্যাপসা গরম, গরম জলের মত ভেসে আসছে দেওয়ালের গা থেকে। তিনটি জানলাই বন্ধ। দরজাও। তিনি ঘুমিয়ে, কিন্তু সে ঘুম এলোমেলো, অস্বস্তিতে ভরা। বারে বারে ভেঙে যায়, জোরে চোখ বন্ধ করেন, তন্দ্রার ঘোরে। খোঁচা খেয়ে যেন জেগে ওঠেন। চেতনাকে হার মানাতে চান, কারণ তাঁর চিরকালই ঘুম ভালো হয়। ঘুমের ঘোরে বালিশের একটা ভিজে জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গড়িয়ে যান—স্বপ্ন দেখতে দেখতে, স্মরণে আসতে আসতে, ভুলে যেতে যেতে। যে প্রশস্ত খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি নিয়ে তাঁর স্মৃতি ঠাসা সেগুলি তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

বিছানার পাশে রাতের বাতিটা যতক্ষণ কালো ঝুলের ভেতর মিটিমিটি জ্বলছিল ততক্ষণ তিনি হাতঘড়ি দেখে ঘণ্টাগুলো লক্ষ্য করতে পারছিলেন—একটা, দেড়টা, দুটো, নিশ্চয়ই পাঁচটা, ছটা বেজে দশ ; বাতি না নেবা পর্যন্ত।

সেই রাতের কোন এক সময়ে, জেগে উঠে, ভয়ে তাঁর গা হিম হয়ে এল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে নিজের সারা মুখেই গভীর বসন্তের দাগগুলোতে আশ্বাস খোঁজবার চেষ্টা করলেন। চোখ সীমাহীন অন্ধকারে খুঁজে খুঁজে কিছুই পেল না, শেষও না, কষকষে করে আঁটা জানলা দিয়ে একটুকু আলোর রেখাও না। আঙুল চলে বসন্তের দাগগুলোর ওপর দিয়ে, ছুঁয়ে যায় নাক, থুতনি, মুখমণ্ডল, কপাল আর পাতলা হয়ে আসা মাথার চুল ; ফের ফিরে আসে বসন্তের দাগগুলোতে। অন্ধকারে বাহ্য চেতনা ক্রমশঃ লুপ্ত হয়, বসন্তের দাগগুলো গভীর গর্ত, নাকটা একটা দানবীয় কিছু আর থুতনিটা একটা গোঁজ।

গড়িয়ে গিয়ে, গায়ের কম্বলখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, গোঙাতে লাগলেন, 'প্যাটসি, প্যাটসি।' তারপর তিনি মুখ গুঁজে ধরলেন ভিজে বালিশে।

উষার ধূসর আলো ঘরে ঢুকলে তাঁকে দেখা গেল—জেগে বসে আছেন আলুথালু বিছানার ওপর। লিনেনের রাত্রিবাস কুঁচকে দুমড়ে হাঁটুর ওপর উঠে এসেছে। লম্বা হাড়-বের-করা পা দুখানা বেরিয়ে রয়েছে কাক-তাড়ুয়ার

মত। ঘুম না হওয়ায় মুখখানা ফ্যাকাশে, যা বয়েস তার চেয়ে বুড়ো, অসম্ভব রোগা।

বিছানার একধারে গড়িয়ে গিয়ে, অদ্ভুত লম্বা পা দুখানা টেনে টেনে চটি জোড়াটা খুঁজতে লাগলেন এবং পায়ের আঙুলে চটির ভেতরের নরম স্পর্শ লাগতে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন, খুব দীর্ঘ মানুষের অভ্যাসগত কুঁজো ভাবটা কিছুক্ষণ রইল। ধাক্কা মেরে একটা জানলা খুলে দেবার আগে তিনি আড়মোড়া ভেঙে একবার হাই তুললেন। বাইরের হাওয়াটা ভেতরের চেয়ে একটু বেশি ঠাণ্ডা। বুক ভরে নিশ্বাস নিলেন। এখনও সকালের অর্ধস্ফুট আলো। এখনও বলা যায় না দিনের আবহাওয়া ভালো থাকবে কি মন্দ থাকবে। নীল আকাশ থাকবে মাথার ওপরে, না, ক্রুদ্ধ মেঘ। তবে নিউ ইয়র্ক শহরের অবদান যে বিশ্রী ভ্যাপসা গরম সেটা থাকবেই। এ রকমটি আর এখানে কোথাও নেই।

জানলায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তিনি আপন মনে বললেন, 'বৃষ্টি হবে।' পূব দিক থেকে, অতি মৃদু হলেও ক্রুদ্ধ ঝোড়ো মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি আসছে। এত ঘুম পাচ্ছে যে, প্রকাণ্ড হাত দুখানা দিয়ে চোখ কচলে, বিছানার চারপাশে পা টেনে টেনে চলে, লম্বা সরু পা-ওয়ালা চেয়ারখানায় বসে তিনি শুধু ভাবতে থাকেন ঝড়ের মেঘ, বৃষ্টি, কাদা, এইসব।

তিনি বসে থাকতে থাকতেই বাজ পড়ার শব্দ, কিন্তু অন্যরকম, থেকে থেকে কট কট শব্দ—বৃষ্টির নয়, ধ্বংসের পূর্বাভাস। প্রকাণ্ড লোকটি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে জানলার দিকে গড়িয়ে গেলেন। পা থেকে খসে গেল পশমী চটি। জানলার বাইরে হেলে পড়ে তিনি ডেকে উঠলেন, 'বিলি! বিলি! বিলি!'

তাঁর গলার আওয়াজ খুব জোরালো না হলেও সেটা বেতের ঘায়ের মত তীক্ষ্ণ। রাত্রিবাসটা মাথার ওপর তুলে, উলঙ্গ অবস্থাতেই ঘরে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন, 'বিলি' 'বিলি' করে।

দেহখানি হাড়ের ওপর শুধু চামড়া জড়ানো; চওড়া কাঁধ, আরও চওড়া দাবনা। পোশাক তাঁর জীর্ণতাকে ঢাকে; প্রকাণ্ড দেহখানাকে দেখে মনে হয় খুব শক্তি আছে। একটা নিগ্রো ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকতেই প্রথম হুকুম এল কাপড়-জামার।

নিগ্রোটার সাহায্যে জামা-কাপড় পরতে পরতে তিনি হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলেন। বিছানার প্রান্তে বসে মোজা, ঘি রঙের চোগা, কালো উঁচু বুট টেনে পরতে থাকেন; আর জামা-জুতো পরতে পরতে তিনি এক অন্যরকম

মানুষ হয়ে যান—দৃঢ়তর, বিজ্ঞতর, আরও বিশাল। হাড়ের প্রকাণ্ড গাঁট-গুলো যেমন যেমন কাপড়-জামার তলায় ঢাকা পড়তে লাগল অমনি তাঁর চামড়া-সার শরীর আরও মানুষের মত হয়ে উঠতে থাকল। লাল পাতলা চুল আঁচড়ে মাথার পেছনে সটান টেনে দেওয়া হল। নিদ্রাহীন রাতের স্মৃতি শুধু রইল ক্লান্ত ধূসর চোখ দুটোতে লেগে।

চীনেমাটির গামলায় হাত মুখ ধুয়ে পরলেন নীল রঙের কোট। এখন যদি তাঁর কানে গুড়গুড় করে বাজের আওয়াজ আসে তাহলে শঙ্কা-ভয় ইত্যাদি যা জাগবে তা তাঁর পোশাকের নীচেই ভয়-বন্দী হয়ে থাকবে।

'কামাবেন নাকি, কত্তা?'

'পরে।'

'দুজন ভদ্দরলোক অপেক্ষা করছেন।'

'কতক্ষণ? ডেকে তুলিসনি কেন, বিলি? এতটুকু বুদ্ধি কি তোর নেই?'

'এই কয়েক মিনিট হল।'

'কয়েক মিনিট মানে কতক্ষণ, বিলি? দিনকের দিন তোর বুদ্ধি কমে যাচ্ছে।'

'মিনিট পাঁচেক হবে, কত্তা।'

মস্ত, হাড়-সর্বস্ব, একটু ঝুঁকে-পড়া, ঘিয়ে আর নীল ইউনিফর্ম-পরা লোকটি শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যে ঘরটিকে তিনি অফিস বলতেন সেই ঘরে ঢুকে, বেশ চেষ্টা করেই কাঁধ দুটো পেছনে ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

প্রায় এক বছরের কিছু বেশী হল এই ঘিয়ে-নীল ইউনিফর্ম ফিলাডেল-ফিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। একটা লম্বা, ঢ্যাঙা লোক, মুখখানা লম্বা, একটু লাজুক কিন্তু পোশাকে দুরস্ত, দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসে যোগ দিলেন ঐ ঘিয়ে-নীল ইউনিফর্ম জড়িয়েই, এবং গভীরতম নিস্তব্ধতার আংরাখা পরে। তিনি বসেই রইলেন, বসেই রইলেন, একটিবারও একটি কথা না বলে। তাঁর কথা না বলাটাই কেমন যেন দেহ নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল; অন্যেরা প্রত্যেকে কথা বলতে চেয়েছিল এবং কথা বলেওছিল। সব নড়ে উঠেছে; বিপ্লব শুরু; পৃথিবীটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে; টুকরোগুলো গুছিয়ে নিতে হচ্ছে। একজন ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে একটি বিনীত, কর্তব্য-সচেতন আবেদন করবার কথা বলতেই জন অ্যাডাম্‌স্‌ গর্জন ক'রে উঠলেন, 'আঃ, নির্বোধগুলো সব! নির্বোধগুলো! উচ্ছন্নে-যাওয়া

হাঁদার দল—আবেদনের কথা বলে !'

আর কথার এই লক্ষ্যহীন তুফানের মধ্যে ঘিয়ে-নীল ইউনিফর্ম পরা লম্বা লোকটি কিছুই বললেন না, শুনলেন সবই, এবং নিজের পরিহাসে ভরা ধূসর চোখ দুটোকে নিবিষ্ট করে রাখলেন সভার ওপর।

ম্যাসাচুসেটসের এক সভ্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐ লোকটি কে ?'

'কেউকেটা কেউ নয়।'

'ঐ রকম ইউনিফর্ম পরে ?'

'আঃ হাঃ ! কেউ বিশেষ নয় ; ভার্জিনিয়ার এক ক্ষেতমালিক। ওঁর নাম ওয়াশিংটন।'

'ওয়াশিংটন ?'

'ওয়াশ্-ইং-টন।'

'ও রকম নাম কে কবে শুনেছে ?'

'ঐটাই ওঁর নাম। পয়সা আছে।'

ম্যাসাচুসেটসের সভ্যটি ব্যবসায়ী। মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তাঁর মতে ঐ ইউনিফর্মটির দাম চল্লিশ পাউণ্ড, লেসের দাম তিন পাউণ্ড আর জুতো জোড়াটা চার। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখনও কথা বলেন না বুঝি ?'

'না।'

'কেবল বসে থাকেন ?'

'হ্যা।'

ম্যাসাচুসেটসের সভ্য বিবেচনা করতে লাগলেন, 'ওয়াশিংটন—।'

আর জন অ্যাডাম্‌স্ সম্পর্কিত ভাই স্যামকে বললেন, 'আমি ওঁকে পছন্দ করি।'

'কেন ?'

'উনি জানেন কেমন করে চুপ করে থাকতে হয়।'

'হয়ত ওঁর বলবার কিছু নেই,' মন্তব্য করলেন স্যাম।

'না। যাদের কিছুই বলবার নেই তারাই সব সময় বকবক করে। ঐ ওয়াশিংটন লোকটা একটি কথাও বলেনি কিন্তু ও চারটে মিলিটারি কমিটির সভাপতি। কেউ কখনও ভার্জিনিয়ার জর্জ ওয়াশিংটনের নামও শোনেনি কিন্তু তারা তাকিয়ে দেখে ইউনিফর্মের দিকে, তাকিয়ে দেখে ওর ঘাড়ের ওপর মাথার ভঙ্গী, আর শোনে ওর কত টাকা। তারপর আর না ভেবে-চিন্তে ওকে ভোটটি দিয়ে দেয়।'

স্যাম জিজ্ঞাসা করেন, 'কত টাকার মানুষ উনি ?'

'আমেরিকাতে যে যত টাকার মানুষ, উনিও সেই রকম।'

মুখ বেঁকিয়ে হেসে স্যাম বলেন, 'প্রধান সেনাপতির মত?'

'নয় কেন? দেখ না কেমন করে ইউনিফর্মটি পরেছে, কেমন করে ঘোড়ায় চাপে।'

জনগণের বিপ্লবের কথা, আবার আমেরিকাতে যে কারও মত বড়লোক হওয়ার মানেটা ভাবতে ভাবতে স্যাম অ্যাডাম্‌স্‌ ধীরে ধীরে বললেন, 'কেউ কেউ পছন্দ করবে না।'

'উত্তরের লোকেরা পছন্দ করবে না, দক্ষিণের লোকেরা করবে। উত্তর আমাদের দিকে এসে গেছে, এখন দক্ষিণের আসা দরকার, বিশেষ করে বলতে গেলে ভাজিনিয়ার।'

'আমি সেই কথাই ভাবছিলাম। মনে হচ্ছিল হ্যানককের কথা। সব শয়তানগুলোর মত সেও এই ব্যাপারটার পরিচালক হতে চায়।'

চোখ কুঁচকে জন অ্যাডাম্‌স্‌ বললেন, 'তুমিও তো হতে চাও? তাই না?'

তিক্ত স্বরে তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি ইউনিফর্ম পরতে পারি না। তবু হ্যানককের জন্যে সইতে হবে অনেক জ্বালা।'

'হোক। আমি ওয়াশিংটনকেই মনোনয়ন দেব।'

এক বছর হয়ে গেল এই দীর্ঘকায়, চুয়াল্লিশ বছরের ব্যক্তিটি মনোনীত এবং নিযুক্ত হয়েছেন। আবাদের মালিক, শিয়ালশিকারী, ক্ষেত্রী এই মানুষটি নিজেকে সেনাপতি ভাবতে এখনও বেশ বেগ পাচ্ছেন।

যে দুজন লোক তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তাদের দিকে একটু মাথা নেড়ে আপ্যায়ন জানিয়ে, কথা বলবার জন্যে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত জানালেন। তাঁরাও বিশেষ ঘুমোননি; তাঁদের চোখ লাল, মুখ অপরিচ্ছন্ন এবং কাপড়-জামা ঘামে চপচপ করছে। তাঁরা বললেন তাঁরা জেনারেল পাট্‌নামের কাছ থেকে আসছেন।

ইনি বললেন, 'বিলি, এঁদের কিছু পানীয় দে,' এবং তাঁদের বললেন, 'বসুন আপনারা। আপনারা অনেক দূর থেকে আসছেন, গরমও বেশ। বসুন।'

এরা ভয় পেয়েছিল বলে, এদের সম্পর্কে তিনি ক্ষিপ্রগতিতে যা ভেবে নিলেন তা একেবারে স্থির—এদের কোন দাম নেই। এদের মধ্যে একজন বছর আঠারো-উনিশের ছোকরা, অন্যজন দেখতে ফ্যাকাশে, বয়েস বছর তিরিশের ঘরে দুজনেই কিন্তু ভীত, ক্লান্ত এবং অপরিচ্ছন্ন। ঘরে তৈরি পুরোনো প্যান্ট আর লিনেনের শার্ট। এগুলো একসময়ে সাদা ছিল, এখন

কিন্তু কাদার মত বাদামী হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড মানুষটি ভাবলেন, 'এ কাদের দিকে তাকিয়ে আছি? একজন লেফ্‌টেনান্ট এবং ক্যাপ্টেন না একজন মেজর এবং কর্নেল!' এই সব দিয়ে তাঁর বাহিনী তৈরী। নিউ ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী। কি রকম জবরজঙ্গ। কথায় নিউ ইংল্যাণ্ডের নাকী সুর। নিজের অবজ্ঞা ঢাকা দিতে তিনি যে টেবিলে বসেছিলেন সেই টেবিলের কাঠের দানাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দৈহিক ভয় দেখলে তাঁর গা ঘৃণায় কেমন করে উঠত। তাঁর সারা জীবনের টানাপোড়েনের এটা যেন ভেতরে বাইরে জড়ানো। সব সময়েই রুগ্ন মানুষ তিনি; রুগ্ন মানুষের মৃত্যুভয় বড় অন্তরঙ্গ; ভয় তাঁর কাছে বাস্তব, ভীতিপ্রদ অন্ধকার। সেইজন্যে, আত্মবিশ্লেষণের প্রায় অনভ্যাসে, অন্যের ভয়কে তিনি ঘৃণা করতেন।

যে দুজন বার্তাবহকে জেনারেল পাট্‌নাম্ পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে ভয় এই গরম ভিজে দিনটার মতই প্রকট। নিজেদের কাহিনী বলতে বলতেই তাদের ঠোঁট থেকে ভয় ঝরে পড়ে। এরা ব্রুকলিন থেকে এসেছে।

কি করে তাঁরা এলেন?

ইনি খুঁটিনাটি জানতে চান, অসংখ্য খুঁটিনাটি তথ্য তিনি যে জুত করে বুঝতে চান, অর্থহীন খুঁটিনাটি, বিশেষ করে বিশ্বে যখন তোলপাড়—এ কথাটা বুঝতে না পেরে তাঁরা অবাক বিস্ময়ে এঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

নিজেরাই বৈঠা চালিয়ে নৌকো করে এঁরা পৌঁছেছেন; মাঝিমাল্লা খুঁজে পাননি। কমবয়স্ক ব্যক্তিটি কাঁদতে শুরু করে দিল অঝোরে। জেনারেল পাটনামের কাছ থেকে খবর নিয়ে যখন আসছে তখন একজন মাঝি আর নৌকো যে তারা পেতে পারবে—এ কথাটা অন্তত ভাবা যায়।

চেঁচিয়ে উঠলেন প্রকাণ্ড লোকটি, 'কখনকার ঘটনা? আরে হাঁদারা, শুরু হল কখন? উত্তর দাও!' ঘড়ি বের করে দেখেন ছটা বেজেছে।

কাঁদতে কাঁদতে কমবয়সী লোকটি এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করছিল যে তারা মাঝি না পেয়ে নিজেরাই বৈঠা চালিয়ে এসেছে। ফ্যাকাশে লোকটি প্রমাণ হিসেবে হাতের তালুখানি বাড়িয়ে দিয়ে ফোস্কাগুলো দেখাল। এর আগে সে কখনও নৌকো বায়নি। সে তো নাবিক ছিল না। নেমে এই সারা পথটা তারা দৌড়ে এসেছে। এই বৈঠা ঠেলাতে আর দৌড়ে মাথা খারাপ করতে সে তো বাহিনীতে নাম লেখায়নি।

শেয়ালশিকারী গর্জে ওঠেন, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে—দুজনেই বেরোও!'

তিনি টেবিলে বসেই ছিলেন। বিলি কিছু প্রাতরাশ নিয়ে এল। খোলা

জানলা দিয়ে দূর থেকে কামানের গর্জন আসতে লাগল।

মনে মনে তিনি ভাবলেন যে, ঐ দুজনের ওপর মেজাজ খারাপ করাটা ঠিক হয়নি। তাঁর মেজাজখানা যেন হেয়ারস্প্রিং-এর ওপর গরম লোহার মত—যত কিছু মনের তলায় চেপে চেপে রেখেছেন জোর করে সেই সব কিছুর ঢল নামা। একটা কিছু যেটাকে তিনি ফাঁকি দেবার, চেঁছে-ছুলে ফেলবার, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চুপ করাবার চেষ্টা করে চেপে রেখেছেন। এবং এই উত্তরাঞ্চলে এসে সৈনাপত্য গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত তিনি মনে করেছিলেন ওটাকে বশে এনে ফেলেছেন—পেছনে ছুঁড়ে ফেলে, পিটিয়ে পিটিয়ে, একেবারে শৃঙ্খলিত করেছেন।

তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ে, সৈনাপত্য নেবার আগে, শেষবারের মত নিজেকে তিনি কি করে হারিয়ে ফেলেছিলেন। মাউন্ট ভার্ণনে সেদিন নির্মেঘ উজ্জ্বল অপরাহ্ন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে। সামনে শিকারী কুকুরগুলো ছড়িয়ে রয়েছে শিকারের সন্ধানে, সে শেয়াল, হরিণ, খরগোস যাই হোক। ঘোড়ার চঞ্চল খুরের মধুর শব্দ কানে আসছে। স্নিগ্ধ বাতাসে বয়ে আনে শষ্পগন্ধ। কুকুরগুলো শিকারের গন্ধ পেলেও তিনি লাগাম কষে ধরলেন, চোখ গিয়ে পড়েছে পোটোম্যাক পাহাড়ের ওপর আকাশে উড়ন্ত এক ঝাঁক কালো পাখীর ওপর। চমৎকার স্থির ছবিটা। কিন্তু নদীতীর থেকে একটি গুলিতে দুটি পাখী বেঁকেচুরে মরে পড়ে গেল।

সেই মুহূর্তে টান-টান চামড়ার চাবুক যেন ফট করে ছিঁড়ে গেল। একটা খাড়া পাহাড়ের ওধারে, নদীর তীরে একটা ক্যানোতে বসে ঘাপটি মেরে বসে-থাকা চোর শিকারীটার ওপর তিনি রেগে ক্ষেপে গেলেন। ঘোড়াকে শেয়ালশিকারী পাহাড়ের আত্মঘাতী চড়াই-এর ওপর দিয়ে ছুটিয়ে বেগে নেমে গেলেন নদীর তীরে। ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে চোর-শিকারীর দিকে ছুটলেন। সে অবশ্য ক্যানোখানা নিয়ে তীর ছেড়ে যাবার চেষ্টা করছিল। সে এই অবিশ্বাস্য রকমের লম্বা মানুষটাকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখে বেপরোয়া হয়ে তাঁর বন্দুকের মুখোমুখি হল। শেয়ালশিকারী কিন্তু বেগে তার পাশ কাটিয়ে পাখীমারা বন্দুকটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন আর তারপর তাকে মেরে প্রায় মেরেই ফেললেন। ক্যানো থেকে তাকে টেনে বের করে, জলের মধ্যে দিয়ে তীরে তুলে নিয়ে এলেন, কুকুরে যেমন ভয়ার্ত ইঁদুরকে যন্ত্রণা দেয় সেই রকম করে সারা পথটা মারতে মারতে।

এই স্মৃতিটা সুখের নয়। চোরা শিকারীদের তিনি ঘেন্না করতেন বটে কিন্তু কাউকেই তিনি এমন ঘেন্না করতেন না যার জন্যে এমন করে রাগে

আত্মহারা হতে হবে। এই ঘটনার পরে বহুদিন মেজাজটিকে তিনি সযত্নে বশে রেখেছিলেন, এই বাহিনীতে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত। এখন মনঃস্থির করে ফেলতে হল যে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু করবার নেই। সেই সময়টি এলে তিনি ঘিয়ে-নীল ইউনিফর্ম চড়িয়ে ভার্জিনিয়ার মিলিশিয়াতে কর্ণেলের পদে যোগ দিলেন।

নিজের বাহিনীটি দেখার আগে পর্যন্ত তাঁর পদমর্যাদার গর্বটি টিকে ছিল। পদমর্যাদাই সব। মনে পড়ে স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'প্যাটসি, ওরা আমায় দিলে, সবটাই দিলে। কেন জানি না কিন্তু আমাকেই দিলে। আমাকেই—বুঝেছ?'

যোগ করলেন, 'প্যাটসি, আমি এ কাজের যোগ্য নই—তবু আমাকেই দিতে গেল কেন?'

পরে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, 'কেন, কেন?'

কিন্তু দেমাক হয়েছে। এখন আর তিনি শেয়ালশিকারী নন, অন্য কিছু। অহংকারে এত স্ফীত, শক্তিমান, এত বড় ও জ্বলজ্বলে মানুষ যে, তাঁর দিকে তাকিয়ে কারও সন্দেহ থাকে না যে, তিনিই ঠিক লোকটি, একমাত্র ব্যক্তি: কেন না দেবতার মত তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, ছ ফুট আড়াই ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত নিরাসক্ত মুখ, ঠাণ্ডা ধূসর চোখ, আর কথা বলতেন এত কম। আর ভাবখানা এমন যে, কেমন করে কোন্‌টা করতে হবে ঠিক জানেন। কিন্তু আশার অতিরিক্ত পুরস্কার পেয়ে ছোট ছেলের মত বারেবারেই নিজেকে নিজে বলেন, 'ওরা এটা দিলে আমাকে।' তখন মনে পড়ত কংগ্রেসে সেই সন্ধ্যার কথা যেদিন জন অ্যাডাম্‌স্ উঠে দাঁড়িয়ে, সেনাপতির প্রয়োজনীয় গুণাবলীর কথা বলছিলেন তখন প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছিল তিনি হ্যানককের কথা বলছেন এবং হ্যানককের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। হ্যানকক অস্বস্তিতে নড়ে নড়ে উঠে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন, অপ্রতিভ হয়ে হাসছেন অ্যাডাম্‌সের কোন খাঁসাল কথায় এবং তারপর তাঁর কথায় নিজের বড় মাথাটা সোজা করে বসেন:

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি জানি এই গুণাবলী উচ্চস্তরের কিন্তু সকলেই জানি যে, এগুলো প্রয়োজন এই বিশেষ ঝুঁকির সময়ে। কেউ কি বলবেন এ দেশে এই গুণাবলী পাওয়া যাবে না? উত্তরে আমি বলি, পাওয়া যাবে। সে লোক আপনাদের মধ্যেই একজন রয়েছেন এবং তাঁকেই এখন আমি মনোনীত করছি—ভার্জিনিয়ার জর্জ ওয়াশিংটন।'

কথাটা পড়ল একটা বোমার মত; হ্যানককের মুখখানা হঠাৎ একটা

মাংস-পিণ্ড হয়ে গেল--তাতে না আছে ভাবের প্রকাশ, না আছে প্রত্যঙ্গাদি। ভার্জিনিয়াবাসীর প্রতিক্রিয়া কিন্তু আরও ধীরে হল। তিনি হ্যানককের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই, যেন স্মৃতির মত, অস্পষ্ট রূপ-রেখাহীন নিজের নামটি উচ্চারিত হতে শুনলেন। তখনও ক্লিষ্ট হ্যানককের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তিনি কোনমতে দাঁড়িয়ে উঠে, ফিরে দাঁড়িয়ে, পা দুটোকে টেনে টেনে কক্ষ থেকে এমনভাবে নিষ্ক্রান্ত হলেন যেন বলা যায় না এমন একটা বিশ্রী কাজ করে ফেলেছেন।

বেশ পরেই, একটু একটু করে উল্লাস এল মনে।

সেটা রইল বাহিনী না দেখা পর্যন্ত। সে বাহিনীতে নিউ ইংল্যাণ্ডের সব লোকেরা বসটনে ছড়িয়ে রয়েছে ব্রিটিশদের অবরোধ করেঃ নাক খুঁটছে, ঝগড়া করছে, অভিযোগ করছে, ইয়াংকি-গলার কাঁসার মত বিশ্রী আওয়াজ।

তারপরেই তাঁর মেজাজ পিঁজে-যাওয়া পুরনো কাপড়ের মত ক্ষয়ে ক্ষয়ে একেবারে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

প্রাতরাশ খেতে খেতে উনি পাটনামের বার্তাটি পড়লেন। আজ ভোরে কোন একসময় যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এবং যুদ্ধের গতিক ভালো নয়। অবস্থা কতখানি খারাপ তা পাটনাম না বললেও যথেষ্ট খারাপই বটে। নিজের দৃষ্টির মধ্যে যেটুকু পড়ে তার বেশী তিনি দেখতে পাননি। সবকিছুই গোলমেলে কিন্তু বেশ খারাপ।

পাটনাম আরও সৈনিক চান।

ভার্জিনিয়ান মাথা নাড়লেন; এ রকমটা হল কি করে? তিনি এখানে প্রাতরাশের টেবিলে বসে কেক আর মধুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন—দেহ অনড়, ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলির মত অসহায়---আর ওদিকে ব্রুকলিনে তাঁর বাহিনী লড়ছে, তেরটি উপনিবেশ নিয়ে এই মহাদেশের জন্য প্রথম লড়াই। তিনি চুপ করে বসে - কিছু করবার নেই, ভাববার নেই, কোন সমাধান নেই ' আছে শুধু তাঁর নিজেরই তৈরি ফাঁদের বিভীষিকার ত্রাস।

বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি ছিলেন না। স্বপ্নও তিনি দেখতেন ছক-মাফিক। যে বাহিনী তাঁকে পরিচালনা করতে হবে এবং যে বাহিনী ঔপনিবেশিক স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবে সেটাকে দেখবার আগেই যে ছবি তিনি মনে মনে আঁকলেন তা হল অনেক হাজার শৃঙ্খলাবদ্ধ, ইউনিফর্ম পরা মানুষের। তারা পাক খাবে, এগিয়ে যাবে, আক্রমণ করবে, পিছু হটবে, অন্যান্য বাহিনীর মতই আক্রমণে এগুবে, গুলি ছুঁড়বে—আর তিনি নিজে

ঘিয়ে-নীল ইউনিফর্ম পরে তাদের সামনে সামনে চলবেন।

আর ঐ বসটনের বাইরে ইয়াংকিগুলোর রেজিমেন্ট প্রতি একটা ইউনিফর্ম নেই। খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমোনো ছাড়া চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে অভিযোগ করতে তারা ওস্তাদ।

তবু পাটনাম আরও বেশী ওই ইয়াংকিদেরই চান—সে তাদের যে মূল্যই হোক না কেন। এই হচ্ছে আসল জিনিস—এই হল যুদ্ধ। নদীর ওপারে, ব্রুকলিনে মানুষগুলো পরস্পরকে কাটাকাটি করছে, শাপমন্যি করছে আর মস্ত মস্ত মরচে-পড়া গাদা বন্দুক ছুঁড়ছে, আর মরছে নয়ত পালাচ্ছে। প্রাতরাশের টেবিলে বসে তাঁর কানে আসছে কামানের শব্দ, এখন আরও স্পষ্ট।

ব্রিটিশ নৌবহর বসটন শহর ছেড়ে নৌবহর নিয়ে চলে যাবার পর মস্ত ভার্জিনিয়ানটি নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত তাঁর বাহিনীকে নিয়ে এলেন। সেই সময়ে এইটিই করণীয় কাজ বলে মনে হয়েছিল। যেভাবে বসটন থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করা হল তাতে এটা প্রায় একটা বিজয়লাভ। তিনি সৈনাপত্য নেবার পর থেকে যুদ্ধ প্রায় হয়নি বললেই চলে। কিন্তু ইংরেজরা জানত না এই হাজার হাজার নিউ ইংল্যাণ্ডের চাষীরা, যারা শহরের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তারা সত্যি সত্যি সৈন্যবাহিনী কি না। যাই হোক তারা বসটনকে কিচ্ছু মূল্য না দিয়ে নৌবহর নিয়ে চলে গেল।

নিউ ইয়র্ক কিন্তু অন্য ব্যাপার। হাডসন নদীর উৎসমুখে দেউড়ির মত, সারা ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির এটি যেন চাবিকাঠি। নিউ ইয়র্ক যার হাতে আমেরিকাও তার হাতে। অন্তত শিয়ালশিকারী তাই ভেবেছিলেন। অন্যেরা অন্য রকম ভাবতেন। কেউ কেউ ভাবতেন নিউ ইয়র্ক শহর একটি মরণ ফাঁদ হয়ে উঠতে পারে। এঁরা মানচিত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন এর অবস্থানটা। কি রক্ষে করবেন এখানে? মানহাট্টান। এটা একটা আঙুলের মত লম্বা—দু দিকে একটা চওড়া নদী। সঙ্কীর্ণ দিকটা সামলাও। ইংরেজেরা নৌবহর নিয়ে নদী দিয়ে উঠে এসে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করবে, একেবারে যতখানি ইচ্ছে। লং আইল্যাণ্ড রাখবে? ওটাও একটা আঙুল ব্রিটিশদের নদীপথে আসবার জন্যে। স্ট্যাটেন দ্বীপ। একই কারণে ওটার অবস্থা আরও খারাপ।

মস্ত মানুষটি মাথা ঝাঁকালেন। কংগ্রেস তাঁর দিকে, চাইছে নগরটিকে ধরে রাখতে। সব অহংকার সত্ত্বেও তিনি নিজেকে কংগ্রেসের সেবক বলে মনে করেন। কংগ্রেসকে ভাবতে ভালো লাগে শ্রদ্ধেয় সংসদ হিসেবে, ওই

যেমন সংসদ প্রাচীন রোমে ছিল। তাঁরা যদি নগরটিকে বাঁচাতে চান, যেমন করে, যে ভাবেই হোক, বাঁচাতে হবে। তাঁর সৈনিক সংখ্যা বিশ হাজার। তারা বেশির ভাগই ইয়াংকি, নোংরা, অগোছালো একটা মিলিশিয়া। নিউ ইয়র্কের দিকে এগোবার সময় তারা লক্ষ্যহীনভাবে মাইলের পর মাইল পথের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল। তবু বিশ হাজার লোক তো আছে এবং তাদের নিয়েই বাহিনী। আর এই এখন পাটনাম কি না আরও লোক চেয়ে পাঠিয়েছেন এবং সবটাই ভুল হিসেব করে, সবচেয়ে ভুল হিসেব করে। অর্ধেক বাহিনী রইল ব্রুকলিনে—লং আইল্যাণ্ড ঘুরে গিয়ে ব্রিটিশেরা তাদের ফাঁদে ফেলেছে; বাহিনীর আর এক অংশ এখানে নিউ ইয়র্কে, ফাঁদে পড়ার অপেক্ষায়। ঈস্ট নদী দিয়ে উজানে চলে আসতে ব্রিটিশদের যা দেরী। এসেই তারা একটা হাস্যরসাত্মক গীতিনাট্যের বিপ্লবকে শেষ করে দেবে। সেই বিপ্লব নিয়োগ করেছে এক অধিনায়ককে যিনি একজন নির্বোধ, অহংকারী, ভার্জিনিয়ার ভদ্রলোক।

২. যুদ্ধ

ওঁর অসুবিধাটা হচ্ছে এই যে, কি করে জানা যায় কোথায় ওরা আক্রমণ শুরু করবে বা কি করে করবে বা কখন করবে। তিনি তো আসলে সেনাপতি ছিলেন না, এমন কি সৈনিকও ছিলেন না। তিনি ছিলেন আবাদের মালিক আর শেয়ালশিকারী। নিউ ইয়র্কে প্রতিরোধের ব্যাপারটার সংগ্রাম-সংক্রান্ত জটিলতা তিনি ভাবতে শুরু করলেই তার অসংখ্য খুঁটিনাটি ওঁর একেবারে মাথা ঘুলিয়ে দিত; বরং পছন্দ করতেন অসংখ্য খুঁটিনাটি তথ্য যেগুলোকে নিয়ে একটা সম্পূর্ণ ঘটনা তৈরী করা যায়। এগুলোর মধ্যে থাকা চাই একটা শৃঙ্খলার সূত্র। এ ক্ষেত্রে না আছে শৃঙ্খলা, না আছে একটি কোন বিশেষ ঘটনা।

লং আইল্যাণ্ড ব্রিটিশেরা দখল করতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি বাহিনীর একটা অংশকে ব্রুকলিন পাহাড়ে মোতায়েন করলেন, সোজা মানহাট্টান থেকে নদী পার হয়ে। আবার তারা খোদ নিউ ইয়র্কই দখল করতে পারে। তার মানে বাহিনীর একাংশকে মানহাট্টানেই থাকতে হবে। অন্য এক অংশকে রাখতে হবে উত্তর মানহাট্টান রক্ষার জন্য; আবার আর এক অংশ জার্সির জন্য, এক অংশ পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য—এর তো শেষ নেই। এর মধ্যে আবার কতজন অসুখে পড়েছে? আবার প্রতিদিন পালাচ্ছে

কতজন করে ?

আগের মত তিনি আর বলতেন না যে তাঁর বাহিনীতে বিশ হাজার লোক আছে।

পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা আর আঘাত বুকে নিয়ে প্রাতরাশে হাত না দিয়েই তিনি ঘর থেকে উঠে গেলেন। হাটছেন কিন্তু শক্ত হয়ে, স্থির গতিতে। লোকে বলত, 'তাকিয়ে দেখ, লোকটা জানে ব্যাপার-স্যাপার কেমন চলছে।'

বাইরে তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে, চারদিকে দেহরক্ষী এবং অফিসারেরা দাঁড়িয়ে তাঁকে ঘিরে।

'কামানের শব্দ শুনুন, স্যর।'

'আমরা কি পার হয়ে যাব ?'

'আমার রেজিমেন্টটা, স্যর। ওটা প্রস্তুত আছে।'

'না, স্যর, আমারটা।'

আঠার-উনিশ বছরের ছোকরারা রেজিমেন্টের কথা বলে। তাঁর পক্ষে যেটা এত শক্ত সেটাও তিনি করলেন - মুচকি হাসলেন।

তিনি বিপ্লবী ছিলেন না। তাই মনে মনে বারে বারে বললেন, 'আমার দেশ, আমার দেশ, আমার দেশ।' তিনি ভাবছিলেন ক্ষেতের পাশ দিয়ে ধীর মৃদু গতিতে বয়ে-যাওয়া নদীর কথা, আর ভাবছিলেন হাতে ঠাণ্ডা ময়লা মাটির দলাটার কথা। সেটা চাষীর হাতে যেমন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় তেমনি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ত বাড়ি এবং গোলাবাড়ির কথা, গাছের কথা, ঘাসের কথা এবং অনেক শক্ত জিনিসের কথা যেগুলির ওপর তিনি পা রাখতে পারতেন। তিনি শক্ত জিনিস চান।

বিপ্লবের ব্যাপারে কঠিন, অনড় কিছু নেই। এটা পরিবর্তমান, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এর একটি মাত্রই কঠিন রূপ ওঁর চোখে পড়ে। সে হল হাজার হাজার ইয়াংকি চাষী। তাদের এনে জড়ো করতে হবে। তারা নোংরা, অপটু, খালি তামাক চিবোয় আর নাকী সুরে কথা বলে।

একটা বুলডগ যেন কিছুতে দাঁত বসিয়েছে, সাঁড়াশির মত, দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না কিছুতেই—তেমনি মাথা নেড়ে তিনি আপন মনেই বললেন, 'আমার দেশ, আমার দেশ।'

আজ সকালে ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে অগাস্ট তিনি বুঝতে পেরেছেন যে একটি মারাত্মক, মর্মান্তিক ভুল তিনি করেছেন ব্রুকলিনকে

বাঁচাতে গিয়ে। তাঁর প্রকাণ্ড, অদ্ভুত শরীরটা বটে, ভেতরটা কিন্তু কোমল, ব্যগ্র এবং তাঁর চেয়ে যারা বেশী জানে তাদের ওপর শিশুর মত বিশ্বাস করেন। আর তাদের সংখ্যা অগুণতি।

এঁদের একজন জেনারেল চার্লস লী, সৈনিক এবং জনসাধারণের চোখের মণি। তিনি জানতেন যে ভার্জিনিয়ান ভদ্রলোক সৈনিকই নন। কিন্তু লী ভাগ্যে তিক্ত, বিষণ্ণ সৈনিক। যে জীবন তাঁকে কিছুই দিল না তাকে ঘৃণা করে বিপ্লবের প্রচারযানে লাফিয়ে উঠে পড়লেন। যুক্তির দিক থেকে দেখলে তাঁরই বাহিনীর পরিচালক হওয়া উচিত। কিন্তু তিনি কুরূপ, তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি আছে। শেয়ালশিকারী কিন্তু খাসা ভদ্রলোক এবং ভাবখানা রাজকীয়। লী কপর্দকহীন আর শেয়ালশিকারী সম্ভবত সমস্ত উপনিবেশ-গুলোর মধ্যেই সবচেয়ে অর্থবান ব্যক্তি। সে যাই হোক, যুদ্ধ লড়বে যদিও এক নোংরা জনতা, পরিস্থিতির মূল কথা হল টাকা এবং লোকে শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল যে ভার্জিনিয়ান ক্ষেতমালিক এক পেনিও মাইনে নিতে অস্বীকার করেছেন।

লীর মত বিজ্ঞজনের কাছে শেয়ালশিকারী বিনীতভাবে জানতে চাইলেন নিউ ইয়র্ক নিয়ে কি করা যায়। লী উত্তর দিলেন যে তিনি ব্রুকলিন টিলা-গুলোর ওপর দুর্গ নির্মাণ করবেন।

আজ পাঁচদিন হল ব্রিটিশেরা তাদের বেশীর ভাগ জার্মান সৈন্য স্ট্যাটেন দ্বীপ থেকে লং আইল্যাণ্ডের গ্রেভস্‌এণ্ডে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। কিছু করবার শক্তি নেই বলে ভার্জিনিয়ান সেইটি শুধু লক্ষ্য করেছেন। তাঁর নৌবহরে দাঁড়-বাওয়া নৌকোর চেয়ে বড় জাহাজ তো একখানিও নেই। এইবার তিনি তাঁর কর্তব্য করলেন। বেপরোয়া হয়ে ওই তামাক-চিবোনো, নোংরা রেজিমেন্টগুলোর ছটিকে ব্রুকলিনের মরণ-ফাঁদে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর পাঁচদিন কিছুই ঘটলো না। যে নিস্তেজ ভয়টা মনের তলায় ডুবছে এবং যেটায় তিনি ভবিষ্যতে বহু দিন, বহু সপ্তাহ, বহু মাস ধরে ভুগেছেন সেইটা বুকের কাছে দলা পাকিয়ে উঠল। তিনি সত্যিকারের সেনাপতি হলে, কোন অন্ধকার রাত্রির সুযোগে সব সৈন্য মানহাট্টান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতেন; আর যদি নিজের বুদ্ধিতেই আস্থাবান কোন নির্বোধ হতেন তাহলে নদীর ওপারে ব্রিটিশদের চমৎকার ফাঁদটিতে আরও রেজি-মেন্টের পর রেজিমেন্ট পাঠাতেন। কোনটাই নন বলে তিনি বাহিনী ভাগ করেই রাখলেন, এ জায়গায় এক ভাগ, আর এক জায়গায় আর এক ভাগ। এক বেপরোয়া আশা তাঁর যে আসন্ন সর্বনাশ থেকে তিনি অলৌকিক

উপায়ে রক্ষা পাবেন।

অলৌকিক কিছুই ঘটল না।

১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে আগস্ট ভোর তিনটে নাগাদ ব্রিটিশেরা অগ্রসর হতে শুরু করল। লং আইল্যাণ্ডে ব্রিটিশদের যে বিশ হাজার সৈনিক তাদের বেশীর ভাগই জার্মান ভাড়াটে; তখনকার দিনে পৃথিবীতে সবচেয়ে সুশিক্ষিত যোদ্ধা বাহিনী এবং শ্রেষ্ঠ অধিনায়কদের দ্বারা পরিচালিত। ব্রুকলিন টিলার ওপরে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে দশ হাজারেরও কম আমেরিকার ঔপনিবেশিক। এই দশ হাজার বিশৃঙ্খল স্থানিক বাহিনীর একটিই কেবল চিন্তা—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে যেতে হবে।

জেনারেল ন্যাথানিয়েল গ্রীন, যাকে ভার্জিনিয়ান এই জায়গার অধিনায়কত্ব দিয়েছেন, তিনি প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী। গ্রীনের বয়েস মোটে তেত্রিশ, ধর্মবিশ্বাসে কোয়েকার। ভালো লোক—নেটোন এবং নির্ভরযোগ্য। বুদ্ধি আছে মাথায়। তিনি অল্পবয়স্ক, সারা বাহিনীও অল্পবয়স্ক; ছেলেমানুষ সব। জগতের লোককে দেখাতে চায় মনের স্বপ্নগুলো। কিন্তু গ্রীন অসুস্থ। মরিয়া হয়ে ভার্জিনিয়ান অধিনায়কত্ব দিলেন সুলিভ্যানকে। পরক্ষণেই সুলিভ্যানের ওপর তাঁর আস্থা প্রদীপের ক্ষীণ শিখার মত নিবে গেল। আবার হতাশায় মরিয়া হয়ে এবার আরও বেশী মরিয়া হয়ে তিনি অধিনায়কত্ব দিলেন পাটনামকে। অধিনায়কেরা ঝগড়া মারামারি আরম্ভ করতেই, সৈনিকেরাও সেই ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ল

ভার্জিনিয়ান নদীপারে সৈন্য পাঠালেন, নোংরা বিশৃঙ্খল, চড়া-গলা ইয়াংকি সব। তাদের হাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাদাবন্দুক; অধিনায়কদের সব শিশুসুলভ মুখ। এই সারাটা সময় তিনি ক্রমে উন্মাদের মত—ভয় পাছে স্ট্যাটেন দ্বীপে থেকে-যাওয়া ব্রিটিশেরা তাঁর মানহাট্টানের হ্রাস-হয়ে-যাওয়া বাহিনীকে আক্রমণ না করে।

তিনি তখনও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন যেন যুদ্ধে জয় হয়, একেবারে প্রথম যুদ্ধে, প্রধান সেনাপতি হিসেবে জর্জ ওয়াশিংটনের প্রাথমিক পরীক্ষায়। যুদ্ধ কেমন চলছে. কি ঘটছে তার কিছুটা তিনি জানতেন, তবে বেশী কিছু নয়।

জানতেন যে একটি মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে; তিনি করেননি। তাঁর নিজের ভুল অবশ্য অনেক তবে এ ভুলটা তাঁর নয়। ব্রুকলিন পর্বতমালার যুদ্ধে বারবার মার খেয়ে আমেরিকানেরা এখন স্থান নিয়েছে ছোট ছোট পাহাড়গুলোর ওপর। এগুলো স্থলের মধ্যে সঙ্কীর্ণ স্থান থেকে আরম্ভ করে

একেবারে ঈস্ট নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নীচু পাহাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে তিনটি গিরিপথ গেছে ; তার মধ্যে দুটি বেশ সুরক্ষিত কিন্তু তৃতীয়টিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হয়েছে। এই তৃতীয় গিরিপথটি অবহেলা করাই মারাত্মক ভুল।

২৭ তারিখে ভোর হবার ঠিক দু ঘণ্টা আগে, স্থলমধ্যস্থ জ্যামাইকা গিরিপথ পৌঁছে গেল ব্রিটিশ বাহিনীর অগ্রগামী অংশ। ব্রিটিশেরা, বেশ কড়া যুদ্ধ হবে ভেবে, সাবধানে অগ্রসর হলেও অবাক হয়ে দেখল যে গিরিপথ পাহারা দিচ্ছে মোটে পাঁচজন ঘুমন্ত অফিসার। ছেলেপুলেরা যেমন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করে আর সবাই জেনারেল হতে চায় তেমনি এই বিদ্রোহী বাহিনী একেবারে অফিসারে ভরা ; কখনও কখনও কোন রেজিমেন্টে যতগুলো লড়াকু সাধারণ সৈনিক ততগুলোই অফিসার। ভাবখানা হল এই যে 'ধ্যেৎতেরি সব নিকুচি করেছে—তুমি যদি নিজেকে উঁচু ক্ষমতাবান অফিসার বলে ভাবতে পার, আমিও পারি। তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ।'

ইউনিফর্ম পরবার পর কাউকে কারও থেকে তফাত করা যেত না বলে তারা টুপিতে পালক লাগাত এবং সেই পালকপ্রীতি থেকেই এল ব্রিটিশদের বিদ্রূপের গান :

শহরে গেল ঘোড়ায় চড়ে ইয়াংকি ইয়ার
টুপিতে গুঁজে পাখির, পালক বলে বেশ খাবার।

পেছনে বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে পাঁচজন অফিসার জেগে উঠতেই তাদের শাসিয়ে দেওয়া হল যে চিৎকার-চেঁচামেচি করলেই এই ইস্পাতের ফলা তাদের গলায় গিয়ে ফুটবে।

একজন বললে, 'দাও ফুটিয়ে,' তন্দ্রালু গলায়, অন্যেরা কিছুই না বলে পাছার ওপর ক্ষতস্থানে হাত বুলোতে বুলোতে, খেদে ভাবতে থাকল কেন তারা, এর আগেই যখন মনে হয়েছিল তখনই, বন্দুক-টন্দুক ফেলে বাড়ি চলে যায়নি।

যেমন ঘৃণায় শুয়োর, ছাগল বা গোরু কথাটা উচ্চারণ করে তেমনি করে একজন ব্রিটিশ অফিসার বললে, 'এরা বিদ্রোহী।'

আর একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হুকুম ছিল ?'

'হুঃ'

'ঘুমিয়েই গেল। কি হুকুম ছিল ?'

সতের বছরের একজন দাঁত বার করে হেসে বললে, 'মিলিশি, মশায়।'

অন্যেরাও যোগ দিল, 'মিলিশি।'

'কিন্তু রেজিমেন্ট, রেজিমেন্ট কোথায় ?'

'স্রেফ মিলিশি,' ওরা জোর দিয়ে বলল।

অফিসার আস্তে বলল, 'হা দয়াময় ঈশ্বর,' এবং তারপর পাঁচজন বন্দীকে নিয়ে চলে গেল। ব্রিটিশ বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে। খবর চলে গেল যে আমেরিকান বাহিনীর বাম পার্শ্ব খুলে গিয়ে এখন ফাঁকা অরক্ষিত। ব্রিটিশ অধিনায়কেরা নিজেদের চোখ-কানকে বিশ্বাস না করতে পারলেও, এই ফাঁকটার সুযোগ নিতে দ্বিধা করলেন না। বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে ডান পাশে সোজাসুজি ব্রিটিশ আক্রমণ চালাল আর ঠিক সেই সময়ে শয়ে শয়ে লালকুর্তা সৈনিক ঐ ফাঁকের মধ্য দিয়ে ঢুকে আমেরিকানদের পিছনে আক্রমণ করল।

মস্ত শেয়ালশিকারী নিজেকে কঠোর প্রশ্ন করলেন, 'আর তারপর ?' খেদ করার মানুষ তিনি নন। একটা কাজ করা হল তো করা হল। ব্যস।

'তারপর নরক, স্রেফ নরক, ঘৃণ্য, ঘৃণ্য নরক।'

ভার্জিনিয়ান এমন ধীর স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে তাঁর চতুষ্পার্শ্বের লোকেরা ভাবল: 'মানুষ নয়—কিংবা হয়ত কি ঘটল বুঝতেই পারেনি।'

নিজে নদী পার হয়ে ব্রুকলিন না পৌঁছানো পর্যন্ত বিপর্যয়ের পুরো কাহিনী তিনি জানতে পারেননি। তাঁর বাহিনী ব্রুকলিনে যুদ্ধরত বলে, ম্যানহাট্টানকে একটা বৃহত্তর বিপর্যয়ের মুখোমুখি ফেলতে তিনি ভয় পেলেন। শেষ পর্যন্ত নদী পার হয়ে যখন এলেন এইখানে তখন যুদ্ধ প্রায় শেষ। মৃত্যুর মুখোশের মত তাঁর মুখ ভাবলেশহীন হয়ে গেল, যখন শুনলেন তাঁর দুই সেনাপতি স্টার্লিং এবং সুলিভানের ভাগ্যে কি ঘটেছে।

যেখানে জার্মান ভাড়াটে সৈনিকেরা সোজা মুখোমুখি আক্রমণ চালাচ্ছিল সেই রণাঙ্গন তাঁরা রক্ষা করছিলেন। কামান দাগার পরের ঘটনা। এই কামানের শব্দই ভার্জিনিয়ানের বায়ুশূন্য শোবার ঘরে দূর থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে এসেছিল। কামান দাগায় অবশ্য বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি কিন্তু ইয়াংকি চাষীদের স্নায়ু তাতেই বেশ আক্ষিপ্ত হয়েছে। ওরা তো সারা রাত্রি বন্দুকে মাথা রেখে ঢুলছিল।

তারপর এল রাইফেলধারী জার্মান সৈনিক, সকালের চলমান কুয়াশায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে; তাদের সবুজ ইউনিফর্ম গাছপালা ঝোপঝাড়ের রঙের সঙ্গে মেশা। ঢোলকা বাজাতে বাজাতে তারা এল, চকচকে বেয়নেটগুলো কুয়াশায় ডুবছে আর ঝলকে উঠছে।

ইয়াংকিরা বলাবলি করল, হেসের লোক এরা। ক্ষেত-খামারের

আঠার-উনিশ-বিশ বছরের ছেলেরা একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বন্দুক চেপে ধরল ভিজে হাতে। জার্মানদের প্রতি তাদের অহেতুক ঘৃণার সঙ্গে মিশেছিল যন্ত্রণাদায়ক ভয়। মস্ত মস্ত, গোরু-চোখো, সবুজ পোশাকপরা ঘড়ঘড় করে কথা বলা এই ভাড়াটে সৈনিকগুলোকে ইয়াংকিরা কোনমতে বুঝেই উঠতে পারল না।

'হেসের লোক এরা,' এরা পরস্পরে বলাবলি করে।

তবু এরা একবার প্রতিরোধ করত, করবার চেষ্টা করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্দুকগুলো ছুঁড়ে; নিজেদের এলোমেলো যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যূহটা একটুখানি রক্ষা করত কিন্তু হঠাৎ পেছনে শুনল লালকুর্তাদের জয়ঢাকের শব্দ। এরা তাকিয়ে দেখে দু দিক থেকে আক্রমণ। এরা জার্মানদের সামনে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, পেছন থেকে লালকুর্তাদের গুলি এলোপাতাড়ি পড়তে লাগল। যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে এরা চিৎকার করে উঠল যে তাদের ঠকানো হয়েছে। পিছু হটতে চেষ্টা করতেই লালকুর্তার দল তাদের তাড়িয়ে নিয়ে ফেলল জার্মানদের কবলে। এরা ২৫ পাউণ্ডের মরচে-পড়া গাদা বন্দুক ঘুরিয়ে ধরে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করলেও জার্মানদের ক্ষুরধার বেয়নেটে ইয়াংকিদের নাড়িভুঁড়ি কেটে বেরিয়ে এল। এরা মাটিতে পড়ে মাকে ডেকে কাঁদতে লাগল আর গোরু-চোখো জার্মান চাষারা তাদের পিঠে বেয়নেট বিঁধিয়ে দিতে লাগল।

যে কজন এদের মধ্যে বাঙ্কার হিলে প্রতিরোধ করেছিল তারা ছাড়া বেশীর ভাগই কখনও যুদ্ধ করেনি; এরা কখনও মারেওনি মরেওনি। তাদের শান্ত জীবনের গতিধারা বয়ে গিয়েছে বাক্সের মত ছোট ছোট, নিউ ইংল্যাণ্ডের শহরগুলোর সাদা গীর্জাগুলোকে ঘিরে ঘিরে; আর সব সময়েই তারা বসে কাটিয়েছে মদের দোকানে, বলেছে স্বাধীনতার কথা। এখন তার দাম দিচ্ছে।

এ পথে সে পথে তারা দৌড়য় আর জার্মানেরা হাসতে হাসতে চিৎকার করতে করতে ছোটে তাদের পেছনে। পাছে পিঠ দিয়ে এরা দাঁড়ায় আর জার্মানদের বেয়নেটের খোঁচায় মরে ডালে নুয়ে পড়ে।

ওরা মাঠে লুকোয় আর জার্মানেরা তাদের খুঁজে বের করে, ধরে তুলে, টানতে টানতে নিয়ে চলে, আর চেঁচায়, 'ইয়াংকি! ইয়াংকি! ইয়াংকি!'

নারকীয় কাণ্ড চলে কয়েক ঘণ্টা ধরে। গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে এরা রুখবার চেষ্টা করে জার্মানদের কিন্তু আমেরিকানদের মূল ব্যূহ একটি ধীরগতি নালা; সেটা আবার মজিয়েছে একটা পঙ্কিল জলায় গিয়ে পড়ে।

সন্ত্রস্ত আমেরিকানেরা তালগোল পাকিয়ে সেই ফাঁদে গিয়ে পড়ে বন্দুক-টন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, পাঁকের তলায় ডুবতেই থাকল; পেছনে সমানে আসে সেই ঘড়ঘড়ে গলায় বিদ্রূপের হাসি: 'ইয়াংকি! ইয়াংকি! ইয়াংকি!'

সেনাপতি সুলিভ্যান একটা শস্যক্ষেত্রে লুকোবার চেষ্টা করছিলেন। লম্বা লম্বা ডাঁটার ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে দেখলেন হেসিয়ান বুটগুলো মড়মড় করে তাঁকে পার হয়ে চলে গেল। খুব নিশ্চুপে তিনি পড়ে থাকলেও, যথেষ্ট নিশ্চুপ ছিলেন না। তিনজন জার্মান—তাদের খড়ের রঙের চুল। তারা তাঁকে টেনে-হেঁচড়ে দাঁড় করিয়ে, হি-হি করে হাসতে হাসতে, ব্যক্তিগত পুরস্কারের মত, বয়ে নিয়ে চলে গেল।

সেনাপতি স্টার্লিং একা ছুটতে লাগলেন, ভয়ে নয়, কিন্তু শত্রুবেষ্টিত হয়ে। তাঁর সৈনিকেরা কেউ নেই; তাঁর বাহিনীগুলো খড়কুটোর মত ছড়িয়ে গেছে এদিক ওদিক। লালকুর্তারা তাঁকে তাক করে গুলি ছুঁড়ছে না. যেন, হাঁস মারছে, জানেই না যে তাদের পারিতোষিক হতে চলেছেন এক সেনাপতি. তামাক-চিবানো, টুপিতে ফুল গোঁজা নীচু মর্যাদার কোন একজন নয়—সত্যিকারের সেনাপতি যিনি নিজেই একদিন ব্রিটেনের লালকুর্তা পরেছিলেন। ছুটতে ছুটতে তাঁর পা দুখানা সীসের মত ভারী হয়ে এল, ভুল করে পড়লেন গিয়ে এক জার্মান টহলদারী বাহিনীর হাতে। তারা হি-হি করতে করতে দ্বিতীয় আর এক আমেরিকান সেনাপতিকে বন্দী করল।

ভার্জিনিয়ান যখন নদী পার হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের পেছনদিকের ব্যূহের কাছে পৌঁছালেন তখন তাঁর অফিসারেরা, কর্ণেলেরা, মেজরেরা এবং একজন সেনাপতিও একে দুয়ে এসে তাঁকে জানালেন অবস্থা কত খারাপ, এর চেয়ে খারাপ হতে পারে না।

তাঁরা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'আমাদের হয়ে গেছে, সব গিয়েছে, সব শেষ, সব গেছে—'

উনি এক টিলার চূড়ায় উঠলেন। সেখান থেকে যুদ্ধের শেষটুকু তাঁর নজরে এল। বুঝলেন এরা ঠিকই বলছে, সবই শেষ হয়েছে, কিছুই অবশিষ্ট নেই, অসম্ভব পরিকল্পনাটির নিঃশেষে খেলা হয়ে গেল।

তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে, সমস্ত ভীতিপ্রদ ছবিখানা তাঁর সামনে বিস্তৃত। পায়ের নীচে সেই পাঁকে-ভরা জলা। তিনি ওই হেসিয়ানদের প্রায় দেখতেই পাচ্ছিলেন। তারা আমেরিকানদের কচাকচ কাটছিল আর মিনতি-করা ইয়াংকিদের দল বেঁধে বেঁধে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খেদাচ্ছিল। স্বচক্ষে দেখলেন,

পশ্চাদপসরণের পথটা খোলা রাখতে ব্যর্থ চেষ্টা করছিল যে মেরিল্যাণ্ড ব্রিগেড সেটা গিয়ে পড়ল লালকুর্তাদের পাশে। ছররা গুলিতে এদের যেন চষে টুকরো টুকরো করে ফেলল। জলার মধ্যে পোকার মত বুকে ভর দিয়ে চলছে ইয়াংকিরা। হেসিয়ানদের এখন উল্লাস। আমেরিকানদের কানে সেই ঘড়ঘড়ে বাতাস বেয়ে আসছে, 'ইয়াংকি! ইয়াংকি!'

কে যেন তাঁকে বলছিল, 'সেনাপতি, আমরা এখন কি করি?'

'এখন?'

তিনি এখন ভাবছিলেন যে একটি পুরো সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হওয়া ব্যাপারটা কি রকম।

পুনরুক্তি করলেন, 'এখন? কি আর করবার আছে?'

তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে, বিড়বিড় করতে করতে, অবাক হয়ে, ধীরে ধীরে হেঁটে চললেন—মনে করতে চেষ্টা করলেন কত সব ভুলের দীর্ঘ সূত্র যা পরিণত হয়েছে আজকের এই বিপর্যয়ে। যুদ্ধের, খণ্ডযুদ্ধের, পরাজয়ের সম্বন্ধে যা কিছু জানতেন সব মনে আনতে চেষ্টা করলেন। মাথা ব্যথা করতে লাগল, রোগা শরীরটা ঘামে ভিজে উঠল।

কে একজন কর্ণেল হাট। সর্বাঙ্গে কাদার ছিটে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি ওরা এখানে আমাদের আক্রমণ করতে আসে—?'

শেয়ালশিকারী ধীরে ধীরে, যেন স্কুলে-শেখা পড়া বলছেন এমনিভাবে, বলে গেলেন, 'তাহলে ওরা কাছে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তাহলে অপেক্ষা করুন ওরা যথেষ্ট কাছে এলে গুলি ছুঁড়বেন বলে।'

কিন্তু তিনি জানতেন সব শেষ হয়েছে, সর্বনাশ হয়েছে। জগতে কিছুই এখন আর তাঁকে সাহায্য করতে পারবে না, ভীত লোকগুলোকে উপদেশ পর্যন্ত না—অর্থাৎ শত্রু কাছে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করা। কিন্তু এখন আর কিছুই নেই।

৩. মার্বেলহেডের জেলেরা

সৈন্যবাহিনীর পেছনে, মাপা পদক্ষেপে, তিনি যখন এদিক থেকে ওদিক করছেন তখন সকলেই বেশ তারিফ করতে থাকে তাঁকে। দীর্ঘ দেহ একেবারে খাড়া, কপালে সামান্য কুঞ্চন-রেখা। তাঁকে দেখে মোটেই মনে হচ্ছে না যে তিনি একজন সেনাপতি যাঁর বাহিনীকে কেটে কুচি কুচি করেছে। আর যার সব আশাই একেবারে ধূলিসাৎ হয়েছে। এদিকে

সেদিকে ছুটে-যাওয়া বার্তাবহদের এলোমেলো গতির মাঝে তাঁর বিশাল দৈর্ঘ্য নিয়ে তিনি সকলের মাথার ওপরে—যে ক্লিষ্ট কর্ণেলেরা রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট খুইয়েছে, উনিশ-বিশ বছরের বুক-ভাঙা ক্যাপ্টেনদের আর সেই সেনাপতিদেরও মাথার ওপরে যারা নিজেদের প্রথম ও শেষ হুকুম তামিল করছে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে গরম, বিষণ্ণ বিকেল; এখন কালচে সূর্য ডুবছে পাহাড়ের খাড়া চূড়াগুলোর পেছনে। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি, তবে সে কেবল ব্রিটিশেরা নিউ ইংল্যাণ্ডারদের তাড়া করা, মারা এবং বন্দী করা ছেড়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে বলে। ব্রিটিশেরা এক অন্ধ গলিতে ঠেলে দিয়েছে ওদের; তিনদিকে সৈনিকদের কঠিন বেড়া আর চতুর্থ দিকে জল এই পাঁচমিশালি বাহিনী তাদের একেবারে মুঠোর মধ্যে এসে গেছে ভেবে ব্রিটিশ সেনাপতি শেষ করে দিতে আর তাড়াহুড়ো করছেন না, কেন না, করতে গেলে যে কজন লোক যাবে তাদের স্থান সহজে পূরণ করা যাবে না।

পশ্চাদপসরণটা হয়ে উঠল প্রায় একটা উচ্ছৃঙ্খল ভীড়, আমেরিকানদের পরিখাগুলোর মধ্যে যেন নীচু জমি থেকে বন্যার জল ঢুকছে; আর সেদিন সারা বিকেল ধরে সন্ত্রস্ত বিধ্বস্ত মানুষগুলো ওই জলা আর বন থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসতে লাগল। ওরা হতভম্ব, ভীত, প্রত্যেকে আপন আপন বিপর্যয়ের কথাই ভাবছে। প্রত্যেকে নিশ্চিত যে বিপ্লবের পাতলা স্বপ্নের সবটাই শেষ হয়ে মিলিয়ে গেছে—এখন শুধু আপন প্রাণটুকু বাঁচাতে পারলেই হল।

আমাদের মস্ত মালিকের পাশ দিয়ে এরা সারি বেঁধে যাচ্ছে আর দলা বেঁধে যাচ্ছে ভয়চকিত মানুষের হুড়োহুড়িতে। এরা ওঁর দৃষ্টি এড়িয়ে চলছে কিন্তু কেউ কেউ পার হয়ে যাবার পর পেছন ফিরে তাকাচ্ছে, দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে তাঁর কর্দমাক্ত বুটের ওপর।

ওই জল আর বনের মধ্যে থেকে প্রায় হাজার দুয়েকের মত আর বেরিয়ে আসেনি।

ভার্জিনিয়ান এই প্রথম যে হারলেন তা নয়। তাঁর সারা জীবনের টানা-পোড়েন, ক্ষয়ক্ষতি, হতাশা আর অসফল স্বপ্ন দিয়ে বোনা। অতি ছোট ছোট ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে কষ্ট পেতেন। বিনয় কিন্তু তাঁর সত্যিকারের কারণ প্রকাশ হীনমন্যতায় মনোবিকার প্রকাশ পেত না, প্রকাশ পেত তাঁর অসামর্থ্যের চেতনায়। যিনি কিনা সাহসকে সব গুণের ওপরে স্থান দিতেন

তিনি মনে মনে জানতেন আপন ভীরুতা; যাঁর কাছে ভালোবাসা ছিল শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাসের মত প্রয়োজনীয় তিনিই হারিয়েছিলেন যাঁকে ভালোবাসতেন সেই একটিমাত্র নারীকে; সকলের প্রীতি যিনি চাইতেন তিনি পাননি একটিও সত্যিকারের বন্ধু; যে শিশুটিকেই দেখতেন তার দিকেই মন ছুটত তবু তাঁর নিজের কোন সন্তানাদি ছিল না; নিজের অজ্ঞতা জানতেন বলেই লেখাপড়াকে পুজো করতেন। তাঁর মনের গতি কি যন্ত্রণাদায়ক আর কত জটিল। তাঁর জীবনপিপাসার তুলনা মিলত সেই ক্ষীণ সূত্রটিতে যা তাঁকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। তাঁর দীর্ঘ, ভঙ্গুর শরীর সব সময় মৃত্যুর কিনারাতেই ইতস্তত করত।

রাত্রি হল, তাঁর পায়চারিতে ক্লান্তি নেই। যে সব মনভাঙা লোক তাঁর কাছে এল তাদের তিনি একটিমাত্র প্রশ্নই করেছিলেন:

'আমাদের কতজন গেল?'

তারা জানত না। ব্রুকলিনের পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্র তখনও শুধু টুকরো টুকরো খণ্ডের ধাঁধার মত। অনেক বছর ধরে অনেক বংশধরাও সেগুলোকে জুড়ে ঠিক ইতিহাস রচনা করতে পারবে না। রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট উবে গেছে। অনেক সেনাপতি, কর্ণেল, মেজর, ডজনে ডজনে নিম্নপদের অফিসার এমন সম্পূর্ণ উবে গেছে যে মনে হয় পৃথিবী যেন তাদের গিলে ফেলেছে। কেউ বলছে হাজার খানেক গেছে, আবার অন্যেরা বলছে হাজার দেড়েক। কারও কারও মতে তিন হাজার।

যেখানে ওয়াশিংটন পায়চারি করছিলেন সেইখানে সেনাপতি পাট্নাম্ উপস্থিত হয়ে বললেন, 'যতই হোক, আমরা ঘা খেয়েছি প্রচণ্ড।'

প্রধান সেনাপতি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন; পাট্নাম্ এই ভেবে অবাক হলেন যে একটা মানুষ এত কম রক্ত এবং এত বেশী লোহা আর পাষাণ দিয়ে তৈরী হতে পারে। চারদিকে ছড়ানো ধ্বংসস্তূপ। পাট্নাম্ ভাবলেন উনি যদি একটু শাপমন্যি করতেন তাহলেও ভালো হত।

'শীগগিরই অন্ধকার হয়ে আসবে। ধরুন এখন, এই অন্ধকারে, ওরা যদি আবার আক্রমণ—'

'তা পারে,' শেয়ালশিকারী বললেন।

পাট্নাম্ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হা ভগবান! মশায়, আর একটা আক্রমণ ঠেকাবার অবস্থা যে আমাদের নেই।'

শেয়ালশিকারী তাঁর নিষ্প্রাণ ধূসর চোখ দুটি সেনাপতির দিকে ফেরাতেই তিনি ভয় পেয়ে, ঢোক গিলে, কি সব বিড়বিড় করে উঠলেন।

'ওরা আবার আক্রমণ করলে আমরা আবার যুদ্ধ করব,' বললেন শেয়ালশিকারী।

'হাঁ।'

'এটা ওদের বোঝা প্রয়োজন যে আমরা আবার যুদ্ধ করব। সেনাপতি, যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি।'

ভার্জিনিয়ান আবার হাঁটতে শুরু করে নিজেকে বারে বারেই বলতে থাকেন এখনও যুদ্ধ শেষ হয়নি। স্মৃতি অনেকক্ষণ হাঁতড়ে তাঁর মনে হল যে, যে রকম করেই হোক, তাঁর পক্ষে, মানে জর্জ ওয়াশিংটনের পক্ষে, সব কিছু একই রকম থাকে, মর্যাদা আর সামর্থ্য এক জিনিস নয়, একজন ঢেঙা আবাদ-মালিকের পক্ষে কতকগুলো বোকা ছোকরাকে দিয়ে ভালো-বাসাতে পারানোই প্রধান সেনাপতি হবার আসল গুণ নয়। তার বাহিনীকে এখন কুচি কুচি করে কেটেছে, জলের দিকে পেছন ফিরে তারা ছড়িয়ে পড়ে আছে; মনে হচ্ছে কোন না কোন ভাবে তার জীবন থেকেই তারা জীবনের ধারণাটি নিয়েছে। ব্র্যাডকের পরাজয়ের সেই ত্রাস থেকে। গুরুত্ব-পূর্ণ যা কিছুতে তিনি হাত দিয়েছেন সব ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে চারদিকে ছিটিয়ে গেছে। তার জবরজঙ্গ প্রকাণ্ড হাত দুখানা যা কিছু হাতড়িয়েছে তাই ধ্বংস হয়েছে—নিজের বাঁশিটাকে যেমন তিনি বেসুরো বাজান, একই সুরে, বারে বারে, বিনা বৈচিত্র্যে।

তবু এখনও কিছু করবার আছে। সব যখন শেষ হয়ে গেছে তখনও মানুষ, মরবার আগে, কঠিন লড়াই করে। কিছু আছে করবার কিন্তু কেউ কিছু ভাবতে চাচ্ছে না। ভেতরে শঙ্কা আর তিনি স্থিরভাবে পায়চারি করে চলেছেন, চেষ্টা করছেন মোটা বুদ্ধিটাকে চালনা করবার। আর কারও তো চালনা করবার মত বুদ্ধিই তখন নেই।

এরা সকলেই লক্ষ্য করছে এঁকে। ঘনিয়ে-আসা গোধূলিতে তিনি দেখতে পাচ্ছেন শত শত সাদা মুখ তার দিকে ফেরানো। মাঝে মাঝে আসা কামানের শব্দের মধ্যে উনি তাদের ফিসফিস কথাবার্তাও শুনতে পাচ্ছেন। তিনি হলেন ভার্জিনিয়ার সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটন। তার হাঁটার ধরন দেখেই বলা যায় যে তাঁর মাথায় কোন পরিকল্পনা আছে। গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়ে তৈরী একটা প্রাচীরের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছেন নক্স আর পাট্‌নাম্। তাঁদের চোখে, গোধূলির স্বর্ণাভ আলোয় প্রধান সেনা-পতিকে দেখাচ্ছে একটা দৈত্যের মত। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান নক্স—অবশ্য ওই বাহিনীর যা বাকী ছিল তাঁরই। তিনি ছাব্বিশ বছরের ছোকরা

—উজ্জ্বল চোখ, যাথেষ্ট মোটাসোটা, লালচে গাল। চারটি জিনিস সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন তিনি—বই, তাঁর বন্দুকগুলো, নিজের স্ত্রী আর তাঁর প্রধান সেনাপতিকে। দীর্ঘকায় শেয়ালশিকারী তাঁর চোখে অচঞ্চল দেবতা-বিশেষ—তাঁর মনে ভয়ডর নেই, অনিশ্চয়তা নেই। তিনি যেন মানুষের সব কামনা বাসনা আঘাতের উর্ধ্বে। যুদ্ধের আগে নক্স বই বেচত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল একদিন সে হবে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যিনি প্রকাশক হিসেবে নবীন প্রতিভাকে উৎসাহ দিতেন, আর প্রকাশও করেছেন অসংখ্য আশ্চর্য আশ্চর্য সব বই। এখন আবার গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান হিসেবে তিনি তাঁর কালো কালো নাক-বসা বন্দুকগুলোকে তেমনিই আদর করেন যেমন করতেন তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণগুলোকে। এখন তাঁর সাধ হল হাজারো কামানের যেগুলো থেকে একসঙ্গে সমানে গোলা বেরিয়ে যাচ্ছে।

বন্দুকে তাঁর লোভ, বন্দুক জমাতেন, মূল্যবান মনে করতেন, দিনে রাতে গুনে রাখতেন। বন্দুক নিয়ে ঘুমানো নিয়ে তাঁর লোকজন স্থূল রসিকতা করত তবু বন্দুক কাছে পেলে তিনি আর কোথাও ঘুমোতেন না। ফলে এখন তাঁর যন্ত্রণা একান্ত ব্যক্তিগত এবং অনন্য। যাই ঘটুক না কেন তাঁর বন্দুকগুলো শত্রু বাজেয়াপ্ত করবে—কয়েকটি মাত্র 'বহুমূল্য' কামান, দেশের এ কোণ সে কোণ থেকে টেনেটুনে জড়ো করে আনা। মনে হল তাঁর সব অপহৃত হয়েছে, তিনি উলঙ্গ। পাট্‌নামের পাশে যখন তিনি দাঁড়িয়ে তখন তাঁর মনে নৈরাশ্য আর বিষাদ। তবু আকাশের পটভূমিকায় শেয়াল-শিকারীর মূর্তিটি তাঁকে উৎসাহিত করে, ক্ষণেকের জন্যেও নিজের কথা ভুলিয়ে দেয়।

পাট্‌নাম্‌কে বললেন, 'দেখুন, ওঁর দিকে চেয়ে দেখুন।'

কি আর করা যাবে তাই পাট্‌নাম্ তাকিয়ে দেখে বিষণ্ণভাবে কিছু বললেন।

'কি রকম স্থির,' অবাক হয়ে বলেন নক্স।

'হাঁ, খুবই স্থির, হ্যারি।'

'আকাশ ভেঙে পড়লেও উনি ওই রকমই থাকবেন।'

তাঁর কথার প্রয়োগে পাট্‌নামের রাগ হল, যত বাজে বই থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি। পাট্‌নাম্ রেগে গম্ভীর গলায় বললেন, 'গড়েছিল তো।'

যখন সকলে তাঁকে শুয়ে পড়ে একটু ঘুমোতে বলল তখন প্রকাণ্ড লোকটি বুঝলেন যে তাঁর অমানুষিক স্থৈর্যের মুখোশে কিছু ফল ফলেছে। অন্তত সেই মুহূর্তের জন্যেও তারা নিজেদের কথা ভুলেছে; যে দুঃখ এবং পরাজয়ে

প্রতিটি মানুষ গড়াচ্ছিল তার থেকে এদের তুলে এনেছে তাঁর এই আচরণ।

এটা যে ক্ষণিকের জন্যে সেটা তিনি বেশ বুঝেছিলেন। শুধু সকালে আলো হতে যেটুকু দেরী। তারপরেই বিশ্রান্ত, জয়োল্লাসিত ব্রিটিশ এবং জার্মান বাহিনী আবার আক্রমণ করবে এবং এবারে বিশৃঙ্খল আমেরিকান বাহিনীর পশ্চাদপসরণের উপায় থাকবে না। নদীর দিকে তাদের ঠেলে দিয়ে পুকুরে-পড়া হাঁসের মত তাদের খণ্ড-বিখণ্ড হবে।

সমস্যা নিয়ে যখন তিনি মানসিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত তখন সারা বিকেল এবং সন্ধ্যা ওই রকম স্থৈর্যের মুখোশ পরে থাকতে তাঁকে কি কষ্ট পেতে হয়েছে তা কেউ কখনও জানবে না! মনকে জোর করে সক্রিয় করে, স্থিরে ধীরে বিচার করতে বাধ্য হয়ে, সামনে তিনি তিনটি পথ দেখতে পেলেন। তিনটিই ছিল এবং তিনের বেশী একটিও নয়। ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি প্রত্যেকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন শেষ কোন একটি সম্ভাবনার আশায়।

প্রথম, সুস্পষ্ট, সবচেয়ে সহজ পথ হল আত্মসমর্পণ। তাঁর নিজের মধ্যেই কি যেন একটা চাইছে এই পাগলামি, এই বৃথা মারামারি ছেড়ে দিতে, যাকে তিনি বাহিনী বলছেন সেই বিশৃঙ্খল ভীতু জনতার হাত থেকে মুক্তি পেতে, অভিজাত মর্যাদায় তলোয়ারখানা রেখে দিয়ে পোটোম্যাকে তাঁর শান্ত গৃহকোণে ফিরে যেতে। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে অবজ্ঞা করবে, ঘৃণা করবে; কেউ কেউ সুখ্যাতিও করবে, আবার প্যাটসির মত কেউ কেউ ব্যাপারটা বুঝবেও। কিন্তু এই সুস্পষ্ট পথটি কখনই তাঁর সচেতন মনে পুরোপুরি এল না; রয়ে গেল সন্দেহ, অবিশ্বাসের গভীর গর্তে, শুধু যন্ত্রণা দিতে। এই ভবিতব্যের পুরোপুরি বিচারই তিনি করে উঠতে পারলেন না কেন না এই রকম একটা সম্ভাবনা স্বীকার করা নিজের কাছেও হয়ে উঠল না। মৃত্যুও তো ঐ রকম আত্মসমর্পণ, একই রকম শান্তি এনে দেবে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই সন্ধিক্ষণে তিনি পৌঁছাননি যেখানে এলে স্বীকার করতেই হবে মৃত্যু ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দ্বিতীয় বিকল্প হল যুদ্ধ। যদি তিনি ব্রিগেডগুলোকে ডেকে বলতেন যে ব্রিটিশ বাহিনীর শেষ সৈনিকটির সঙ্গে পর্যন্ত যুদ্ধ করতেই মনস্থ করেছেন, তাহলে তারা উল্লসিতও হত না, মুচকি হাসতও না, অথবা দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের গর্বও করত না নীচু গলায় এ ওর কাছে; তাদের যে চোখে আর আলো নেই সেই চোখ তাঁর দিকে তুলে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত; আর তারপর তাদের মধ্যে যারা বালকবয়সী—বেশীর ভাগই তাই—বাড়ির কথা আর পরিপাটি ছোট্ট ছোট্ট গ্রামের কথা মনে করে নিঃশব্দে কেঁদে

যেত। যারা অবশ্য আধা-বিদেশী, যারা ইউরোপের বস্তি আর বদ্ধ এলাকা-গুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে, মনে-প্রাণে বিপ্লবী, তারা বাহবা দিতে পারে তার সিদ্ধান্তে কিন্তু তারা সমগ্র বাহিনীর একটি অংশমাত্র, অন্যদের মতই খারাপ যোদ্ধা; অনেকেই ইংরেজিও জানে না, বেশীর ভাগই দুর্বল, অসুস্থ, বিশৃঙ্খল।

অফিসারদের কেউ কেউ, যেমন নক্স, পাট্‌নাম্, কার্টার এবং ডী—বিপুলদেহী, স্বাস্থ্যবান যুবক, যারা বিপদে পড়ার জন্যেই বিপদকে ভালোবাসে, পৃথিবীতে কিছুতে ভয় পায় না, এরা অবশ্য তাঁর পেছন পেছন নরকেও যাবে। কিন্তু কয়েকজন অফিসারে তো যুদ্ধ জিততে পারে না। তাদের গুণতে গুণতে তাঁর কত আশায় ভরে উঠল তাঁর মন; হিংসে হল তাদের পশুর মত দৈহিক সাহসে যা কখনও সন্দেহে, ভয়ে বা অসুস্থ যন্ত্রণায় বিব্রত হয় না।

যুদ্ধ করাটাও মোটেই গৌরবের হবে না, কেন না আগেই পর্যুদস্ত আমেরিকানেরা ব্রিটিশদের প্রথম আক্রমণেই ভেঙে পড়বে; চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাবে হলুদ-চুলো জার্মানদের নির্দয় বেয়নেটের সামনে থেকে। যুদ্ধ করার ফল হবে আত্মসমর্পণেরই মত—এইটুকু শুধু তফাত হবে যে আরও কয়েক শো ইয়াংকি ছেলে মরবে এবং আরও হাজার খানেক বিষাক্ত, পচা ঘায়ে ভুগবে। তা ছাড়া যুদ্ধ করলে আত্মসমর্পণের নরম নরম সর্ত পাওয়া যাবে না। মৃত্যু তিনি সইতে পারবেন কিন্তু ফাঁসি নয়।

জিজ্ঞাসা করলেন নিজেকেই নিজে, 'আর বিপ্লবের কি হবে? বিপ্লবের কথা এখন ভাবা শক্ত। যে বাহিনীকে তার রক্ষা করতে হবে অথবা চোখের সামনে মরতে দেখতে হবে তাদেরই স্থূল কথাটা ভিন্ন তাত্ত্বিক কিছু এখন ভাবাই যায় না। যদি থেকে গিয়ে যুদ্ধও করা যায় তাতে বিপ্লবের বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

আর একটি বিকল্প আছে—পশ্চাদপসরণ। পশ্চাদপসরণে বাহিনীটা রক্ষা পাবে, অন্তত যতক্ষণ ব্রিটিশেরা আবার গুছিয়ে-গাছিয়ে মানহাট্টান দ্বীপ আক্রমণ না করে। তাঁর সন্ত্রস্ত বাহিনী পশ্চাদপসরণে একটু হাঁপ ফেলে নেবার সুযোগ পাবে এবং যে ব্রিগেডগুলোকে তিনি নগর রক্ষার জন্য রেখে এসেছেন এবং যারা যুদ্ধের ঘা খায়নি, তাদের সঙ্গে তিনি মিলতে পারবেন। সবকটি পন্থার মধ্যে শুধু পশ্চাদপসরণের কথাটাই যুক্তিসঙ্গতভাবে ভাবা যেতে পারে এবং পশ্চাদপসরণই একমাত্র পন্থা যা গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব।

প্রথম কথা, হাজার হাজার মানুষ দিয়ে গড়া একটি বাহিনীকে স্থানত্যাগ করানোর জন্যে প্রস্তুতিরই যে সময় নেই। এখন অন্ধকার—বিপর্যস্ত যুদ্ধক্ষেত্র এখন নৈরাশ্যে ভরা ছাউনিতে একেবারেই বিশৃঙ্খল। ঘেরা বেড়ার মধ্যে এখনও যে তাদের রাখা গিয়েছে তা শুধু তারা জানে বলে যে পেছনেই নদীর ঠাণ্ডা জল, যাবার কোন জায়গা নেই। একবার শুধু ফিসফিস করে পশ্চাদপসরণের কথা বল অমনি দেখবে এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে কে আগে জলের ধারে পৌঁছবে বলে।

আর এক কথা, নৌকো কোথায়? আর নৌকো থাকলেই বা কে অবিরাম গুলিবর্ষণের মধ্যে ধীর স্থির হয়ে নৌকো বাইবে?

দেখলেন অফিসারেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে এবং বুঝলেন যে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা একই ভাবে পায়চারি করে চলেছেন।

'স্যর, কিছু খেয়ে নিন,' নক্স অনুনয় করলেন।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়! তুমি খেয়েছ হ্যারি?'

'স্যর? হ্যাঁ, আমি খেয়েছি।'

'স্টু?'

'কিন্তু খেতে বেশ, খুব ভালো, স্যর,' স্থূলকায় বই-বিক্রেতা মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 'আর মদ—আমি রেখে দিয়েছি এক বোতল।'

তিনি মুচকি হাসতে, মাথা নাড়তে পেরে উঠলেন। মনের শান্তির এই নিদর্শনটুকু দেখাতেই এরা কাছে ঘেঁষে এসে নক্সকে নিয়ে সরে গেল। ইনি দেখলেন এরা নক্সের কাছাকাছি থাকতে কত ব্যগ্র, নিজের হাতখানা তাঁর হাতে একটু ঘষে নিতে, তাঁর প্রকাণ্ড, সুশ্রী চেহারাখানা থেকে একটু আশ্বাস পেতে। এরা সব ছেলেমানুষ, ভীত, মনমরা। আর নক্স এমন স্থির, এবং আত্মপ্রত্যয়শীল যে এরা নিশ্চিত নক্সের মুষ্টিবদ্ধ হাতে আছে তাদের সমস্ত দুর্দশার আশান।

তার তাঁবুটা যে অন্ধকার এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ। তার গলা আবেগে রুদ্ধ হয়ে এসেছে, মূঢ় চোখ জলে ভর্তি। তার নিজের ছেলেপুলে কিচ্ছু নেই; আজ এরাই তাঁর ছেলেপুলের মত—ওই তরুণ অফিসারেরা যারা ভীড় করে ঘরে ঢুকেছে; একজন নতজানু হয়ে কোমল হাতে তাঁর জুতো খুলে দিচ্ছে; আর একজন কোট খুলতে সাহায্য করছে; অন্যজন তলোয়ার খুলে রাখছে—সকলেই এত বিবেচক, এত স্নেহশীল। তাদের হাত তাঁকে স্পর্শ করে যেন আদর করল। এতক্ষণে তাঁর বোধে এল যে ওরা বুঝেছে তিনি ওদের ঠকাননি। তাঁরই মত তারাও জানত যে এই উদ্ভট অভিযানের

এইখানেই শেষ।

আঠার বছরের এক ক্যাপ্টেন কচি গলায় বললে, 'ভাববেন না, স্যর, এইখানে শুয়ে পড়ুন, আমি বালিশটাকে ফুলিয়ে দিচ্ছি।'

সযত্ন স্নেহে কাটার তার কোটটি পাট করে রাখলেন।

ভালোবাসায় বেশ জরুরি ভাবেই নক্স বললেন, 'দেখে নিন স্যর, এই বিছানার পাশেই বুটজোড়াটা রইল। শুধু পা দুটো গলিয়ে দেবেন।'

প্রধান সেনাপতির চেয়ে বয়সে বড় পাট্‌নাম্‌ সুনিদ্রার পরামর্শ দিলেন; ভাঙা গলায় বললেন, 'তারপর সব ব্যাপারটা অন্য দৃষ্টিতে দেখা যায়।'

ক্যাপ্টেন নীচু গলায় যোগ দিলেন, 'তাঁবুর পর্দাগুলো নামিয়ে দেব, স্যর?'

নিঃশব্দে পা ফেলে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ওঁকে অন্ধকারে একা রেখে। প্রায় এক ঘণ্টা শুয়ে থেকেও ঘুম না এসে বরং মাথায় সেই চিন্তা-গুলো ফিরে এল, সপ্তাহ-মাসের ব্যবধানের পরেও, যখন তিনি ফিলাডেল-ফিয়া থেকে উত্তরে যাচ্ছিলেন ঘোড়ায় চড়ে বস্টনে— বাহিনীর ভার নিতে। সমস্ত দীর্ঘ, বিলম্বিত অশ্বারোহণটিই ভয়ে, প্রত্যাশায় কেমন যেন জড়িয়ে গিয়েছিল। দলের পর দল মিলিশিয়া পর্যবেক্ষণ করতে করতে তারা গিয়েছেন এবং প্রকাণ্ডদেহ আবাদ-মালিক এত বক্তৃতা করেছেন যে একটি বাঁধা বুলিও তাঁর তৈরী হয়ে গেছে 'আপনাদের সামনে এসে আজকে আমার আন্তরিক আনন্দ; উপলক্ষ্যটি কি গৌরবের।' এতসব সত্ত্বেও তিনি অবাক হয়ে ভেবেছেন শ্রোতারা কি ভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা করবে—সেই ইয়াংকি নিউ ইংল্যাণ্ডবাসীরা যারা বাঙ্কার হিলে যুদ্ধ করেছে, এখন যারা বস্টনের বাইরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

শেষ পর্যন্ত ঘিয়ে আর নীল রঙের ইউনিফর্ম পরে ঘোড়ায় চড়ে তিনি তাদের সামনে উপস্থিত হলেন—এমন দীর্ঘ, সুঠাম, অভিজাত শরীর তারা এর আগে কখনও দেখেনি; কিন্তু বাহিনীটি যে কি তা তিনি দেখলেন। ইয়াংকি চাষীদের দল ঘরে তৈরী পোশাক পরে; হাজারো হাজারো জন বন্দুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ ওর দিকে মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে, থুথু ফেলছে, রুচিহীনতায়, আর তামাকের মোটা মোটা দোনা চিবোচ্ছে। আর ওই দূরে দাঁড়িয়ে অফিসারের, বেশীর ভাগই ছোকরা, কয়েকজন যুবক আর এক-আধজন প্রাচীন; কিন্তু ইয়াংকি হিসেবে, সাধারণ সৈনিক হিসেবে তারা আরও গম্ভীর এবং নিষ্প্রাণ এবং তাঁর প্রতি প্রতিকূলতায় পূর্ণ। তিনি ভার্জিনিয়ার লোক

আর তারা আসছে ম্যাসাচুসেটস্, ভের্মন্ট, নিউ হাম্পশায়ার, মেইন এবং রোড দ্বীপ থেকে, কনেকটিকাট থেকেও। এই দুই জগতের মধ্যে নরকের ফারাক। তিনি যেতে পারেন নরকে, তারও পারে, কিন্তু পরস্পরে পার হবে কি করে। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে পড়ল যে জীবনে তিনি কয়েকজন কঠিন মানুষ দেখেছেন বটে—যারা গলা কাটে, যারা ডাকাত, অনুন্নত শ্রেণীর রেড ইণ্ডিয়ান যোদ্ধা যারা বহু বছর ধরে প্লেট থেকে নিয়ে কিছু খায়নি, পালকের বালিশে মাথা দিয়েও শোয়নি। এরা স্বেচ্ছা-নাবিক, জলদস্যুর চেয়ে উন্নততর কিছু নয়, ফিন্‌ক্যাস্‌ল্ মালভূমির ঘাঘরা-পরা স্কট জাতীয় কৌমের লোক; তবু তারা কেউই এই নিউ ইংল্যাণ্ডবাসীদের মত এত কঠিন নয়। এরা নিজেদের ইয়াংকি ধরনেই কঠিন এবং নিষ্প্রাণ— চোখে বরফের নীল অথবা কাঠকয়লার কালো।

প্রথম পর্যবেক্ষণের পর তিনি মার্থাকে লিখেছিলেন, 'এরা আমায় ঘৃণা করে—সকলেই—এবং ভাবে আমি অতি নীচ একজন বিদেশীবিশেষ: সেই তারা যারা ভণ্ডামি করে ক্রীতদাসপ্রথাকে ঘৃণা করে, আবাদী মালিকদের চেয়ে নিজেদের হীনতর ক্রীতদাস বানায়, আর আঁচড়ায় কামড়ায় নিজেদের সামান্য পাথুরে, অনুর্বরা জমি…'

যেটাকে তাঁর প্রথম রণ-পরিষদের প্রথম সভা বলা যেতে পারে সেই-খানে এদের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা, তারা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর জামার আস্তিনের লেসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল কঠোর দৃষ্টিতে, তাকিয়েছিল রেশমী মোজা আর কালো পাম্পশুর দিকে। নিজেদের ধূর্ত ইয়াংকি ধরনে তারা, ওপরে বোঝা না যায় এমনভাবে তাঁর সঙ্গে প্রত্যেক ক্ষেত্রে মতের অনৈক্য ঘটাত তাদের একটি আক্রমণ তাঁকে আঘাত করতেই তাদের সন্তোষ দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। লোকের ভালোবাসা আর তারিফ তিনি বড্ড ভালোবাসতেন কি না।

তারা চলে গেলে তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে, নিজেকেই নিজে শুধোলেন, তাহলে কেমন করে এই পরিবর্তনটা এল। নিশ্চিত করে নিজেও কিছু জানতেন না। নিজের মনকে নিজে বিশ্লেষণ করতে ভয় পেতেন। নিজের অন্তরে যে উত্তর খুঁজবেন তাও পেরে উঠলেন না। নিজে তো তিনি বদলাননি, তবে বাহিনীর একেবারে মধ্যে ঢুকেছেন কর্তব্যের খাতিরে, সর্বাধিনায়কের পক্ষে যেগুলো করতে তিনি আশা করতেন এবং করা উচিত বলে বিশ্বাস করতেন। বুঝতে পারেননি যে, একা একা ওদের মধ্যে গিয়ে তিনি ওদের নিজের দিকে আকর্ষণ করেছেন, আত্মবিশ্বাসের ফলে এবং

নিজের পথ অনুসরণ করার ফলে তাদের চোখে তিনি বড় হয়ে গেছেন।

জুতো, কোট পরতে গিয়ে, তলোয়ারখানা বাঁধতে গিয়ে অঙ্গের সমস্ত হাড়গুলো পর্যন্ত ব্যথা করে উঠল। বাইরে এসে একটা আগুনের কাছে এসে দাঁড়ালেন ঘড়িটা দেখবার জন্যে। ভোর সাড়ে তিনটে।

পরিখাগুলোর ধার দিয়ে আস্তে আস্তে যেতে থাকেন যেন সেগুলো পরিদর্শন করছেন। তাঁকে যেতে দেখে কর্তব্যরত লোকগুলো যুদ্ধরত অবস্থার তৎপরতায় সচেতন হয়ে উঠল। কয়েকজন নীরবে উদ্বেগে হাসল একটু; কয়েকজন ক্ষুব্ধ হল; কিছু লোক সেলাম করল।

বুঝতে পেরেছিলেন তিনি যে ব্রিটিশব্যূহ বেশী দূরে নেই। কামানের শব্দ বন্ধ হয়েছে, সকালের স্তব্ধতায় জার্মানদের গলা কানে এল; ভেবেই ঠিক করতে পারলেন না ওরা কি বিষয়ে কথা বলছে। অনেক জার্মানকে তিনি দেখেছেন—বন্দী বা পলাতক। তাদের ষাঁড়ের মত অবিচল ভাবটাতেই তিনি কি করবেন ঠিক করতে পারেন না, বিচলিত হয়ে পড়েন। নিউ ইংল্যাণ্ডবাসীরা অবাধ্য স্বেচ্ছাচারী বটে, কিন্তু জার্মানদের এই হীন, যে কোন হুকুম মানার বৃত্তির থেকে ভালো। যে কারও হুকুম তারা মানবে। ওই প্রকাণ্ডদেহ, পা-টেনে-টেনে-চলা, হলদে-চুলো চাষাগুলোর মধ্যে ভীতিপ্রদ কি একটা আছে।

ভার্জিনিয়ান বাহিনীর প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলেন। ইতোমধ্যেই সকাল হবার একটা নোংরা ধূসর ইঙ্গিত আকাশে। তিনি আরও ধীরে হাঁটতে শুরু করলেন, সেই ফাঁসির আসামীর মত যার কয়েক ঘণ্টার অনুগ্রহ শেষ হয়ে গেলেও, এই ভয়ে সে এগোয় না যে তার গন্তব্য তো নির্ধারিত। কোথায় যেন একটা মোরগ ডাকল। আর কোথায় একটা কুকুরও ডাকতে আরম্ভ করল।

ফুল-দেওয়া টুপি-পরা, মুখখানি গোল একটি ছোকরা লেফ্‌টেনান্ট্‌ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সেলাম করে মস্ত লোকটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

'কিছু বলবে?'

'হাঁ, স্যর, সেনাপতি ওয়াশিংটন, আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে শহর থেকে, আপনার সাহায্যের জন্য, অতিরিক্ত সৈন্য আসছে।'

'সেনাপতি গ্রিফলিন্‌ আসছেন?' শেয়ালশিকারী শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

মস্ত লোকটির স্থৈর্য ছেলেটার উত্তেজনায় যেন ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল:

'হাঁ, স্যর, হাঁ, স্যর, হাঁ। এইবার আমরা ওই শালা গলদাচিংড়িগুলোকে জন্মের শিক্ষা দিয়ে দেব না?' ছেলেটা কিছুতেই লাফানো বন্ধ করতে পারছিল না। 'ওরা তো ভোরেই আক্রমণ করবে, তাই না স্যর! মনে কিছু করবেন না, আপনি তাই মনে করেন না কি, স্যর?' নিজের দুঃসাহস বুঝে ফেলতেই তার কণ্ঠস্বর দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল। 'সেনাপতি পাট্‌নাম্‌ বলছিলেন, আপনি ঘুমিয়ে না থাকলে, নদীর ধারে নেমে আসতে পারেন, যদি অবশ্য দেখতে চান।'

ভার্জিনিয়ান শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'একটু পরেই যাচ্ছি।'

'একটু পরেই, স্যর?'

ছেলেটির ওপর তাঁর কথার ফল লক্ষ্য করে মাথা নাড়লেন। কথাটি যদি ছড়িয়ে পড়ে যে ওয়াশিংটন চিন্তিত নন তাতে কেউ বিশেষ আঘাত পাবে না; তিনি এতই কম বিচলিত যে শহর থেকে কত সৈনিক আসছে তা জানতেও তাঁর এতটুকু আগ্রহ নেই। অতিরিক্ত সৈনিকেরা যে মরতেই আসছে এ কথা সকলকে না বলা এক পক্ষে ভালোই। অধিনায়কের সেটুকু মানসিক জোরই নেই যে যা হারিয়েছেন তা ছেড়ে দেবেন। বরং তিনি তাঁর বাহিনীর আরও মানুষকে এই মরণফাঁদে টেনে নামাবেন।

আরও মিনিট পাঁচেক তিনি ছেলেটির চোখে বীর হয়ে থাকবার ইচ্ছা আর নদীতীরে কি হচ্ছে তা জানতে চাওয়া—এই দুই-এর দ্বিধায় কাটালেন। শেষ পর্যন্ত হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লেফ্‌টেনান্ট্‌, এইবার আমরা যাব।'

বুক চিতিয়ে ছেলেটা পথ দেখিয়ে চলল। আশাটা এই যে, তার অনেক বন্ধুই দেখতে পাবে সে সর্বাধিনায়কের সঙ্গে হেঁটে চলেছে। এরা চলতে চলতেই পাতলা কুয়াশার মত বৃষ্টি পড়তে লাগল এবং বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই একটি তীব্র আশা ও উৎসাহ শেয়ালশিকারীর হৃদয়ে যেন লাফ দিয়ে উঠল। বৃষ্টিতে চকমকি জ্বলবে না আর বারুদ এমন ভিজে কাদা হয়ে যাবে যে আর তার বিস্ফোরণের শক্তি থাকবে না। তিনি বুঝলেন আশার বেগে তাঁর সারা দেহ উত্তেজনায় কাঁপছে। তবু তিনি ছেলেটির পাশে পাশে স্থিরভাবে হেঁটে যেতে নিজেকে বাধ্য করলেন। এমন কি অবিচলিত গলায় যথাযথভাবে কথাও বলতে লাগলেন, 'আপনার নাম কি, মশায়?'

'দয়া করে জিজ্ঞাসা করছেন। আমার নাম, স্যর, টম লীকওয়ে।'

'না না, দয়া করাকরির কিছু নেই। আপনার বয়েস কত?'

'সতের, স্যর।'

প্রকাণ্ড মানুষটির ভ্রূ কপালে উঠল।

তাড়াতাড়ি ছেলেটি বলে দিল, 'এই এপ্রিল পার হয়েই সতেরতে পড়েছি।'

'হুঁ কাজে যোগ দেবার আদেশ-নামা পেলে কি করে?'

'কম মাইনেতে এই পালকের টুপিটা পরেছি,' ছেলেটি উদ্বেগে বলে উঠল এবং এই প্রথম 'স্যর' যোগ করতে ভুলে গেল। তার হাতখানা চলে গেল টুপির পালকের ওপর, 'গতকাল,' সে আস্তে বললে।

'আপনার অফিসার কি মারা পড়েছেন?'

'না, তিনি পালিয়েছেন।'

ভার্জিনিয়ান নদীর বাঁকে পৌঁছতে পৌঁছতে জোরেই বৃষ্টি এসে গেল। নিউ ইয়র্কের গীর্জার চূড়া এবং বাড়ীর ছাদের কার্নিশের ত্রিকোণগুলি ইতিমধ্যেই কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে এসেছে। এতক্ষণে তাঁর ওলটানো টুপি নীচের দিকে নেমে এসেছে, ইউনিফর্ম একেবারে বেঢপ। মুখখানা ভাবলেশহীন রাখলেও মিফলিনের সঙ্গে করমর্দনে তাঁর হাতখানা কেঁপে উঠল।

সদর্পে বললেন মিফলিন, 'তিন রেজিমেন্ট, স্যর।' মিফলিন্ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি; ত্রিশ বছর বয়সেই তাকে কংগ্রেসে পাঠানো হয়েছে, আর এই বত্রিশ বছর বয়সে তিনি সেনাপতি। কয়েকটা বছর পেলে তিনি যে কত উঁচুতে উঠতে পারবেন এই ভেবে তাঁর তাক লেগে যায়। ধৈর্যের তার অভাব আছে আর যাকে তিনি এত মাথামোটা মনে করেন তার সম্পর্কে একটু হিংসাও ছিল মনে।

'শুনলাম কালকের দিনটা খুব খারাপ গিয়েছে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ভার্জিনিয়ান। মিফলিনের অবজ্ঞায় তিনি অনুভব করলেন, দেখলেন ওই একটুখানি অবজ্ঞার মধ্যে সমস্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষের তার মত অবিবেচকের প্রতি অবজ্ঞা। তিনি জানতেন যে তাঁর মিফলিন্‌কে বলবার সাহস নেই সৈনিকদের ফের নিউ ইয়র্কে ফিরিয়ে দিতে। তাই তিনি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন সৈনিকদের জাহাজ থেকে তীরে নামা।

শৃঙ্খলাবোধ স্পষ্ট। ব্রুকলিনে আসবার পরে এই একটুখানি আসল শৃঙ্খলা দেখতে পেলেন তিনি। নিপুণ নির্বাধভাবে নৌকোগুলো আসছে যাচ্ছে আর দাঁড়িরা এমন করে নৌকো বাইছে যে মনে হচ্ছে ওরা সারা জীবন নৌকো বাওয়া ছাড়া আর কিছু করেনি। এই কর্মনৈপুণ্যে তিনি এত মুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে তাঁর মুখের ওপরকার অনুভূ মুখোশটি তিনি

মুহূর্তের জন্যে সরালেন। মিফলিনের পক্ষে সেই সময়টুকুই যথেষ্ট। মিফলিন্ মাথা নাড়লেন।

দাঁড়িদের দিকে মাথা নেড়ে মিফলিন্ বললেন, 'নৌকোর ব্যাপারটা ওরা বোঝে।' মনে মনে শেয়ালশিকারী স্বীকার করলেন যে ওরা নৌকোর ব্যাপারটা বোঝে। জল-সম্পর্কিত কোন ব্যাপার হলে ওঁর নিরাপত্তা-বোধ একেবারে চলে যায়। নৌবাহিনীর হিসেবে অথবা জলের বেড়ার বাধা হিসেবে তিনি কিছু ভাবতেই পারেন না। অনেক কারণের মধ্যে এটিও একটি কারণ যার জন্যে তিনি নিজেকে এই ব্রুকলিনের অন্ধগলির ভীতিপ্রদ ফাঁদে নিজেকে ধরা পড়তে দিয়েছেন। কিন্তু সেই তাঁর কাছেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হল যে এই লোকগুলো নিজেদের কাজ জানে এবং সে কাজ ভালোবাসে। এরা মোটা-চামড়া, লম্বা-মুখ ইয়াংকি কিন্তু তাদের হাবভাবে এমন আত্মপ্রত্যয় যা নিউ ইংল্যাণ্ডবাসীদের ছিল না। আর ওদের বেশীর ভাগই যে নীল কোট আর রঞ্জিত অয়েল-স্কিন পরেছে সেগুলোর মধ্যে একটা বেশ সঙ্গতি আছে। ওই সঙ্গতি একটা জিনিস যা তাঁর বাহিনীতে নেই। এই দাঁড় যারা বাইছে তাদের মধ্যে একটা মিল আছে।

'এরা কারা ?' উনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'গ্লোভারের রেজিমেন্টের এরা মার্বেলহেডের জেলে। আমি চাইনি যে আমার লোকগুলো সারাদিন জলে নাকানি-চোবানি খাক। এ লোকগুলো জানে কেমন করে দাঁড় বাইতে হয়। ওরা হয়ত যুদ্ধ করতে জানে না কিন্তু নৌকো সম্বন্ধে জ্ঞান টনটনে—আর হওয়াই উচিত। ওরা তো বরাবরই জেলে।'

শেয়ালশিকারী ধীরে বললেন, 'জেলে ? কতজন আছে এরা ? বৃষ্টি বেড়ে উঠেছে ; তাঁর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তালু পেতে দিলেন সেই জলের ফোঁটার তলায় ; সাগ্রহে, প্রায় দৈহিক স্বস্তির চেতনায়। বেলা বেড়ে উঠছে তবু ব্রিটিশ আক্রমণের কোন লক্ষণ নেই।

'ছ-সাতশো হবে।'

মনের একটা ধারণার সঙ্গেই তিনি যুঝছেন। মিফলিন্ যে জিজ্ঞাসা করলেন জলের থেকে সরে অন্য কোথাও একটু আশ্রয় নিলে ভালো হয় কিনা সে কথা তিনি শুনতেই পেলেন না। তাঁর মন চলেছে এক গোলকধাঁধার মধ্যে পথ করে করে, এই সর্বনাশ থেকে বেরোবার আশায়। কিন্তু নাছোড়-বান্দার মত তিনি আপন মনেই বলে গেলেন, 'আমাকে একাই করতে হবে, একাই।'

এই প্রথম জীবনে তিনি, ওই সন্ত্রস্ত ছোট মানুষগুলোর মনের ভেতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলেন—কর্তব্য হিসেবে। তাঁকেও পশ্চাদপসরণের পরিকল্পনা করতে হবে। এই বৃষ্টিটা তাঁকে সাফল্যের একটি সামান্য সুযোগ দিয়েছে, তবু সমগ্র বাহিনীর মধ্যে এক তিনি ছাড়া আর কেউ জানবে না যে পশ্চাদপসরণের কথা ভাবা হচ্ছে। আর কেউ জানতে পারলেই পরাজিত বাহিনীর ত্রাস আকস্মিক আতঙ্কে পরিণত হবে। তাঁর বাসনা ছিল একটি দৃপ্ত, সুশৃঙ্খল বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন; বদলে নেতৃত্ব দিতে হচ্ছে ভীত বিশৃঙ্খল নির্বোধ বালখিল্যদের। কিন্তু এতক্ষণে ওদের তিনি একটু বুঝেছেন; নিজেকে আর এখন ভুল বোঝাচ্ছেন না।

'স্যর,' মিফলিন জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রকাণ্ড মানুষটি মিনিট দশেক নিস্পন্দ, নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃষ্টিধারার মধ্যে। প্রাচীন, ক্লান্ত পাট্‌নাম্‌ কষ্টে, থপথপ করে উৎরাই ভেঙে এসে এখানে উপস্থিত। প্রকাণ্ড মানুষটির ওদিকে তাঁর দিকে মিফলিন তাকিয়ে, অসহায় ভাবে ঘাড় নাড়লেন। ভাবখানা এই যে ভার্জিনিয়ান একেবারেই ভুল পথে এগিয়ে গেছেন।

মিফলিন আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যর ?'

তাঁর শুষ্ক দীর্ঘ দেহ নিয়ে যেখানেই সর্বাধিনায়ক গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন সেখানেই একদল অফিসার ভীড় করছে। এইবার তারা গুটিশুটি মেরে তাঁকে একেবারে অধীর হয়ে বেষ্টন করল; অপেক্ষা তাঁর বৃষ্টি থেকে সরে আসার জন্যে।

তীক্ষ্ণ বিচার করে নয়, সায়াটিকা এবং বাতের ব্যথায় খিটখিটে গলায় পাট্‌নাম্‌ বলে উঠলেন, 'মনে হয় না আজ ওরা আক্রমণ করবে। তাঁবুতে বসে থেকে আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত তারা যখন অপেক্ষা করতে পারে তখন এই বৃষ্টিতে যুদ্ধ করতে যাবে কেন ?'

কেউই পশ্চাদপসরণের কথা বলতে চায় না তবু প্রত্যেকের মনে এইটিই প্রধান কথা—নিশ্চিত কথা, যেটি ভার্জিনিয়ানের মুখ থেকে বেরোবে। এরা সাগ্রহে চেয়ে রয়েছে তাঁর মুখের দিকে আর তিনি নিজে প্রস্তুত হচ্ছেন।

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা পশ্চাদপসরণ করব না,' তিনি বললেন।

সকলের মুখ দেখে মনে হল সকলে ভাবছে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

উনি শান্তকণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে আসছি, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আহত ও রুগ্নদের। আমি চাই

আজকেই এই নদীতে বজরা, নৌকো, পানসি, ডোঙা যা পান সব যোগাড় করুন। আমি চাই নর্থ নদী থেকে নৌকো নিয়ে আসা হোক। প্রণালী থেকে প্রতিটি মাছধরা নৌকো আমার চাই—সব এখানে জমা হোক, ব্রুকলিন তটে। আমি চাই আপনারা নৌকোগুলো সংগ্রহ করুন। কর্ণেল গ্লোভার, আমি চাই আপনার জেলেরা এইখানে থাকুক, এই নদীতেই, বুঝতে পারছেন, এই নদীর সীমানাতেই।'

যদিও ক্লান্ত ও দুর্বল, তবু আগে বোঝেননি এমন সূক্ষ্মভাবে উল্লসিত তিনি। কাঁধ সোজা করে তাদের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন পরিখা-গুলোর দিকে। প্রবঞ্চনায় তিনি দক্ষ নন; ঐ গুণটা তাঁর সবচেয়ে কম। কিন্তু তিনি যে তাঁর মনোগত অভিপ্রায় ঢাকতে পেরেছেন এই ঘটনাটাই তাঁকে অবাক করে দিল।

৪. পশ্চাদপসরণ

তাঁবুতে বসে বসে তাঁর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল; মাঝে মাঝে হাতঘড়ির দিকে তাকান, তাঁবুর ক্যাম্বিশের ওপর ঝিরঝিরে বৃষ্টির শব্দ শোনেন। এক ভাবা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। বেশ কিছু সংখ্যক নৌকো এসে পৌঁছাতে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা কেটে যাবে।

বুঝতেই পারছিলেন যে আগেই হোক পরেই হোক অফিসারদের কাছে তাঁকে পরিকল্পনাটি প্রকাশ করতেই হবে। কোন একজন মানুষের পক্ষে এই হাজার হাজার সৈনিকের বাহিনীকে পিছু হটিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই ছলনাটা বড় বাড়াবাড়ি হবে, অতি সহজভেদ্য। একটি কাজে যদি ভুল হয় সমস্ত ইমারৎটি তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে।

তবু এই মুহূর্তে কিছুই করবার নেই। নিজের তাঁবুতে শান্ত হয়ে বসে থাকলেই বরং বাহিনী মনে জোর পাবে। যে ছোকরারা তাঁর অফিসার তারা তাঁর ধৈর্যের সঙ্গে পেরেই উঠবে না। তারা লাফাচ্ছে, কিচিরমিচির করছে আর প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর তাদের একজন ওঁর তাঁবুর ভেতর উঁকি মারছে। অধিনায়ক একখানা ছোট ক্যাম্প-টেবিলে শান্তভাবে বসে লিখছেন। ছোকরাটা শিস দিয়ে, ফিরে গিয়ে, কি দেখেছে তা অন্যদের বলে।

'উনি আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন।'

'বটে?'

'একটি কথাও বললেন না, শুধু তাকালেন আমার দিকে।'

'বিরক্ত হয়েছেন।'

'না, বিরক্ত হয়েছেন তা আমি বলব না।'

'মৃদু মৃদু হাসছিলেন?'

'হয়ত বা একটু মজা পেয়েছেন।'

'ওঃ ক্রাইস্ট, ঠাণ্ডা-মাথা লোক বটে!'

রাত্রি বাড়তে থাকলে নিজের বিছানায় শুয়ে, জ্বরগ্রস্তের মত এপাশ থেকে ওপাশে গড়াতে থাকেন 'ঘুম আয়, ঘুম আয়।' ভয় আর সন্দেহ বিদ্রূপের প্রদর্শনী সাজিয়েছে। ঈস্ট নদী ধরে উজানে ব্রিটিশ নৌবহর এসে উঠলেই আমেরিকানদের পশ্চাদপসরণের পথ একেবারে বন্ধ। নক্সের ছ পাউণ্ড আর ন পাউণ্ড গোলা-দাগা কামানগুলো ব্রিটিশবহরের প্রকাণ্ড জাহাজগুলোর কিছুই করতে পারবে না কিন্তু ওদের ক্যারসেড থেকে এক ঝাঁক গোলা মার্বেলহেডের লোকগুলোকে জল থেকে ছিটকে তুলে দেবে।

তাহলে করেনি কেন? কেন পেছিয়ে গেল? কিসের জন্যে তারা অপেক্ষা করছে?

কেন? কেন? কেন? অস্বস্তিকর তন্দ্রার মধ্যে ভাসতে ভাসতে নিজেকে তিনি জিজ্ঞাসা করেই চলেছেন। স্মৃতিগুলো ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেগে উঠে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন মোটে কয়েক মিনিট মাত্র কেটেছে।

ভিজে, বিষণ্ণ প্রভাতে নিজের তাঁবুতে তিনি, নক্স, পাট্‌নাম্‌ আর মিফলিনের সঙ্গে বসে। তাঁবুটা ঝুলে পড়ে জল পড়ছে ফুটো দিয়ে; বাইরে জলের ফোঁটার শব্দের আর ভেতরে জলের ফোঁটার শব্দের তালে মিল নেই। তাঁবুর ভেতরটায় ভেজা প্যানকেকের মত কাদা। শেয়ালশিকারী নড়বড়ে ক্যাম্প-টেবিলের পাশে বসে, নক্স একটা নীচু বারুদের বাক্সের ওপর, দু পায়ের মধ্যে ধরা রয়েছে সীসে আর টিনের কলসী—তাতে বাসী বিয়ার।

মিফলিন জিজ্ঞাসা করেন, 'কিসের জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

নক্স 'ঘুঁটের কাঠি' বলে, নিজের প্রকাণ্ড পেট ভেতরে টেনে নিয়ে বিয়ারের কলসীটি সতৃষ্ণ চোখে দেখতে লাগলেন।

'রস আর গুড় ঢেলে দাও।'

'আগে ঘুঁটুনিটা আসুক,' ধীরভাবে বললেন নক্স।

'তাতে আর মাথামুণ্ডু তফাতটা কি হবে?'

'উনি ঠিকই বলেছেন। ঘুঁটুনি আসুক,' পাট্‌নাম্‌ সায় দেন।

নক্স বললেন, 'ঐটিই একমাত্র উপায়। না হলে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'ঠিক,' পাট্নাম্ সায় দেন। 'লোহাটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'বোকামি আর কুসংস্কার,' বিড়বিড় করে উঠলেন মিফলিন।

ভার্জিনিয়ান ক্লান্তিতে মাথা নেড়ে লম্বা লম্বা আঙুলে টেবিলে টোকা দিতে থাকেন ; তারপর শান্ত কণ্ঠে বলেন, 'শুনুন, ঘোঁটাঘুঁটি একটু পরে করলেও তো চলে।'

'দুঃখিত, স্যর,' বললেন নক্স ; বিয়ারের কলসীতে আঙুল ডুবিয়ে চাটতে লাগলেন তিনি আনমনে।

'আমরা পশ্চাদপসরণ করতে যাচ্ছি,' বললেন ভার্জিনিয়ান। তাঁর কণ্ঠ-স্বর বিনীত, প্রায় মিনতিতে ভরা। পিছু হঠা—এই কথাটির কোন শেষও নেই, ভবিষ্যৎও নেই।

এঁরা হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। নক্সই প্রথম চোখ ফিরিয়ে নিলেন—তাঁর ছেলেমানুষের মত গোল মুখখানা ভয়ে কুঁচকে গেল। টিনের প্যানে রাখা গুড় মেঝে থেকে তুলে বিয়ারের মধ্যে ঢেলে দিলেন। ধীরে ধীরে একগুঁয়ে গতিতে গুড় ঢুকছে তার মধ্যে। নক্স যখন গুড় ঢালছেন তখন রোগা-পটকা, বসন্তের দাগে ভরা মুখ, বেঁটে একটা ছেলে ঢুকে এল তাঁবুতে, হাতে আগুনের মত লাল ঘুঁটুনি।

'ঘুঁটুনি, স্যর,' বলে ছেলেটা।

নক্স বললেন, 'আমাকে দে।'

পাট্নাম্ তাঁকে কর্কশ গলায় মনে করিয়ে দেন, 'রস কই!'

মিফলিন এক বোতল রস তুলে নিয়ে বিয়ারের কলসীতে ঢেলে দিতেই নক্স গরম লাল ঘুঁটুনিটা ঢুকিয়ে দিলেন কলসীর মধ্যে। সমস্ত সংমিশ্রণটা শোঁ শোঁ করে ধোঁয়া ছাড়তেই একটা বিশ্রী চামড়াটে গন্ধ বেরোতে লাগল। বসন্তের দাগে চিহ্নিত মুখ ছোকরাটা মুগ্ধ হয়ে দেখছিল কিন্তু পাট্নামের এক চাউনিতে ভয় পেয়ে সে পালাল। ইতিমধ্যে নক্স ঘুঁটুনিটা একপাশে সরিয়ে রেখে, মাটির কাপে কাপে মিশ্রিত বস্তুটি ঢালতে লাগলেন।

তাঁর মগ থেকে অধিনায়ক ধীরে ধীরে পান করছেন। কেউই কারও স্বাস্থ্য বা শুভকামনা করল না, কেউই চায় না ওসব কিছু। মিফলিন, নক্স এবং পাট্নাম্ কলসী থেকে ঢালছেন আর কাপ ভরছেন তীব্র একাগ্রতায়।

'একেবারে নোংরা, বাজে জিনিস,' মন্তব্য করেন নক্স।

আর মিফলিন বিড়বিড় করে ওঠেন, 'ওটা বুঝলাম না, স্যর, ঐ পিছু

হঠা সম্পর্কে। আমি বুঝতে পারি না। আমার লোকজন সব নিয়ে এলাম আর এখন বলছেন পশ্চাদপসরণ। না, আমি বুঝতে পারি না, স্যর। কেন আমরা ওদের সঙ্গে লড়ব না?'

ভাজিনিয়ান বললেন, 'ও ছাড়া উপায় নেই। লোকগুলো লড়বে না। ভগবান জানেন কখনও লড়বে কি না। আর যদি ব্রিটিশেরা নদীর উজান বেয়ে ওপরের দিকে আসে, তাহলেই একেবারে শেষ। একেবারে বাহিনী না থাকার চেয়ে লড়বে না এমন বাহিনী থাকাও ভালো।'

'স্যর, আপনি যদি ওদের পিছু হঠতে বলেন, ফল কিন্তু আরও খারাপ হবে।'

মস্ত লোকটি মাথা নাড়লেন। গত চব্বিশ ঘণ্টায় কতবার তিনি কল্পনা করেছেন হাজার হাজার সন্ত্রস্ত মানুষ আগেভাগে নৌকোয় গিয়ে উঠবে বলে ঠেলাঠেলি, মারামারি করছে। তিনি বললেন, 'বলবেন না ওদের। আজ রাত্রে, অন্ধকার হলে, কয়েকটা রেজিমেণ্টকে একে একে ছুটি দিয়ে দেন। প্রত্যেকে ভাববে অন্যেরা বুঝি যুদ্ধক্ষেত্রটা সামলাচ্ছে। হয়ত, সেইভাবে—'

পাট্‌নাম্‌ আপন মনে বলে যাচ্ছেন, 'অসুস্থ, ক্লান্ত, নিজের পা দুখানাও প্রায় নড়াতে পারছি না।'

'বেশীর ভাগকেই বার করে নিয়ে যাওয়া যাবে এখান থেকে। সেনাপতি মিফলিন, আপনার লোক দিয়ে সাময়িকভাবে জায়গাগুলো সামলান। যতক্ষণ আপনাকেও যেতে না বলি ততক্ষণ ওদের ধরে রাখুন।'

মিফলিন ভাবলেন, 'হুঁ, যেমন করে স্টার্লিং আর সুলিভ্যানকে সরিয়েছিলেন তেমনি করে আমাকেও সরান, আর কি।'

প্রায় সজল কণ্ঠে নক্স বললেন, 'কিন্তু আমার কামানগুলোর কি হবে, স্যর—আমার কামানগুলোর?'

'শিক ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দিন।'

'সবগুলো? কয়েকটা বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না, স্যর?'

প্রকাণ্ড মানুষটি মাথা নাড়লেন।

'আমার সব অমন সুন্দর কামানগুলো,' ফিসফিস করে বললেন নক্স। যথেষ্ট মদ খাবার ফলে তাঁর এখন প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'আমার সুন্দর কামানগুলো।'

বৃষ্টি পড়েই চলেছে। গায়ে একটা জোব্বা চাপা দিয়ে অধিনায়ক ছাউনির মধ্যে পায়চারি করতে থাকেন। লোকেরা ভীত, সিক্ত, দুর্দশাগ্রস্ত; তাদের বেশীর ভাগেরই এইখানে ব্রুকলিনে কোন তাঁবু ছিল না। তারা

চারদিকে পড়ে রয়েছে খেদে, হতাশায়। সর্বাধিনায়ক যখন তাদের পাশ দিয়ে যান তখন তারা তাঁর দিকে তাকাল না। বললেই চলে ; বন্দুকগুলোকে বৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখার কোন চেষ্টাই তারা করেনি ; সারা ছাউনিতে এমন একটি বন্দুকও ছিল না যা থেকে গুলি ছোঁড়া চলে।

যে কোন আক্রমণ অতি-পাকা গমের দানার মত তাদের উড়িয়ে নিয়ে চলে যেত। সশস্ত্র বাহিনীর কোন রূপই আর তাদের নেই। প্রত্যেকেই পশ্চাদপসরণের ব্যর্থতার কথা বুঝেছে বলেই যে যেখানে ছিল সেইখানেই পড়ে আছে। কিছু কিছু—এই বেশীর ভাগই যারা ষোল-সতের বয়সের ছোকরা, এখনও আহত কুকুরের বাচ্চার মত প্যান প্যান করছে পরাজয়ের ধাক্কা সামলাতে, তবু একটু সুশৃঙ্খলভাবে। তাদের ব্যক্তিগত অসন্তোষের কারণ হল মারের ভাগটা তাদের ওপর বড় বেশী গেছে। একটি ছোট্ট ঘটনাতেই এরা নিউ ইংল্যাণ্ডারদের টুঁটি কামড়ে ধরতে পারে। নিউ ইংল্যাণ্ডবাসীরাও নিজেদের তরফে, প্রচেষ্টার এই হীনতা এবং বিপ্লবী বাহিনীর এই পরাজয় ইয়াংকিদের মতই পুরোদস্তুর আলোচনা করেছে এবং এখন তারা নিশ্চিত যে, যে অফিসারেরা তাদের চালনা করেছেন তাঁরা তাদের ইচ্ছে করে পথে বসিয়েছেন। সুযোগ পেলে তাদের অনেকেই পালাত। এখনও অনেকে পরিকল্পনা করছে, একবার এই ব্রুকলিনের শয়তানী ফাঁদ থেকে বেরোতে পারলে, কি করে পালাবে। কিন্তু ঠকানো হয়ে থাকুক আর নাই থাকুক, অন্যেরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে কেননা এটি তারা কংকর্ডে এবং লেক্সিংটনে শুরু করেছে এবং শেষ করবেই। কারণ তাদের স্বাধীনতার প্রয়োজন আরও নীতিসঙ্গত, জীবনের সঙ্গে আরও অঙ্গাঙ্গী। স্বাধীন তাদের হতে হবে। স্বাধীনতা তাদের রক্তে মাংসে জড়িত। আসল বা নকল যে কোন রকমের দাসত্বই তাদের দেহে দূষিত ক্ষতের মত।

শেয়ালশিকারীর দীর্ঘ ঋজু দেহের প্রতিটি সঞ্চালন তাদের কাছে আস্ফালন বলে মনে হচ্ছে। তাঁকে তারা ভার্জিনিয়ার নির্বোধ নির্মম শেয়াল শিকারী বলেই। তাই এখন শাপমন্যি করছে।

সাধারণ বুদ্ধিতেই তারা বুঝে নিয়েছে যে আমেরিকার সবচেয়ে ধনী মানুষের এই যুদ্ধে কোন স্বার্থ থাকতে পারে না। তাঁর কর্কশ ব্যবহার আর বিশ্রী মেজাজ নিয়ে তারা সব সময় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত। ওঁর ঐ অদ্ভুত নামটাও তাদের কাছে অসহ্য। ওয়াশিংটন—সারা নরকে এমন নাম কে কবে শুনেছে ?

ওঁর পায়ে লাগছে। ষাট ঘণ্টা না ঘুমানোর ফলে সমগ্র অসুস্থ শরীরের

যে বেদনা তার মধ্যেও এই পায়ের ব্যথাটাই নাছোড়বান্দা। বিষণ্ণ বিকেল শেষ হয়ে এল। ব্রিটিশেরা তখনও তাঁবুতে বসে বৃষ্টি থামার জন্যে অপেক্ষা করছে। উনি নিশ্চিত যে আর এক পা-ও তিনি হাঁটতে অক্ষম। ঘোড়া আনিয়ে, চড়ে, তিনি নদীর ধারে ঘোড়া ছুটোলেন। ঘোড়ার ওপরে বসে ঢুলুনি আসছে আর রীতিমত চেষ্টা করে বারে বারে নিজেকে জাগিয়ে তুলতে হচ্ছে।

সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন যে পশ্চাদপসরণ সাফল্যের সঙ্গে করা যাবে না। ভাবাই যায় না যে কয়েক শো গজ দূরে বসে ব্রিটিশেরা এই বিধ্বস্ত বাহিনীর ধ্বংসাবশেষকে নিরাপদে পিছু হঠে যেতে দেবে। দেখতে পেলেন—সামনে অমর্যাদা সর্বনাশ, আর ফাঁসির দড়ি। আর ক্লান্ত ছিলেন বলে তাঁর ভাবনাগুলো অদ্ভুত, বিকট নিশীথস্বপ্নের রূপে ভেসে ভেসে যাচ্ছে। আবছা ভাবনায় তিনি অবাক হন কোন শক্তি তাঁকে এটা সেটা একটার পর একটা করিয়ে নিচ্ছে। সৈন্য-সামন্তের ব্যাপার নিয়ে তিনি কখনও বিশেষ ভাবেননি।

নদীতে মার্বেলহেডের লোকেরা এত নৌকো যোগাড় করেছে যে দেখে তিনি অবাক। নৌকোগুলো এই এতক্ষণে ব্রুকলিনের তীরের কাছাকাছি হচ্ছে। কিন্তু উজানে হেল্‌জ্‌ গেটের কাছে নানারকমের নৌকোর সরগরম। কুয়াশা আর বৃষ্টির আঁধি ভেদ করে অবিরাম ধারায় তারা বেরিয়ে আসছে বাতাসের আর জলে-ভেজা মাঝিদের হাসির তোড়ে। বাঁকের মুখে নোঙর-করা ব্রিটিশ নৌবাহিনী আবার ঐ কুয়াশা আর বৃষ্টির জন্যেই ওদের দেখতেই পায়নি। মার্বেলহেডের লোকেদের কাজটা বেশ লাগছিল। অবিরাম হাঁটায় আর ড্রিল করে করে তারা একেবারে নাচার হয়ে উঠেছিল বলে শেষে এই কাজটা বেশ জুৎসই লাগছে। সারা বাহিনীর মধ্যে তারাই কেবল কাজে দক্ষ, ক্ষিপ্র এবং সক্ষম। তাদের কর্ণেল, গ্লোভার, নিজে সালেমের লোক। তিনি এই জেলেদের বাহিনী তৈরী করেছেন। নিজের লোকেদের তিনি জানতেন, জানতেন তাদের সামর্থ্য, এবং কেমন করে তাদের মধ্যে থেকে কাজের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত নিংড়ে বের করে নেওয়া যায়।

নৌকোগুলো যেমন আসছে, গ্লোভার সেগুলোকে ধারে আনিয়ে নোঙর করাচ্ছেন আর পারাপার করার জন্যে একান্ত যেটুকু দরকার তা ছাড়া বাকী সব যন্ত্রপাতি, দড়াদড়ি খুলিয়ে ফেলছেন। প্রতিটি নৌকোতে একদল করে নৌকো বাইবার লোক ঠিক করে দিচ্ছেন। বড় নৌকো লম্বা ছিপ আর খানকয়েক বোঝা বইবার নৌকো আলাদা করে রাখছেন, প্রয়োজনে তাড়া-

তাড়ি দিক পরিবর্তনের জায়গা রাখবার জন্যে। সন্ধ্যা হয়ে এলে জমা-হওয়া নৌকোগুলো নদীর তীরে জোট বেঁধে সারি দিয়ে দাঁড়াল।

চলতে গেলে সারা অঙ্গে মট মট শব্দ হচ্ছে। তিনি এসে দাঁড়ালেন অশ্বারোহী অধিনায়কের পাশে। ছোকরার ফুলো ফুলো মুখখানা হতাশায় মুচড়ে গেছে।

'ঐ কামানগুলো, স্যর।'

'তা কি?'

'ওগুলোর মুখ শিক দিয়ে বন্ধ করে দিলে আমরা আর কামান পাব কোথায়?'

প্রকাণ্ড মানুষটি গা ঝাঁকালেন।

'সৈনিকেরা কামান দিয়েই যুদ্ধ করে,' নক্স নাছোড়বান্দা।

'আর মানুষ দিয়েও। আমাদের দুটোই নেই।'

এঁরা তাকালেন পরস্পরের দিকে—বইয়ের ব্যবসায়ী যে এককালে মস্ত প্রকাশক হবার স্বপ্ন দেখেছিল, আর শেয়ালশিকারী যিনি বহু বৎসরের শান্তিপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন একদিন দেখেছিলেন যাকে ভালোবেসেছিলেন সেই নারীর সঙ্গ আর নিজের ছেলেদের সঙ্গে।

'অন্ধকার হলেই শিক ভরতে শুরু করব,' নক্স বললেন।

'যত নিঃশব্দে পারেন।'

নক্স বিষণ্ণ স্বরে উত্তর দিলেন, 'নিঃশব্দে কামানে শিক ভরা যায় না, স্যর। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

'আপনার কাজ শেষ হলে লোকগুলোকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন নদী পার হয়ে যাবার জন্যে।'

সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি গ্লোভার এসে সংবাদ দিলেন যে, যতগুলো আশা করা গিয়েছিল ততগুলো অন্তত এসে জমেছে। হুকুম পেলেই তিনি পার করা শুরু করে দিতে পারেন। জন বারো অফিসার এসে অধিনায়ককে ঘিরে দাঁড়ালেন; তাঁকে আবার বুঝতে দিলেন একমাত্র যে শক্তি এই ভগ্ন বাহিনীকে একটু নাড়া দিতে পারে সেটুকু আছে ঐ তাঁর কৃশ, ক্লান্ত দেহখানায়। রক্তবর্ণ চোখে তিনি তাকালেন অফিসারদের দিকে, একজনের পর একজনের মুখের দিকে; অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন অস্পষ্ট ধারায় এই শিশুরাও কর্ণেল, মেজর এবং জেনারেল হয়েছে। একজনকে বেছে নিয়ে বললেন, 'আপনার রেজিমেন্টকে নিয়ে এসে নৌকোয় চড়ান।'

'পশ্চাদপসরণ না কি, স্যর?'

'না রে বোকা না—তোমার রেজিমেন্টকে ছুটি দিচ্ছি, শহরে পাঠিয়ে দিচ্ছি বিশ্রাম আর শুকনো জামাকাপড়ের জন্যে। বাকীরা নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাও।'

তিনি প্রায় জোরেই হেসে উঠলেন। কি রকম ছেলেমানুষকে একেবারে বোকার মত ঠকানো। ঘোড়াকে নৌকোগুলো পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন সৈনিকদের জাহাজে ওঠা দেখবার জন্যে। একজন জেলের হাতে আলোটা কাঁপছে দেখতে দেখতে তাঁর আবার ঢুলুনি এল।

'স্যর ?'

ঘুমন্ত চোখ তুলে তাকান।

জেলেটা কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, 'আপনাকে কেমন যেন অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

'তোমার কাজের জায়গায় যাও।'

'এই যে, স্যর—'

'কাজের জায়গায় যাও! ঈশ্বরের দোহাই, গ্রোভার, তোমার লোকগুলোকে সামলাও!' এরাই কেবল রয়ে গেছে যাদের তিনি এখন শাসন করতে পারেন। বাকীরা সব শাসনের বাইরে।

ক্লান্তিতে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন ; ঘুম তাড়াতে এমন করে ঠোঁট কামড়াতে থাকেন যে মুখের মধ্যে রক্ত ঝরে পড়ে।

পরিকল্পনাটি কেমন সুন্দর কাজে রূপায়িত হল দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। পরিকল্পনাটির সরলতাই এটির সার্থক হবার কারণ। আমরাই কেবল ভাগ্যবান, প্রতি রেজিমেন্ট এই কথাই বিশ্বাস করে, এবং তাদেরই শুধু সরানো হচ্ছে এও বিশ্বাস করে, নদীতীরে হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নেমে গেল। শত্রু হিসেবে এবং চিন্তার বিষয় হিসেবে ব্রিটিশেরা এদের মন থেকে একেবারে মুছে গেছে। তাদের ভয় কেবল এই যে তাদের দুর্ভাগা সঙ্গীরা শুনতে পেয়ে তাদের স্বাধীনতার এবং বাঁচবার এই শেষ সুযোগটাও নষ্ট করে দেবে।

ব্রুকলিনের তীর ছেড়ে মানহাট্টানের অস্পষ্ট আলোগুলোর দিকে প্রথম রেজিমেন্টটি এগিয়ে যেতেই ভার্জিনিয়ানের ক্লান্তি কেটে গেল। এখনও সুযোগ আছে তাহলে, বেশ ভালো সুযোগ বলেই মনে হচ্ছে। তাঁর চিন্তার ধারায় খুঁটিনাটি বাদ যায় না কিন্তু সারা প্রৌঢ় জীবনটা তিনি তাসের টেবিলে বসেছেন এবং ভালো হাতে বাজি ধরা তাঁর রক্তের একেবারে গভীরে। ঘোড়ায় এগোচ্ছেন পেছোচ্ছেন, সর্বত্রই সব সময় রয়েছেন,

একপাল ভেড়ার মত লোকগুলোকে নৌকোয় তোলাচ্ছেন। অতগুলো অসুস্থ লোককে নিয়েও তাঁর স্নায়বিক শক্তি যেন অফুরন্ত। পরে অবশ্য মূল্য দিতে হবে কিন্তু এখন তিনি এক দুর্দান্ত, বেপরোয়া ঘোড়সওয়ার।

কাউকে ছেড়ে কথা কইছেন না। যে ছেলেগুলো নিজেদের সেনাপতি বলছিল তারা তাঁর কথার ঘায়ে ভিরমি যাচ্ছে। মার্বেলহেডের যে জেলেরা অমানুষিক পরিশ্রম করছিল তারাও যেন তাঁর চোখে যথেষ্ট খাটছে না। ধীরস্থির গ্লোভারকে তিনি কথায় কথায় জ্বলিয়ে দিলেন। সালেমের লোকটি যখন মৃদু আপত্তি করতে গেলেন, তিনি গর্জে উঠলেন, 'কথার উত্তর শুনতে চাই না, মশায়! চুলোয় যান, কাজ করুন।'

ঘোড়ার জিনের ওপর তাঁর জন্ম আর তাঁকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হয়েছে ঘোড়ার বাচ্চার মত—মানে শেয়ালশিকারীকে। এখন তিনি ঘোড়ার পিঠে —ঘোড়াতে আর তাঁতে যেন এক রক্তমাংস হয়ে গেছেন একেবারে।

রাত্রি বেড়ে চলে, রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্ট আসে আর তিনিও তাদের নৌকোয় তোলেন। সংখ্যাই ভুলে গেছেন। সহায়কদের জিজ্ঞাসা করলেন। তাদের অবস্থাও তাঁরই মত—তারাও জানে না কতজনে ব্যূহ আটকে রেখেছে। কিন্তু তারা উচ্ছ্বসিত, এই কৌশলের সাফল্যে তারা মেতে উঠেছে।

স্ক্যামেল নামে একজন অনুনয় করলে, 'গিয়ে দেখে আসি, স্যর।'

'যান। কিন্তু মিফলিনকে রেখে আসবেন।'

'কি বললেন?' স্ক্যামেল ঘোড়া থামায়।

'বললাম যে মিফলিনকে রেখে অন্যদের নিয়ে আসুন। মিফলিন সব শেষে যাবে।'

'আচ্ছা, স্যর,' বলে স্ক্যামেল ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

গ্লোভার বললেন, 'আমার মনে হয় ও আপনার কথা বোঝেনি।'

কিন্তু আর একটি রেজিমেন্ট ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে আসছে। ভার্জিনিয়ান ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেন তাদের নৌকোর দিকে চালনা করতে। এখন আর ভুলচুক কিছু হবে না।

স্ক্যামেলকে যে হুকুম দিয়েছিলেন এবং যে হুকুমটি স্ক্যামেল না বুঝেই তামিল করতে ছুটেছিল পাছে অধিনায়ক তার বিভ্রান্তিটা ধরে ফেলেন, এই ভয়ে, সেই হুকুম এমন এক ভুলের ধারার সৃষ্টি করল যাতে পরিকল্পনাটি একেবারেই বানচাল হবার যোগাড়। স্ক্যামেল মিফলিনের কাছে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে বললে যে অধিনায়ক তাঁকে বলেছেন তাঁর সমগ্র বাহিনীকে

নৌকোর দিকে নিয়ে যেতে, নিউ ইয়র্কে যাবার জন্যে জাহাজে উঠতে হবে।

মিফলিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার সৈনিকদের না ওদের?' তাঁর সৈনিকেরা হল মোটামুটি সুশৃঙ্খল বাহিনী কিন্তু ঐ নিউ-ইংল্যাণ্ডবাসীরা হল ভয়ে জীর্ণশীর্ণ একটি দল।

'আপনার সৈনিকদেরই, আমার মনে হয়,' উত্তর দিলে স্ক্যামেল।

'তুমি ঠিক বলছ?'

'তাই তো তিনি আমাকে বললেন।'

ঐ নিউ-ইংল্যাণ্ডীয়দের দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর ওরা?'

স্ক্যামেল মাথা নাড়ল আর মিফলিন ঘাড় ঝাঁকিয়ে পরিখায় তাঁর লোকেদের বললেন জায়গা ছেড়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে। নিউ-ইংল্যাণ্ডীয়েরা হাঁ করে দেখল, বোঝবার চেষ্টা করল ঘটনাটা যে মিফলিনের কর্মক্ষম চলে যাচ্ছে আর তারা পড়ে থাকছে বলি হবার জন্যে—তারা যারা এত ভালো যুদ্ধ করেছে এবং ব্রুকলিনের যুদ্ধে এত রক্ত ঝরিয়েছে। যেটুকু সময় তাদের লেগেছিল এইটি বুঝতে ঠিক সেই সময়টুকুই তারা দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছিল। তারপরেই চটকা ভেঙে গেল; ওরা ছুটতে আরম্ভ করল; কাছে পিঠে যত ব্রিগেড ছিল তারাও যোগ দিল।

মানুষের ঢেউ বন্যার মত ঘাটের দিকে গড়িয়ে চলেছে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে তারা মারামারি, আঁচড়া-আঁচড়ি করতে লাগল। কেউ কারও মাথায় চড়ছে, কেউ বা পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে যাচ্ছে; ঘুঁষি চালাচ্ছে, ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিচ্ছে এ ওকে। ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে তারা পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করে নদীর কালো জলে ফেলে দিচ্ছে; মার্বেলহেডের জেলেদের তারস্বরে গালাগালি করছে আর জেলেরা দাঁড় চালিয়ে তাদের ঠেকাচ্ছে।

আর এই দৌড়াদৌড়ির মধ্যে, ক্রুদ্ধ পশুর মত গর্জন করে চলেছেন সর্বাধিনায়ক নিজে। তিনি সব সময়েই সব জায়গায়. ভীষণ ভয়াবহ, এদের দমন করছেন—অগ্নিশিখার ওপর ঠাণ্ডা জল ছিটোচ্ছেন আর এই দুর্দশার ঝলসানির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে মুহূর্তের গভীর স্তব্ধতা।

'নিজেদের জায়গায় ফিরে যাও!'

তারা হাল ছেড়ে দিয়ে তাঁর সামনে ভয়ে কুঁকড়ে গেল। অনেকেই মাটিতে বসে পড়ে কম্পমান হাতের মধ্যেই চোখের জল ফেলতে লাগল; আর প্রকাণ্ড মানুষটি, ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে. তাদের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন।

মিফলিনকে যখন খুঁজে পেলেন তখন তিনি নিজেকে প্রায় সামলে

ফেলেছেন—অন্তত রাগে অন্ধ হয়ে সেনাপতির ওপর ঝাঁপিয়ে আর পড়বেন না। এখন সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সৈন্য সরিয়ে আনলে কেন, মিফলিন?'

'আপনার হুকুমে।'

'চুলোয় যাক সব। না, আমার কোন আদেশ ছিল না।'

'ঈশ্বরের দোহাই, ছিল,' মিফলিন ফুঁসতে লাগলেন, 'আপনি স্যামুয়েলকে পাঠিয়েছিলেন না? আপনি আদেশ দেননি পশ্চাদপসরণের?' ক্রোধে তাঁর চোখে জল এসে গেল। অসহায়ভাবে তিনি নিজের উরুতেই চাপড় মারতে লাগলেন। 'আপনি পাঠাননি স্যামুয়েলকে আমার কাছে? পাঠাননি?'

শেয়ালশিকারী ঘোড়া থেকে নেমে, মিফলিনের কাছে গিয়ে, তাঁর কাঁধ দুটো চেপে ধরলেন।

মিফলিন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, 'আপনি আমার কাছে স্ক্যামেলকে পাঠাননি?'

এতক্ষণে ভার্জিনিয়ান নিজের স্থৈর্য খুঁজে পেয়েছেন, মনে পড়েছে স্ক্যামেলের দৃষ্টিতে ছিল জিজ্ঞাসা যা সে মুখ ফুটে বলতে সাহস করেনি।

'স্ক্যামেল তোমাকে কি বলেছিল?'

'এইখানে চলে আসতে।'

ভার্জিনিয়ান মাথা নেড়ে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা কর।'

'কি বলছেন, স্যর?'

'বিশ্বাস কর, জেনারেল মিফলিন, আমি দুঃখিত। এটা স্ক্যামেলেরও দোষ নয়, তোমারও নয়। মাঝে মাঝে কি যে বলি নিজেই বুঝতে পারি না।'

'আপনার আদেশ কি, স্যর?' ধরা গলায় শুধোলেন মিফলিন। একই সময়ে তাঁর মনে হল যে এই দীর্ঘদেহ শেয়ালশিকারীর জন্যে তিনি এখন সানন্দে প্রাণ দিতে পারেন।

'তোমার জায়গায় ফিরে গিয়ে আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।'

মিফলিন ফিসফিস করে বললেন, 'সর্বনাশ না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার জায়গা ছাড়ছি না।'

ভোর হয়ে এসেছে, কুয়াশা কেটেছে। ভার্জিনিয়ান একখানা নৌকোতে বসেছিলেন—সঙ্গে নক্স আর একটি স্কুলে-পড়া গোলন্দাজ ক্যাপ্টেন। এর

নাম আলেক্‌জাণ্ডার হ্যামিলটন।

স্টিয়ারিং-এ বসা মার্বেলহেডের লোকটি বললে, 'এগোব, স্যর?'

'আর একটু।'

দাঁড়গুলো কেঁপে উঠে জলে পড়ল ঝপাঝপ। গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেন উৎরাই-এর দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল যে জার্মানেরা কাদার মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যেই হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে।

তখনও কামানগুলোর জন্যে দুঃখ করতে করতে নক্স বিষণ্ন গলায় বললেন, 'বরং এখনই ছাড়ুক।'

মস্ত লোকটি মাথা নাড়লেন, 'আমরা যাব এইবার।'

হালের লোকটি হাল ঘুরিয়ে নিল; দাঁড়গুলো জল কাটতে লাগল। জলের মধ্যে গিয়ে নৌকো পড়তেই জার্মানেরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে অনেক কামান দাগল।

সর্বাধিনায়ক প্রায় নড়লেনই না। ইতিমধ্যেই তিনি ঢুলছিলেন। আর এক মুহূর্ত পরে তিনি ঘুমিয়েই পড়বেন। এখন তিনি ভাবতে চাইছেন না। যেমনই হোক, এখনও তাঁর একটি সেনাবাহিনী আছে। পরে ভাববার সময় পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় পর্ব : মানহাট্টান দ্বীপ

২৯শে অগাস্ট তারিখে নিউ ইয়র্ক শহরের নাগরিকেরা এই স্বস্তির খবরটুকু নিয়ে শুতে গেল যে বিপ্লবী বাহিনী অন্য কোন জায়গায় রয়েছে। এই সব কাজের মানুষেরা, সারবান মানুষেরা যারা জিনিসের মূল্য বুঝত এবং নিজেদের কাজেই নিবিষ্ট থাকত তারা, বিপ্লবী বাহিনীর কাছে এইটুকুই শুধু চেয়েছিল যে বাহিনী অন্য কোথাও থাকুক।

৩০শে অগাস্ট জেগে উঠে তারা ভয়ে, আতঙ্কে আবিষ্কার করল যে স্বাধীনতার বাহিনী ফিরে এসেছে। আদর্শ শৃঙ্খলায় নয় সত্যি; ঢাক-ঢোল বাঁশী কিছুই বাজেনি; ইয়াংকি চাষীরা ঘন-নিবদ্ধ হয়ে, সৈনিকের মত পদক্ষেপ করার চেষ্টাও করছে না; পালক-লাগানো টুপিও নেই, উদ্ধত দম্ভোক্তিও নেই; বদলে রয়েছে এলোমেলো, গুটিগুটি-মেরে-চলা জনসমষ্টি। তারা নিঃশব্দে, নিরানন্দে শহরটিকে দখল করে বসেছে।

নগরের লোকেরা সকালবেলা দোকান খুলতে এসে, খড়খড়ি সরাতেই দেখল স্বাধীনতার সৈনিকেরা রাস্তা দিয়ে চলেছে—তারা বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে, চোখ নিষ্প্রাণ কাঁচের মত; তারা পরাজিত।

সর্বাধিনায়ক অন্ধকারের গভীর গহ্বরে ঘুমোচ্ছেন; মাঝে মাঝে সে অন্ধকারে বন্দুকের গুলির ক্ষীণ আলোর খোঁচা। তিনি অস্বস্তিতে ঘুমোচ্ছেন না, ঘুমোচ্ছেন একখানা কাঠের কুঁদোর মত, ক্লান্তিতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ব্রুকলিন ছাড়ার জন্যে নৌকোতে পা দেবার পরে সব কিছু তাঁর কাছে ঐ ক্লান্তির কুয়াশায় ঢেকে গেছে। পেছনে বন্দুকের গর্জনের মধ্যে তিনি বসে বসে কেমন করে ঢুলেছেন সে কথা তাঁর প্রায় মনেই নেই; আর মনেও নেই যে জড়িয়ে জড়িয়ে কেবলই বলছিলেন পেছনে কি যেন ফেলে এসেছেন। জামা-কাপড় খোলবার, কোনমতে এগিয়ে দেওয়া এক গেলাস মদে একটু একটু করে চুমুক দেবার কোন স্মৃতিই তাঁর নেই। চুমুক দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন তাও মনে নেই; মনে নেই ফিসফিস করে, যেন স্বপ্নের মধ্যে তিনি আদেশ জারি করেছেন।

ঘুমের মধ্যে যুদ্ধ আরও স্পষ্ট, আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে; একবার তিনি তো কর্কশ গলায় চিৎকার করেই উঠলেন, কানে 'ইয়ংকি, ইয়ংকি' শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে হতে। কিন্তু তারপরে তিনি গভীর, শান্ত নিদ্রায় অভিভূত হলেন।

সারা সকাল বিকেল ঘুমোলেন, সন্ধ্যা যখন হচ্ছে তখনও ঘুমোচ্ছেন। তাঁর পরিকল্পনা কি জানবার খুব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অফিসারেরা তাঁকে জাগাবার মত মনের জোর পেল না। তাঁর চেয়ে কমবয়সীদের জাগার পালা এত দীর্ঘ, এত যন্ত্রণাদায়ক হয়নি। এখন তারা উঠে পড়ে, তিনি যে ঘরে ঘুমোচ্ছেন, সেই ঘরের চারদিকে ছোট ছোট দলে জটলা করছে।

তাদের কথা হল কেবল যুদ্ধ নিয়ে এবং ব্রুকলিন থেকে অবিশ্বাস্যভাবে পালানো নিয়ে। ক্ষতি যে কি পরিমাণ হয়েছে তা তারা কেউই বোঝেনি—ব্রুকলিনে তারা হারিয়েছে লড়াকু বাহিনীর পুরো এক-পঞ্চমাংশ। বয়েস কম থাকার ফলে তাদের এক রকমের একরোখা যুক্তিহীন আত্মপ্রত্যয়। খামার থেকে, দোকান থেকে তারা এসেছে এই অপূর্ব অভিযানে, আর যখন সেই অভিযান হঠাৎ শেষ হয়ে যাবার আশংকা হল তখন তারা পালাল। ফলে একটি কথা তাদের কাছে সুনিশ্চিত :

পালাতে তারা সব সময়েই পারবে।

সেইখানেই গুটিগুটি মেরে ঢুকে পড়েছে। কেনাল স্ট্রীটের ওপর ডাচেদের কতকগুলো গোলাবাড়ি ছিল। সেই প্রত্যেকটি বাড়ি এখন স্বাধীনতার যোদ্ধায় ভরা—তারা নাক ডাকাচ্ছে, জ্বরে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে, অভিযোগ অনুযোগ করছে। কতকগুলো ইয়াংকি খানার মধ্যেই শুয়ে পড়েছে: অন্যেরা বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে কুঁকড়ে-শুঁকড়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। দুজন লেফ্‌টেনান্ট এবং চারজন প্রাইভেট বাওয়ারি লেনের কাদার ওপরে বিছানো তাঁবুর পর্দার ওপরেই শুয়ে পড়েছে। গীর্জা ভরে গেছে আহতে আর কাতরানিতে কিন্তু তাদের দেখবার জন্যে না আছে ডাক্তার না আছে নার্স। পার্ল স্ট্রীটে কাদায় মুখ থুবড়ে একটা ছেলে মরে পড়ে রয়েছে, কিন্তু সারবান নাগরিকেরা তাকে একটা মরা বেড়াল বা কুকুরের চেয়ে বেশী কিছু ভাবছে না। মিল স্ট্রীটে ইহুদিদের মন্দিরে অসুস্থ আর আহতের এত ভীড় যে বুড়ো মানুষদের বসে প্রার্থনা করবার জায়গা নেই। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে, একদিন যারা তাদের ছেলে নাতি ছিল সেই সব ক্লিষ্ট. আর্ত জীবদের আর্তনাদ কানে আসে। আধ কোম্পানি ডেলাওয়্যার সুইডেরা ফ্রন্সেস ট্যাভার্নের সবটুকু রস শেষ করে, বেশীর ভাগ আসবাবপত্র ভেঙেচুরে, মেঝেতে শুয়ে পড়েই ঘুমোচ্ছে। একটি ব্রিগেডের হতাবশিষ্ট ১৪ জন পোল বোলিং গ্রীনে, জলে ভেসে-আসা কাঠ জ্বালিয়ে তার চারদিকে বসেছে, শরীরটাকে গরম করবার জন্যে নয়, ভেঙে-পড়া মনটাকে একটু চাঙ্গা করবার জন্যে। তারা ইংরেজির এক বর্ণ জানে না; স্লাভ ভাষায় দুঃখের গান গাইছে আর সেই সব দিনের কথা ভাবছে সেই সময়ের কথা যখন তারা উষর প্রিপেট জলার ওপর দিয়ে পশুর মত ছুটে পালিয়েছে: বলাবলি করছে যে যখনই মানুষেরা নিজেদের মুক্ত করতে চেয়েছে কোন প্রকারে তখনই এই রকমটাই ঘটেছে। একজন ভার্জিনিয়ান আর একজন রোড দ্বীপের ইয়াংকি, দুজনে দৈত্যের মত মারামারি করেছে ওল্ড স্লিপের উত্তরে ঝোপঝাড়ের ধারে; ভার্জিনিয়ান ইয়াংকির গলাটি কেটে দিয়ে ফেলে রেখেছে। রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে অঝোরে।

সারা সকাল এবং বিকেলের বেশীর ভাগটাই তারা ঘুমিয়ে কাটাল কিন্তু সন্ধ্যার দিকে তারা জেগে উঠল এবং সাহসও একটু ফিরে এল মনে। অন্ধকার গর্তগুলো থেকে বেরিয়ে এসে একটু কিছু খুঁজতে লাগল তেষ্টা মিটোবার জন্যে। মদের দোকানে চড়াও হল আর কোমরে বেল্টের নীচে দু-এক মগ মিষ্টি মদ সংগ্রহ করে তারা বীর বনে গেল। এদের মধ্যে এমন নাকি একজনও ছিল না যে তার ভাগের মত ভীতু ব্রিটিশ সৈনিক খতম

করেনি, এমন কি বেশীও; আর হেসিয়ানদের যা করেছে তা তাদের নাতিদের শুনে রাখার উপযুক্ত। যে ভার্জিনিয়ার বাবুটি এই সব কিছু বেবন্দোবস্তের জন্য দায়ী তাকে তারা শাপমন্যি দিতে লাগল আর বলল কি আশ্চর্য্য ব্যাপার লোকটির এমন যাচ্ছেতাই সৌভাগ্য যে নির্ভর করবার মত লোকও তার জুটে গিয়েছিল। যেমন যেমন আগুন থেকে লাল লাল কাঠের গুঁড়ি বেরিয়ে আসতে লাগল তেমন তেমন পরিমাণে মদ এদের পেটে গিয়ে পৌঁছাতে লাগল; দম্ভ পর্যবসিত হল কিছু করবার ইচ্ছায়। দলে দলে ইয়াংকিরা বেরিয়ে পড়ল কিছু কিছু ঐ অভিশপ্ত ভার্জিনিয়ানদের খুঁজে পাওয়া যায় কি না দেখবার জন্যে আর মেরীল্যাণ্ডের মানুষেরা দল বেঁধে তাদের সাথীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিল রোডদ্বীপবাসীদের মাথা ফাটিয়ে: প্রত্যেকের প্রতিই একটা চাপা ঘৃণা নিয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগল পেনসিলভ্যানিয়ানেরা, আর ডাউন ঈস্টারের লোকেরা দিব্যি করল যে নিউ ইয়র্কের আরামের ঘৃণ্য অভিজাতদের পক্ষে নিউ ইয়র্ককে তারা নরক করে তুলবে।

রীতিমত যুদ্ধ চলতে থাকে। রাস্তার পাথর বন্দুকের কুঁদোয় অনেক কাটা মাথা পিছনে পড়ে রইল। 'টোরি' বলে খ্যাত একজন মণিকার. স্বাধীনতাকামীদের প্রতি প্রেম জানিয়ে শহরে থেকে গিয়েছিল। তার দোকান ভেঙে চুরমার। কনেকটিকাটের পুরো একটি ব্রিগেড ঘড়ি আর ঘড়ির চেন দেখিয়ে গটমট করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মণিকারের দোকান থেকে দুটো ছেলে বেরিয়ে এসে ছুটল সৈনিকদের পিছনে। তাদের নাম অ্যারন বার এবং আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন। কৃশকায় ছোকরা হ্যামিলটন, চোখ দুটো মেয়েদের চোখের মত ভায়োলেট-নীল। সে কনেকটিকাটের লোকগুলোর মধ্যে নারকীয় কাণ্ড বাধিয়ে দিল। এই আবর্তে আরও অনেক ছোটখাটো ঘূর্ণির অভাব ছিল না। দুজন মাতাল ভার্জিনিয়ান একটা কাপড়জামা টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিল বলে নক্স তাদের মাথায় ভালো করে কষালেন আর বৃদ্ধ ইজরেল পাট্‌নাম্‌, হাতে তলোয়ার নিয়ে, রাস্তার পর রাস্তা ঘুরে কাদার মধ্যে থেকে ইয়াংকিদের বার করতে থাকেন; গাল দিতে থাকেন এমন চিৎকার করে যে, দুটো পাড়ার পরেও সে আওয়াজ শোনা যায়। অন্য অফিসারেরা এঁদের পদাঙ্কই অনুসরণ করলেন। নিউ ইয়র্কে যেই রাত্রি নামল শহরটি হয়ে দাঁড়ায় অনুনয়-বিনয়, শাপ-শাপান্ত, মাতাল সৈনিক, ক্রন্দনরত শিশু আর তিক্ত অভিযোগকারী নাগরিকদের এক উন্মাদাগার।

কথা কাটাকাটির আর শেষ নেই, সব ছেলেমানুষি। বন্দুক নিয়ে, বোলা

নিয়ে, রুমাল নিয়ে আর রুটি নিয়ে। ব্রুকলিন থেকে উন্মাদের মত বেরিয়ে আসার সময় যে যা পেরেছে তাই হাতিয়েছে, আর প্রত্যেকে অন্যের জিনিস নিজের বলে দাবী করছে। সরু সরু রাস্তা সৈনিকের ব্রিগেডে ভর্তি। মাতালেরা পথ হারিয়েছে, এমন কি রেজিমেন্টের নাম পর্যন্ত ভুলেছে, পালাবার সময় যে সব সাথী মরেছে তাদের জন্যে কাঁদছে। শত শত পলাতক সৈনিক পাগলের মত ছুটছে হার্লেম পাহাড়ের বনাঞ্চলের দিকে। অবস্থা আয়ত্তের একেবারে বাইরে।

তবু খোকামুখো অফিসারেরা চেষ্টা ছাড়েনি। রাত্রি বাড়তে বাড়তেই, কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু শৃঙ্খলা ফিরে এল এবং পরে, আবার, স্বাধীনতার বাহিনী ঘুমোতে আরম্ভ করল।

বিলি ছ বোতল ম্যাডিরা নিয়ে এলো। 'মদের মিষ্টি সরবতের বদলে,' বললেন শেয়ালশিকারী। গলায় আত্মবিশ্বাস নেই। প্রথম রসিকতার ক্ষীণ চেষ্টায় একটু মুচকি হাসলেন। তাঁর যুবক অফিসারেরা বহুদিন এ রকমটা শোনেনি। ম্যাডিরা ইনি খুব ভালোবাসেন। এখন ঘুম হয়েছে, বিশ্রাম হয়েছে, জামাজোড়া বদলে চুল আঁচড়ানো হয়েছে। এখন ম্যাডিরা না হলে চলে!

যে জন-বারো অফিসার গোল টেবিলটার চারিদিকে ভীড় করে বসেছিল তারা একটা সংগ্রাম-পরিষদ্‌ই তৈরী করেছিল বলা চলে। ভার্জিনিয়ান এদের ডেকে পাঠিয়েছেন পশ্চাদপসরণ, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এবং বিপ্লব নিয়ে কথাবার্তা বলবার জন্যে। উপস্থিত আছেন নক্স, পাট্‌নাম্‌, মার্সার, মিফলিন, স্পেন্সার, ক্লিনটন এবং অন্যান্যেরা—জেনারেল, মেজর জেনারেল, কর্নেল এবং সেই হ্যামিলটন ছেলেটা যার হাতের লেখা এত ভালো। সে একধারে বসে আছে খোলা নোটবুক হাঁটুর ওপর রেখে। উনিশ বছরের ছেলে সে একটু সম্ভ্রম বোধ করছে এই বিশ-ত্রিশ বছরের লোকগুলোকে দেখে।

প্রথমে যখন এরা টেবিলের ধারে এসে জমলো তখনও সর্বাধিনায়ক এসে উপস্থিত হননি। যে বাহিনীকে তিনি এমন আশ্চর্যরকমে ফিরে পেয়েছেন তাদের উদ্দেশে, খুব কষ্টে, তিনি এতক্ষণ শোবার ঘরে বসে, একটি ছোট টেবিলের ওপর, একটি বার্তা রচনা করছিলেন। তিনি লিখতেন খুব কষ্টে, এমন কি লজ্জায় কেন না তাঁর বানান ভুল হত। খুব ভালো লেখার এই কালে তাঁর রচনা সর্বোৎকৃষ্টের মধ্যে ধরা চলে না। তিনি যে সমস্ত শব্দ ভালোবাসতেন সেগুলো প্রায় বিনয়, মিনতির সামিল তবু সারা-

জীবন কথা তাঁকে এড়িয়ে গেছে; তিনি ভাষায় আবেশ-প্রকাশে অক্ষম। আকাশ ভেঙে পড়লেও তিনি শুধু এই অঘটনটির সংবাদটুকু দিতে পারেন। এতে তাঁর লজ্জা হত এবং তিনি সচেতন হয়ে উঠতেন যে তিনি কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছেন।

তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা লিখে ফেলা বিশেষ শক্ত। এই এক ঘণ্টা হয়ে গেল তিনি লিখছেন এবং সত্যের অপলাপগুলো কাটছেন; শেষ করলেন এমন কিছু লিখে যা সবটুকু পড়বারই তাঁর সাহসের অভাব।

আপন মনে বললেন, 'ওরা হাসবে।' মনস্থির করে ফেললেন যে ওরা যদি হাসে তিনি কথায় আর বিশ্বাস করবেন না; শুধু গভীর প্রশান্তিতে আর অচপল দৃষ্টি দিয়ে ওদের দিকে চেয়ে থাকবেন।

শোবার ঘর ছেড়ে যাবার আগে নিজেকে সযত্নে আয়নায় একবার দেখে নিলেন। মুখখানাকে করলেন প্রশান্ত, আর যেন সব জানেন। মনে মনে তাঁর এই একটু সন্তোষ যে ওরা পরে পরস্পরে বলাবলি করবে:

'ওঁর শিরা দিয়ে বরফ বইছে; এতটুকু বিচলিত নয়। ওটা ধোঁকা হতে পারে তবে খুবই সম্ভব যে উনি সবই জানেন। ব্রুকলিনের ঐ সমগ্র যাচ্ছেতাই ব্যাপারটা ওঁকে বিচলিত করে না।'

কোটের পাট ঠিক করে নিলেন, জাফ্রানী রঙের ব্রিচেসের ভাঁজগুলোও নিলেন সমান করে। হাতের কাফে ছুটি লেস বিলি সেলাই করে দিয়েছে। যে অলস ভাবটি তিনি খাসা ধারণ করতে পারতেন সেইটি ধারণ করে লেস ছুটিকে কব্জির ওপর ঝুলতে ছেড়ে দিলেন। বুট পরতেন না। বিশেষ উদ্দেশ্যে সাদা সিল্কের মোজা আর কালো পাম্পশু পরতেন। লোকে যাতে বলতে পারে যে যুদ্ধের জন্যে নয়, নাচের জন্যে তিনি প্রস্তুত—বিচলিত একেবারেই নয়। হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, বুঝলেন যে ওদের আধ-ঘন্টার ওপর অপেক্ষা করিয়ে রেখেছেন। ঢুকলেন তখন, ইচ্ছাকৃত বিলম্বে—ছ ফুট আড়াই ইঞ্চি দীর্ঘ মানুষ—লোহার ডাণ্ডার মত কঠিন, অনমনীয়।

মদ ঢালা হলে তিনি প্রথমে শ্রদ্ধা জানালেন: 'আন্তর্জাতিক কংগ্রেসকে', শান্ত কণ্ঠে বললেন কিন্তু বিস্ময়ে ভাবলেন কঠিন হয়ে, কতদিন আর এ চলবে, আর বড় জোর ক'দিন ক'সপ্তাহ পরে আবার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হবে 'কৃপাময় মহারাজকে'। চারদিকের ছেলেগুলো ধীরে ধীরে, চিন্তিত-মুখে মদ খেতে খেতে তাঁর চিন্তাকেই প্রতিফলিত করল।

দ্বিতীয় শ্রদ্ধাটি জানানো হল 'আমেরিকাকে'। তাঁর লোকেরা তাঁর দিকে একটু বিস্ময় একটু অনিশ্চয়তার দৃষ্টিতে তাকাল। মজা মারছেন, না চতুর

হচ্ছেন, না বোকামি করছেন। ইনি ভার্জিনিয়ার লোক তো। এরা ইয়াংকি, বেশীর ভাগই, কখনই ভুলতে পারে না যে ইনি ভার্জিনিয়ান। তাদের কানে 'আমেরিকা' শব্দটা অদ্ভুত, বিদেশী শোনাল।

'আমেরিকার জন্যে, ভদ্র মহোদয়গণ,' উনি বলেছিলেন।

তৃতীয়বার শ্রদ্ধাপান হল সেই সব বীরেদের জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছে—গুলিতে না হয় পিঠে তলোয়ারের খোঁচায়, না হয় পায়ে পায়ে পিষে। এদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝলেন যে এরা বেশী করে ভাবছে, যারা মরেছে তাদের চেয়ে যারা পালিয়েছে তাদের কথা। আপন মনে বললেন, 'ঐ ভাবেই চলুক। শুধু বিচার কর না।'

চতুর্থবার শ্রদ্ধাপান হল ভবিষ্যতের জন্যে, নিজেদের অস্ত্রচালনার সাফল্যের জন্যে। এইবার তাদের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হল তিনি যেন বিশ্রী কিছুর একটা উল্লেখ করেছেন, যে কথা বলবার নয়।

পঞ্চম স্বাস্থ্যপান হল তাঁর অফিসারদের জন্যে। প্রস্তাব করেই দেখতে পেলেন তাদের মুখে রক্তিম আভা। তাদের এই শ্রদ্ধায় তিনি কেমন একা বোধ করলেন, শ্বাস যেন রোধ হয়ে এল।

বিলি আরও ম্যাডিরা নিয়ে এল।

পরের স্বাস্থ্যপান তাঁর জন্যে, 'আন্তর্জাতিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মহামহিম জর্জ ওয়াশিংটনের জন্যে।'

এই সমস্ত পরিবেশটি তিনি যেমন করে তৈরী করে আজ এইখানে এনেছেন, এই একগুঁয়ে ছেলেগুলোর প্রতিটি মনোভাবের হিসেব কষে, নিজের প্রতি সেইজন্যে ঘৃণায় তিনি শান্ত, প্রায় ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'আপনাদের ধন্যবাদ, ভদ্রমহোদয়গণ।'

তাদের যেমন খুশি কথা বলতে দিয়ে তিনি বেশীর ভাগ সময়টাই চুপ করে বসেছিলেন। মনে মনে জানতেন কি তিনি করতে চান এবং সেটা কত অসম্ভব। তিনি যা চাইছিলেন তা হল পশ্চাদপসরণ, অবিরাম পশ্চাদপসরণ, দীর্ঘ কষ্টকর পিছুহটা যা তাঁর লোকগুলোকে এক মুহূর্তের জন্যেও এক জায়গায় তিষ্ঠতে দেবে না, কিছু ভাবতে দেবে না, কোথাও পালাতে দেবে না। ব্রুকলিনের ব্যাপারটা একটি বিশেষ সত্যের দিকে তাঁর চোখ খুলে দিয়েছে: সেটা এই যে মূল্য আছে শুধু তাঁর সেনাবাহিনীরই। ঈশ্বরের দয়ায় তাঁর বাহিনীটি এখনও আছে। অন্য কিছুতে যায়-আসে না। বাহিনী নিয়ে তিনি সরে পড়বেন—নিউ ইয়র্ককে জ্বালিয়ে ধূলিসাৎ করে দেবেন আর ব্রিটিশেরা যখন নিউ ইয়র্ক দখল করবে তখন শীতে ছাউনি ফেলবার জন্যে

শুধু ছাই-এর গাদা। প্রয়োজন হলে মাসের পর মাস চলবেন, অ্যালিঘে-নিজের বিশাল সবুজ উচ্চতা পার হয়ে চলে যাবেন—কিন্তু বাহিনীটিকে ঠিকঠাক ধরে রাখবেন।

তবু জানতেন তা অসম্ভব। কংগ্রেস তাঁকে সর্বাধিনায়ক করেছে যুদ্ধ লড়বার জন্যে আর সেই সব যুদ্ধ করবার জন্যে তাঁকে দিয়েছে ইয়াংকি শিশুদের দল।

নক্স বলছিলেন, 'আমরা যথেষ্ট নিরাপদ। দ্বীপের ওপরে আছি। দ্বীপ একটা দুর্গের মত—যতদিন খুশি ধরে রাখা যায়।'

'বোধ হচ্ছে সেইখানেই চিরকাল থাকতে হবে।'

'ওসব বাজে কথা রাখ। পোড়াও শহরটাকে। তারপর বেরিয়ে পড়ি ; ওদের জন্যে শুধু ছাই রেখে যাই।'

'পুড়িয়ে দেবে?'

'হাঁ, পুড়িয়ে দেব। তাই বলেছি। পুড়িয়েই দেব।'

'আমি এইখানে বাস করি, মশাই।'

স্বাস্থ্যপানের উজ্জ্বল উষ্ণতা ঝগড়ায়, ঘৃণায়, অবজ্ঞায় শেষ হয়ে গেল। চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল সকলে। রণকৌশল তখন হয়ে পড়ল ব্যক্তিগত দায়।

প্রকাণ্ড লোকটি বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ!'

তখন তারা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে রইল, শুনল, অধিনায়ক বলছেন যে তিনি চেয়েছিলেন তারা নিউ ইয়র্ক পুড়িয়ে দিক কিন্তু কংগ্রেসের বারণ। আর কংগ্রেসের নীতির গুণাগুণ নিয়ে কোন আলোচনা শুনতে তিনি রাজী নন।

'স্যর, পশ্চাদপসরণ?'

উনি মাথা নেড়ে বললেন, 'শহরের কিছুটা আমরা দখলে রাখবার চেষ্টা করব।'

কিছু ঠিক না করতে পেরে তাঁর দিকে তাকাল এরা। এটা আবার ওঁর আর একটা কৌশল না কি? ব্রুকলিনে কি চালাকিটাই না দেখিয়েছেন!

গলায় একটু হতাশার আমেজ এনে তিনি বললেন, 'কিংস্‌ব্রীজ আমরা রাখবই। কিংস্‌ব্রীজ একটু দূরে, এই দ্বীপের একেবারে উত্তর কোণে, স্পিউটেন ডিউভিল-এর ওপর দিকে একটি কাঠের সাঁকো।'

বুড়ো পাট্‌নাম্‌ ভীত হয়ে মাথা নাড়লেন ; ঐ সব মাথাগরম ছেলেদের মধ্যে তাঁর নিজেকে কেমন বোকা, প্রাচীন মনে হল।

মিফলিন একটু বেশী খেয়েছেন। বিশেষ করে ব্রুকলিনের ঘটনার পর এবং ভার্জিনিয়ানের নিঃস্বার্থ ক্ষমাপ্রার্থনার পর শেয়ালশিকারীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেছে। তিনি বললেন, 'যাই কেন না ঘটুক, আমরা ফোর্ট ওয়াশিংটন ধরে রাখতে পারব—সে নরকের মত হিম জমলেও পারব।' এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। দুর্গটা তাঁর নিজের, নিজের নামে প্রথম দুর্গ। তাঁর এবং যে কংগ্রেস তাঁকে নির্বাচিত করেছে তার সম্মানে বিশাল আমেরিকার এই স্থানটিকে সর্বপ্রথম তাঁর নামাঙ্কিত করা হল। তবু তাঁর সামনে প্রায় উল্লেখই করা হত না। সকলে তার বদলে বলত 'দুর্গ'টা অথবা টিলাগুলোর উত্তরে পাহাড়টা।'

নামটার ওপর জোর দিয়ে নক্স সলজ্জে বললেন, 'ফোর্ট ওয়াশিংটনটা আমরা রাখতে পারি।' অন্যেরা মাথা নেড়ে সায় দিল।

দেখলেন যে এই সব কথা আর বেশী তিনি সহ্য করতে পারবেন না; তাঁর জীবন কেটেছে তাঁর গোত্রীয় মানুষদের মধ্যে, ভার্জিনিয়ার অভিজাতদের সঙ্গে, ইয়াংকি ছেলেদের সঙ্গে নয়। তাঁকে কখনও এরা ভালোবাসেনি—সম্মান করেছে, তারিফ করেছে, কিন্তু ভালোবাসেনি। তবু এটা জেনে একটা আনন্দের মাদকতা আসে যে, তিনি যেখানে বলবেন সেখানে এরা যাবে, দরকার হলে নরকে পর্যন্ত—যেখানেই তিনি নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাবেন। এইটি তিনি স্বেচ্ছায় কখনও করেননি। প্রথমে এরা তাঁকে ঘৃণা করত তবু ঘৃণার বদলে তিনি ন্যায় ব্যবহারই করতেন। বাকীটা—অর্থাৎ তিনি যে তাদের চোখে নির্ভীক, সম্মানের যোগ্য, দেখতে বিস্ময়কর। সম্ভ্রমের যোগ্য প্রতিভাত হতে পারেন—এটা তাঁর মনেই হয়নি। তাই তাদের ভালোবাসা তাঁকে কেমন বিমূঢ় করে ফেলে, বড় বেশী নাড়া দেয়—আরও বেশী করে এই জন্যে যে, এদের মনোভাবের কারণগুলো পুরোপুরি তিনি বুঝতেন না।

অসহায়ভাবে তিনি বললেন, 'দেখি, যা পারি তা করা যাবে।'

বুড়ো ইজরায়েল মিনতি করলেন, 'ওদের সঙ্গে এখানে আমরা কিছুতেই লড়ব না কিন্তু।'

'যা আমরা করতে পারি এবং আমাদের করতেই হবে—'

'শহরটাকে আমাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

'না!'

ছ গেলাস ম্যাডিরা খেয়ে মত্ত স্পেন্সার চিৎকার করে উঠলেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, শহরটাকে রেখে, ঐ ঘৃণ্য শুয়োরগুলোকে উড়িয়ে দিন নরকে!'

'স্যর, আপনি বড্ড মদ খেয়েছেন,' বুড়ো ইজরায়েল শান্ত কণ্ঠে বললেন।

'উচ্ছন্নে যাওয়া বুড়ী, তোমাকে নরকে যেতে দেখার মত স্থির বুদ্ধি আমার আছে!'

ভার্জিনিয়ান, নিঃস্নেহ কণ্ঠে, 'স্পেন্সার, চুপ কর!'

এর পরেই দীর্ঘ স্তব্ধতা প্রত্যেকেরই নির্বাক স্বীকৃতির লক্ষণ।

সর্বাধিনায়ক বললেন, 'আপনারা সকলে নিজের নিজের ব্রিগেড গঠন করুন; রাস্তা থেকে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসুন আর তারা যা যা চুরি করেছে সব তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিন। সাধারণ চোরেরা তিরিশ ঘা বেত খাবে, বাহিনী থেকে পলাতকেরা একশো ঘা আর বলাৎকারের জন্যে পাঁচশো ঘা। এটা আমি চাই, বুঝলেন। ওদের, আমি ওদের কুচকাওয়াজ করতে দেখতে চাই। যারা তাদের বন্দুক ফেলে দিয়েছে তারা কিছু একটা সংগ্রহ করুক, বন্দুক না পাক, একখানা বর্শা কাঁটা বা ছুরি। আমি সৈনিকদের জন্যে একটা হুকুমনামা লিখেছি— এতে তাদের মনটা চাঙ্গা হবে, কাজে একটু অনুরাগও আসবে। আপনাদের এখনই পড়ে শোনাচ্ছি। আমার সচিব সেটির অনুলিপি তৈরী করলে কাল আপনারা ব্রিগেডগুলিকে পড়ে শোনাবেন। এই যে হুকুমনামাটা—যেমন আমি লিখেছি।

'এখন আমাদের সমগ্র বাহিনী একত্রিত হয়েছে। আর জলের বাধা আমাদের নেই, ফলে শত্রু জাহাজ থেকে আর কোন সুবিধা পাবে না। ওদের বাহিনী অনেক ভাগে বিভক্ত, বিভক্ত হবেই; জাহাজে জাহাজে যোগাযোগ রাখার জন্য তারা এখন ক্লান্ত; কিন্তু আমাদের বাহিনী একত্রিত এবং একসঙ্গে কাজ করতে পারবে। এত অসুবিধা সত্ত্বেও তাদের তীরে নামতেই হবে। অফিসার ও সাধারণ সৈনিকেরা যদি সতর্ক এবং প্রস্তুত থাকলে হঠাৎ আক্রমণ রুখতে পারবেন এবং শত্রু এগোলে সাহস দিতে পারবেন। আমাদের জয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।

সেনাপতি আশা করেন যে অফিসারেরা, ছোট বড় সকলে, অপূর্ব মর্যাদায় জয়লাভ করতে কৃতসঙ্কল্প হবেন নতুবা মরণ বরণ করবেন। আমাদের উদ্দেশ্যের ন্যায্যতা, বন্দরের অবস্থান এবং আমাদের সন্তানদের বীর্য—এ সব থেকে আমেরিকা শুধু জয়ের আশাই করতে পারে। প্রত্যেকেরই এখন যতখানি সম্ভব চেষ্টা করবার সময় এসেছে যাতে আমাদের দেশ মহিমান্বিত হতে পারে অথবা হয়ে উঠতে পারে ঘৃণিত।'

বলা শেষ হল—সব প্রকাশ হয়ে গেল। ইনি সোজা সামনে তাকিয়ে রইলেন ওদের হেসে ওঠার অপেক্ষায়। কেউ কিন্তু হাসল না। ধীরে ধীরে

নক্সের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ জলে ভরা।

ইতিমধ্যে হাজারো পলাতকের একজনকে প্রহরীরা কিংস্‌ব্রিজের কাছে ধরে ফেলেছে। লোকটি ভার্মন্টের। সে ধস্তাধস্তি করে, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ রোষে, পালানো অসম্ভব দেখে, হাল ছেড়ে দিল। কৌতূহলী হয়ে সৈনিকেরা তার প্রকাণ্ড ব্যাগটা খুলে দেখে একখানা শুয়োরের ঠ্যাং, মেয়েদের রেশমী পোশাক আর নিউ ইয়র্কের নানা দোকানের নানাবিধ সামগ্রী। এ সবই তারা বুঝল, তারিফ করল তার লুটের সামর্থ্যকে। কিন্তু একটা আট পাউণ্ডের কামানের গোলা দেখে তারা তাজ্জব :

জিজ্ঞাসা করে, 'এটা কি ?'

'আস্ত হাঁদা সব। কামনের গোলা।'

'কি জন্যে ? গোলা-বারুদ চুরি করছ কেন ?'

'হায় কপাল ! শালা সব মাথামোটা। সরষে গুঁড়ো করবার জন্যে একটা ভারী কিছু নিয়ে যাচ্ছি।'

৬. রবিবারের এক ভীষণ সকাল

মানহাট্টান দ্বীপের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে নিউ ইয়র্ক নামে একটি গ্রাম। গ্রামটি কতকগুলি ছোট ছোট বাড়ির সমষ্টি। সেইখান থেকে হার্লেমে তাঁর সদর দপ্তরে, চোদ্দই সেপ্টেম্বর শনিবারের এক স্নিগ্ধ বিকাল বেলায়, ঘোড়ায় চড়ে আসতে আসতে, ভার্জিনিয়ার জমিদার গত দু সপ্তাহের ঘটনাবলী মনে মনে বিচার করছিলেন।

সবকিছু ভেবে দেখলে, ব্যাপারটা তাঁর হাতে মোটামুটি খারাপ উতরোয়নি। ভেবে দেখলেন, একটু স্বস্তিতেই যে, ব্রুকলিন থেকে একান্ত দুর্দশায় যে বিশৃঙ্খল মানুষের দল পালিয়েছিল তাদের এখন আবার অন্ততঃ একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর রূপে দেখা যাচ্ছে। নিউ ইয়র্কে ফিরবার পরে, দু সপ্তাহ আগে, তিনি একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন : লোকগুলি পালাচ্ছিল, একে একে নয়, দশ-বিশজনের দল বেঁধে নয়, একেবারে ব্রিগেড কে ব্রিগেড। শৃঙ্খলা যেন সব ভুলে গিয়েছিল। নিউ ইয়র্কের কাছে সেনাবাহিনী ত্রাস হয়ে উঠেছিল—রাস্তায় মারামারি করে, ঝগড়া করে, লুটপাট করে, বলাৎকার করে, খুন করে। রীতিমত যুদ্ধ হয়ে গেছে একদিকে ভার্জিনিয়া ও উত্তর ক্যারোলিনা এবং অন্যদিকে নিউ ইংল্যাণ্ডেরা। মনে হয়েছিল সারা বাহিনীই যেন এই ভেঙে পড়ল বলে।

কেবল ঈশ্বরের কৃপাতেই ব্রিটিশেরা মানহাট্টানে আক্রমণের চেষ্টা করেনি এবং তাঁর আশা করতে সাহস হচ্ছে যে ওরা খুব দেরী করে ফেলেছে। বাহিনী উনি এখন তিন ভাগে নতুন করে সাজিয়েছেন—এক ভাগ বৃদ্ধ পাট্‌নামের অধীনে, নগরটি রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে; আর এক ভাগ হীথের অধীনে কিংস্‌ব্রিজের সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম রক্ষার জন্যে; আর তৃতীয়টি স্পেন্সারের অধীনে, মাঝখানে মানহাট্টান রক্ষার জন্যে। স্পেন্সার সম্পর্কে তিনি স্থিরতা পাচ্ছিলেন না কেন না তাঁকে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না এবং বোকা মনে করতেন, কিন্তু বাকী হাতের কাছে একজন মাত্র মেজর জেনারেল, যাঁকে তাঁর ভাল লাগত এবং যাঁকে তিনি বিশ্বাস করতেন, সেই ন্যাথ্যানিয়েল গ্রীন ব্রুকলিনের আগেই জ্বরে পড়ে এই সবেমাত্র সেরে উঠছেন। গ্রীন না ফিরে আসা পর্যন্ত স্পেন্সারকে দিয়েই কাজ চালাতে হবে এবং এখন এই হেমন্ত-উজ্জ্বল বিকেলের স্নিগ্ধতায় ভার্জিনিয়ানের মনে অপূর্ব উৎসাহ এল, বিরক্তি একেবারেই উবে গেল।

গত দু সপ্তাহে এমন সব সময়ও গিয়েছে যখন নিতান্ত হতাশায় মনে হয়েছে দেহে আর এতটুকু শক্তি নেই। তখন নৈরাশ্যে, ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি বিছানায় শুয়ে থেকেছেন। এই যখন কংগ্রেস, ব্রুকলিন টিলায় হাজারেরও বেশী লোক খোয়া যাওয়ায়, সাহস একেবারে হারিয়ে, ডক্টর ফ্র্যাঙ্কলিন এবং মিঃ জন অ্যাডাম্‌স্‌কে পাঠিয়েছিলেন, সেনাপতি হো-র সঙ্গে আত্মসমর্পণের কথা আলোচনা করবার জন্যে। তিনি কংগ্রেসের হুকুমের দাস, প্রতিবাদ করতে পারেননি; সৈনিক হিসাবে আদেশ গ্রহণ করেছেন; কিন্তু ভগ্নহৃদয়ে, যাঁরা তাঁর চারিদিকে ছিলেন এবং যাঁদের তিনি জানতেন এবং আগে কখনও এত ভালোবাসেননি, তাঁদের কাছে মিনতি করেছেন—এই যেমন নক্স, পাট্‌নাম্‌, মিফলিন: 'কেন, কেন, কেন? কেন আত্মসমর্পণ?'

ওঁরা বলেছেন, 'না, ঘটনা ওরকম মোড় নেবে না; আত্মসমর্পণের কোন কথাই হবে না।'

সখেদে তিনি বলেছেন, 'তাঁরা আমাকে যুদ্ধ করতে দিলেন আর তারপর অ্যাডাম্‌স্‌ আর ফ্র্যাঙ্কলিনকে পাঠালেন আত্মসমর্পণের কথা বলতে। স্বাধীনতার জন্যে মানুষ মরেছে এতে কি আসে যায়।'

'আসে যায়, স্যর,' ওঁরা বোঝাবার চেষ্টা করেন।

'ফ্র্যাঙ্কলিন বুড়ো মানুষ; তাঁর কোন হিম্মৎ নেই।'

'উনি হাল ছেড়ে দেবেন না।'

'অ্যাডাম্‌স্‌ই তো আমাকে এই পদে বসিয়েছেন। এখন কি তিনি ভয়

পেয়েছেন ?' পরে যোগ করেন, 'ওঁরা সবাই ভয় পেয়েছেন। এই হল মোদ্দা কথা। তাঁরা ভীত, লড়াই ছেড়ে দিতে চান। ঈশ্বরের দোহাই, এই হল কথা। ওঁরা লড়াই থামাতে চান।'

পরে আলোচনায় যখন ডঃ ফ্র্যাঙ্কলিনের কাছ থেকে কিছু তীক্ষ্ণ রসিকতা ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না তখন ভার্জিনিয়ান বুঝবার চেষ্টা করলেন কেন তিনি এই ভেবে এত বিচলিত হয়েছিলেন যে ব্রুকলিনে থেকে অপমানে পালাবার পর বিপ্লব নিভে যাবে। আত্ম-বিশ্লেষণে তিনি মন্থর, অস্বস্তি বোধ করেন। এই কাজটাকে তিনি কেমন একটু নীচ কাজ মনে করতেন; তবু তিনি বিশ্লেষণ করে এটুকু অন্ততঃ বুঝলেন যে, নিজেকে নির্বুদ্ধি নয়, প্রতিভাবান প্রমাণ করবার তাঁর ইচ্ছাটা ছাড়াও এই ঘটনার অন্যান্য কারণও ছিল; অবশ্য তিনি ঠিক ধরতে পারলেন না সেই অন্য কারণগুলি কি ? নিশ্চয়ই তাঁর মধ্যে আর এই বিশৃঙ্খল ইয়াংকিদের মধ্যে কোন মনের বাঁধন ছিল না, ছিল না কোন বাঁধন বিদেশী বিপ্লবীদের সঙ্গে, দূর-দূরান্তরের দক্ষিণ দেশীয়দের সঙ্গে, তবু একটা জোর, একটা প্রবর্তনা ছিল—মনে একটা প্রতীক্ষার ব্যথা ছিল কিছু একটা তখনও না-দেখা অভূতপূর্ব, স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির জন্যে।

আজ কিন্তু তিনি এই বিশ্রী, অস্বস্তিকর আত্মবিশ্লেষণ ছেড়ে দিলেন—ছেড়ে দিলেন ভয়, দুর্ভাবনা, সন্দেহ। মুখে এসে যেন সুবাতাস লাগছে ফুরফুর করে; ঘোড়ার খুরের তলায় কাদামাটির রাস্তা। মধ্য-মানহাট্টানের মনোরম বনানীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন—আঁকাবাঁকা ছোট ছোট নদী, রূপোর মত ঝকঝক করছে পুকুরগুলো, দুদিকে পাথরের পাঁচিল-দেওয়া ক্ষেত। মনে হল, জীবনে কখনও, এমন কি তাঁর সাধের পোটোম্যাকের তীরেও এমন শান্ত প্রকৃতি-শ্রী দেখেননি। তিনি নিজে চাষী, গ্রামাঞ্চলের লোক। তাঁর পূর্বপুরুষেরাও চাষী এবং গ্রামাঞ্চলের লোক ছিলেন। তাই তাঁর সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রতিক্রিয়াগুলো স্বতঃস্ফূর্ত কালো পাহাড়ের ওপর দিয়ে গোলাপী আকাশের নীচে এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল কালো রেখায়, ডাচেদের পরিচ্ছন্ন ক্ষেতগুলিতে সোনার রঙের গমের দুলে-দুলে-ওঠা গাছের মাথা, একটু আগে-ভাগেই লাল-রং-ধরা অপূর্ব মেপ্‌লের রক্তিমাভা, পূবের দিকের আকাশের সবুজের তলায় হাওয়াকলটি, পথের ধুলোর ওপর দিয়ে দলে দলে যাওয়া কাঠবেড়ালিগুলো, সন্ধ্যাকালীন শিকারের সময়ের মত ডালকুত্তার ডাক, চেরা কাঠের বেড়ার ওপর বসে হেলতে-দুলতে থাকা গোলাপী-গাল ছেলেটা—অস্তায়মান সূর্য, বাতাস আর বেগে ভেসে চলা মেঘ।

অপূর্ব সুন্দর, অপরিমেয় সুন্দর জীবনের এই মুহূর্ত। এই কৃশকায় লোকটির কাছে জীবনকে ভালবাসা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাপার। ইনি সে জন্যে কৃতজ্ঞ জীবনের কাছে।

তাঁর সঙ্গে ছিল জনা-বার হাল্কা অস্ত্রধারী ঘোড়সওয়ার, সৈন্যদলের মোটে কয়েকটি অশ্বারোহী বাহিনীর একটি, ছিলেন মোটা কর্নেল নক্স। যে মানুষটিকে তিনি পূজো করেন তাঁর কাছাকাছি থাকার মুখে একটু একটু হাসছেন দাঁত বার করে; ছিলেন কমবয়েসী বার—এঁকে পাট্‌নাম্ পাঠিয়েছিলেন সর্বাধিনায়ককে হার্লেম টিলার ওপর সদর দপ্তরে নিয়ে আসতে। আর ছিলেন একজন লেফটেনান্ট গ্রেসন এবং ক্যাপ্টেন হার্ডি। বেশীক্ষণ কিন্তু হাল্কা বাহিনী হাল্কা থাকল না—দুজন দুজন পাশাপাশি যাওয়া শক্ত হয়ে উঠল। তারাও দল বেঁধে এগিয়ে গেল, শোভাযাত্রা এঁকেবেঁকে চলল; আর অফিসারদের মেজাজ এমন শরিফ যে তাদের আর কিছু বলতে মনই উঠল না।

লোকগুলো গান গেয়ে উঠল, তাদের চিরকালীন গান সেই ইয়াংকি বোকাটাকে নিয়ে যে টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে লণ্ডন শহরে গিয়েছিল। পংক্তি-গুলোর শেষ নেই, বেশীর ভাগই নোংরা কিন্তু ভাজিনিয়ার জমিদার মুখ কুঁচকে উঠলেন বিষয়বস্তুতে নয়, মনে হল সুরটা একেবারে বিশ্রী। তাঁর নিজের রুচি হল মোজার্ট আর বাকে। স্মৃতিতে মন হল ভারাক্রান্ত, বাঁশী নিয়ে যখন ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেত সুরের শক্ত শক্ত মিশ্রণ ঠিক করতে। নিজের গানের ব্যাপারে তিনি যেন ছেলেমানুষের মত। একটা নতুন গান যেই লণ্ডন থেকে এসে পৌঁছাল তিনি সাগ্রহে তার প্রেমে পড়ে গেলেন; একা একা দরজা বন্ধ করে বসে বাণীহীন সুরধারায় বাতাসে দীর্ঘশ্বাস তুলতেন, তবু এই ভেবে লজ্জিত হতেন যে, তিনি, সব বিষয়ের মত এই বিষয়েও, ঐ মাঝারি ধরনের।

নদীর ধার দিয়ে যে ব্লুসিংডেল রোড এঁকেবেঁকে গিয়েছে সেই পথ থেকে পূব দিকে ঘুরে তারা ঘোড়া ছোটাল উত্তর দিকে। পথটি চলেছে সুগন্ধ তৃণভূমির ওপর দিয়ে, গাছের দেওয়াল ভেদ করে,—এই গাছের দেওয়ালটি যেন সমস্ত দ্বীপটির উত্তর-দক্ষিণের মেরুদণ্ড। এরা একটা খামার-বাড়িতে থেমে শেওলা-পড়া কাঠের বালতি থেকে জল খেল, তারপর আবার উত্তর দিকে ঘুরে মর্নিংসাইড পর্বতমালার উঁচু খাড়াইয়ের তলা দিয়ে যখন গেল তখন গোধূলি নেমে আসছে। তিনি যে বাড়িটাকে তাঁর নতুন সদর দপ্তর হিসেবে ঠিক করেছেন সেটি এখান থেকে কয়েক মাইল মাত্র।

সাদা বাড়িটি জর্জীয় যুগের স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন ; প্রায় সখেদে মনে আনে মাউন্ট ভার্ণনকে। বাড়িটি ছিল ক্যাপ্টেন রোজার মরিসের এবং এই দ্বীপের ডাচ খামারগুলোর মধ্যে ছড়ানো অপূর্ব সুন্দর বাড়িগুলোর একটি। এই কদর্য বিপ্লবটার হীন পরিসমাপ্তির অপেক্ষায় ক্যাপ্টেন মরিস বেশ বুদ্ধি করেই ইংল্যাণ্ড চলে গিয়েছিলেন আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইয়ংকার-এ কয়েকজন টোরি বন্ধুর কাছে—দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলো কাটাতেন ইয়াংকি হতচ্ছাড়াদের সম্বন্ধে আলোচনা করে। এঁদেরই অনুপস্থিতিতে ভার্জিনিয়ান এঁদের বাড়িটি দখল করেছেন কেননা এটি আপাতদৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় স্থলে অবস্থিত, কিংস্‌ব্রীজের প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে এবং শহরের ন মাইল উত্তরে। আসলে নিয়েছিলেন কিন্তু এই কারণে যে বাড়িটি হার্লেম নদীর তৃণাস্তীর্ণ তীরের ওপরে অবস্থিত বলে মনে হয় যেন এটি আর একটি মাউন্ট ভার্ণন।

সেদিন অনেক রাত্রে, মাঝরাতের পরে, তিনি খুশিতে তাঁর সচিব রবার্ট হ্যারিসের কাছে মন্তব্য করলেন যে পরের দিন রবিবার পড়ায় তাঁর আনন্দ হচ্ছে, কেন না একদিনের বিশ্রাম পাওয়া যাবে। হ্যারিসন অবশ্য তাঁর জন্যে অপেক্ষাই করছিলেন।

বিশ্রাম বিশেষ হল না। জামা-কাপড় ছাড়তে আরম্ভ করেছেন কি না করেছেন এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এক বার্তাবহ মরিস সাহেবের বাড়িতে আচমকা ঢুকে পড়ে প্রধান সেনাপতির সঙ্গে দেখা করার দাবী জানাল।

ভার্জিনিয়ান শুনতে পেলেন হ্যারিসন বলছেন, 'তিনি শুয়ে পড়েছেন.'

'মনে হচ্ছে, উঠে পড়লেই ভালো হয়।'

'মুখ সামলে কথা বল, হতভাগা !'

ভার্জিনিয়ান সিঁড়ির ধারে এসে বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, হ্যারিসন। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।'

আঁটো ব্রিচেসের ঠেলে ওঠা, চামড়া-সর্বস্ব সেই ধড়খানা দেখে বার্তাবহটি একটু দাঁত বার করে না হেসে পারল না।

'ব্যাপার কি ?'

'লং আইল্যাণ্ড থেকে চার-পাঁচ হাজার ব্রিটিশ সৈনিক পার হয়ে ঐ দ্বীপে চলে আসছে।'

'কোন্ দ্বীপে ?'

'মন্ত্রেসর দ্বীপে,' বার্তাবহ টেনে টেনে বলল।

'তোমাকে কে পাঠিয়েছে ?'

'স্পেন্সার।'

'সেনাপতি স্পেন্সার! হতভাগা কোথাকার!'

হি হি করে হেসে বার্তাবহ বলল, 'সেনাপতি।'

রাগ চেপে, মুখখানা মনে থাকবে এবং সময়মত একে একটু-আধটু শিক্ষা দিতে হবে—সেই কথা মনে মনে বলতে বলতে, দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি সিঁড়ি দিয়ে বেগে ওপরে উঠে, কোনমতে কোটটি চাপিয়ে নিলেন এবং কোন কথা কাউকে না বলে, ছুটে বেরিয়ে গিয়ে, ঘোড়ায় চেপে, অন্ধকারের মধ্যেই দ্রুততম বেগে ধাবমান হলেন, লাগাম ছেড়ে দিয়ে। ঘণ্টাখানেকও লাগল না তাঁর স্পেন্সারের ছাউনির আগুন চোখে পড়তে।

সর্বাধিনায়কের কোটের নীচেই খালি পায়ের দিকে ভুরু তুলে তাকিয়ে, আলস্যে, টেনে টেনে স্পেন্সার বললেন, 'ঠিক আছে সব। নদীর ধার বরাবর আমি পরিখা খুঁড়ছি। ওরা দ্বীপে নেমেছে কিন্তু আজ রাতে এখানে আসছে না, কালও না। ওদের জন্যে জিনিস নিয়েই অপেক্ষা করে আছি। সব ঠিক আছে।'

দীর্ঘদেহ লোকটি মরিস সাহেবের বাড়িতে ধীর গতিতে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেলেন ; তাঁর খুশী উবে গেল ; গা হাত পা ব্যথা করতে লাগল। এই রকম একবার হয়েছিল ভার্জিনিয়ার অধিত্যকায় একটা ঝড় উঠবার পূর্ব মুহূর্তে।

পরে তাঁকে বলা হয়েছিল যে নদীতীর রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল কনেকটিকাটের বাহিনীর ওপর এবং সেই শনিবার সন্ধ্যাতেই স্পেন্সার তাঁদের ইস্ট নদীর তীর ধরে এগিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ অবতরণ ঠেকাতে মাটির প্রাচীর বানাতে পাঠিয়েছিলেন। এদের নির্বাচন করাটা ভালো হয়নি। তার কারণ এই নয় যে কনেকটিকাটের বাহিনী নিউ ইয়র্ক বা পেনসিলভ্যানিয়ার বাহিনীর চেয়ে নিকৃষ্ট। কারণ এই যে কনেকটিকাটের ব্রিগেডগুলোকে ভালো করে তদারক করা হয়নি, আর সেইজন্যে ছ হাজার সৈনিকের মধ্যে হাজার চারেক পালিয়ে যেতে পেরেছিল। বাকী দু হাজার মনে মনে তিক্ত, অসন্তুষ্ট, আর ইস্ট নদীর পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ পথে মাইলের পর মাইল অতি গভীর অন্ধকার রাতে হাঁটতে বাধ্য হয়ে তাদের মনে এতটুকু বেশী উৎসাহের সঞ্চার হল না।

এই কনেকটিকাট বাহিনীর নায়ক একজন মেজর গ্রে ; তিনিও অসন্তুষ্ট। তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি এবং যে সৈন্যবাহিনীতে বিশ ও ত্রিশ বছরের সেনাপতিরা রয়েছে সেখানে একজন মেজর হয়ে থাকায় তিনি

নিতান্তই বিরক্ত।

নদীতীরের যে অংশটা তাদের রক্ষা করার কথা সেই অংশটা মানহাট্টানের নিম্ন বিন্দু থেকে মাইল চারেক উত্তরে। সেই অংশে পৌঁছালে তাদের কাঁধের বোঁচকা নামিয়ে, থেমে গিয়ে পরিখা রক্ষার হুকুম দেওয়া হল। পরিখাগুলো তাড়াতাড়িতে খোঁড়া নালা বিশেষ, প্রায় ফুটখানেক গভীর; হুকুম এল পরিখাগুলো আরও গভীর করে খুঁড়ে, কাদামাটি, গাছের গুঁড়ি এবং চারিদিকে বনে ছড়ানো গাছের ডাল দিয়ে বেশ মজবুত মাটির প্রাচীর তৈরী করবার।

এই হুকুমগুলো মানার সত্যিকারের চেষ্টা কেউ করল না। সৈনিকেরা ক্লান্ত, ক্রুদ্ধ এবং তারা মনে মনে বেশ বুঝে নিয়েছে যে ফুটখানেক গভীর পরিখা নিয়ে সন্তুষ্ট হবার কিছু নেই। তারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল, কেউ পরিখার মধ্যে, কেউ পরিখার সামনে মাটির ওপরে, কেউ বা পিছনে। ঘুমোতে লাগল বেশীর ভাগই; কিন্তু অফিসারদের মনে যথেষ্ট দায়িত্ববোধ থাকায় সান্ত্রী দাঁড় করিয়ে পাহারা দেবার কিছু চেষ্টা করল।

তারা যে কিছু দেখতে পাচ্ছিল তা নয়, কালির মত অন্ধকার রাত্রি, এমনকি ইস্ট নদীর স্থির জলও কয়েক ফুট সামনে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বর সামনে পেছনে শুনতে পাওয়াটাও মনে একটু সাহস দেয়:

'সব ঠিক আছে!'

'সব ঠিক আছে!'

প্রায় ঘন্টাখানেকের মত একেবারে চুপচাপ—কেবল সান্ত্রীদের গলা শোনা যায়। তারপরেই শুরু হল অদ্ভুত চাপা সব শব্দ—ক্যাঁচক্যাঁচ, টানাহেঁচড়া, ঝপঝপ। শব্দগুলো শুরু হয়। থামে, আবার শুরু হয়, এবং ঘুমন্ত ইয়াংকিরা অস্বস্তিতে নড়েচড়ে। একটু পরেই সান্ত্রীদের বিষণ্ণ হাঁকের প্রত্যুত্তরেই যেন কালো নদীর মধ্যে থেকে প্রায় প্রতিধ্বনির মত শোনা গেল:

'অবস্থা সুবিধের নয়!'

সান্ত্রীদের ধীর পদক্ষেপ একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল।

'কে?'

'কে?' ব্যঙ্গ করে প্রতিধ্বনি ফিরে এল।

একজন সান্ত্রী নিস্পৃহ কণ্ঠে বললে, 'ঐ নদীতে কেউ আছে?'

টানা-হ্যাঁচড়া এবং ক্যাঁচকোঁচ শব্দের মধ্যেই ফিক্‌ফিক্ করে হাসি এবং

নদীর জলের কলকল শব্দ।

'সব ঠিক আছে,' সান্ত্রী অনিশ্চিত ভাবে বলে।

কালো নদীর জল থেকে উত্তর আসে, 'সুবিধের নয়—একেবারেই নয়।'

ক্যাপ্টেন এবং লেফটেন্যান্টরা পরামর্শে বসল এবং তারপরেই কয়েকজন নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে নদীর কিনারা পর্যন্ত গেল, কিন্তু কিছু দেখা গেল না, একেবারে কিছুই না।

একজন ক্যাপ্টেন মেজরের কাছে সংবাদ দিল, 'এক নৌকো ব্রিটিশ সৈনিক।'

'হুঁ, তাই মনে হচ্ছে।'

'এক ঝাঁক গুলি ছাড়ব স্যার?'

'লাভ কি? দেখতে তো পাচ্ছ না।'

'তা বটে,' লেফটেন্যান্ট ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, তারপর প্রায় বিজয়গর্বে বলে, 'ওরাও আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।'

'উচ্ছন্নে যাক! ঘুমিয়ে পড়,' বললে মেজর।

ক্যাপ্টেন ফের ঘুমোতে গেল কিন্তু সান্ত্রী একবার যেই বুঝতে পারল যে নদী থেকে আসা শব্দগুলোর মধ্যে ভূতুড়ে কিছু নেই অমনি রাতটাকে একটু আনন্দদায়ক করবার জন্যে একটু ইয়াংকি রসিকতা যোগ করতে আরম্ভ করল। দীর্ঘ, শ্লথ ঘন্টাগুলো ধরে এই রকম কথোপকথনই চলে।

উষার ধূসর আলোয় অন্ধকার কাটে, কুয়াশাও। কনেকটিকাটের লোকগুলো দেখে, তারা যা ভেবেছিল সেই এক নৌকো ব্রিটিশবাহিনী নয়, চারখানি বড় বড় জাহাজ, সামনে-পেছনে লাগানো, কামান সাজানো এবং গোলান্দাজেরা পাশে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে গোলা ছোঁড়বার জন্যে। আর কামনের নীচে, জাহাজের লাইন ধরে নৌকো নৌকো নৌ-সৈনিক।

ইয়াংকিরা একদৃষ্টে তাকায়, চোখ কচলায়, আবার তাকিয়ে থাকে, উদ্বেগে উত্তেজনায় কথা বলতে শুরু করে। যারা তখনও ঘুমোচ্ছে তাদের জাগাবার জন্যে সৈনিকদের সারির মধ্য দিয়ে অফিসারেরা ছোটাছুটি করতে থাকে।

কিন্তু কেউ গোলাগুলি ছোঁড়ে না। মিনিটের পর মিনিট কাটে। কুয়াশার মধ্যে সূর্য উঠে, যুদ্ধজাহাজের দীর্ঘ মাস্তুলগুলোর ওপর অপূর্ব দ্যুতি ছড়ায়। তবু কেউ গুলি ছোঁড়ে না। একেবারেই বিশ্বাস হয় না; অবাস্তব বলে মনে হয়, একেবারে উদ্ভট। ছবিটা অদ্ভুত, ভীতিপ্রদ, বিচিত্র—দীর্ঘ জাহাজগুলোতে শয়ে শয়ে খোলা কামান, গোলা গাদবার দণ্ড আর

গোলাবারুদের বস্তা নিয়ে নাবিকেরা দাঁড়িয়ে। জাহাজের অফিসারেরা সামনে, মাঝখানে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে নিরুদ্বেগে আমেরিকান বাহিনী নিরীক্ষণ করছে। নৌ-সৈনিকেরা অবশ্য নৌকোর মধ্যে গাদাগাদি করে রয়েছে, তবু সুশৃঙ্খল এবং যেন ধাতুর তৈরী। তাদের লাল কুর্তা আগুনের মত লাল, বেয়নেটগুলো আকাশের গায়ে বিঁধছে।

তখনও আমেরিকানেরা ত্রাসে বিস্ময়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

তারপর ব্রিটিশ জাহাজগুলোর ডেকের ওপরে ক্ষীণস্বরে বাঁশি বাজতে লাগল, যেন শান্ত, নির্মল আকাশের নীচে চড়াই পাখীর কিচিরমিচির। দীর্ঘ ছিপগুলোতে এবং বজরা থেকে দাঁড় পড়তে লাগল জলে। নৌ-সৈনিকদের বিস্তৃত বহর তীরের দিকে এগোতে লাগল।

মেজর গ্রে-র গলা থেকে ভগ্নস্বরে আদেশ এল। গাদা বন্দুকের ওপর হাতুড়ি ঘষার মত চাপা একটা শব্দ কিন্তু কেউই আমেরিকানদের বন্দুক থেকে একটি গুলির শব্দও শুনল না; কেন না সেই মুহূর্তেই একজন ব্রিটিশ অফিসার হাতখানা নামাতেই বড় গুলি এবং ছট্‌রা গুলির নারকীয় ধারা থেকে এল নেমে পৃথিবীর ওপর। চারখানি যুদ্ধজাহাজ উদ্গীরণ করতে থাকল ধ্বংসের অগ্নিকুণ্ড আমেরিকান বাহিনীর ওপর। একসঙ্গে এমন সোজা গুলিবৃষ্টিতে যে কোন জাহাজকে জল থেকে ছিটকে ওপরে তুলে উড়িয়ে দিতে পারে।

কনেকটিকাটের লোকগুলো জাহাজগুলোকে আর দেখতে পেল না। নদীর ওপর জমেছে ধোঁয়ার শক্ত দেওয়াল; ঘূর্ণ্যমান ভীতিপ্রদ আস্তরণটা ফাঁক হচ্ছে, গোলন্দাজেরা গোলাবারুদ ভরে উপর্যুপরি যখন গুলি চালাচ্ছে এরা বন্দুক তাক করার চেষ্টা করছে কিন্তু অস্ত্র হাত থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে ছট্‌রা গুলির প্রায় অবিরাম আঘাতে। এরা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই ছট্‌রা আবার তাদের ধরাশায়ী করে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। মিত্রদের ডাকবার চেষ্টা করে দেখে তারা মুণ্ডহীন, মৃত অবস্থায় পড়ে আছে মাটিতে।

যতক্ষণ পর্যন্ত এরা না দেখল যে ওদের নৌকোগুলো ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে, লালকুর্তা জলে লাফিয়ে পড়ে, সারি বেঁধে, যন্ত্রের মত শৃঙ্খলায় তীরের দিকে আসছে এগিয়ে, ভিজে বেয়নেটগুলো ধোঁয়ার মধ্যে সাদা ফিতের মত দেখতে, ততক্ষণ পর্যন্ত এরা একটু টলল না, মরল। তারপর তারা ভেঙে পড়ল। কনেকটিকাটের ছেলে এবং যুবকেরা পরিখা থেকে লাফিয়ে উঠে পেছন দিকে দিলে ছুট; তবু ছট্‌রা তাদের পেছন

পেছন, লালকুর্তাদের মাথার ওপর দিয়ে চাবুকের মত এসে পড়ছে।

পালাতে পালাতে বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রায় শখানেক গজ স্থলভাগের মধ্যে দৌড়ে যেতেই একটু স্বস্তি পেল বিভীষিকার হাত থেকে। পেছনে পড়ে রইল ধোঁয়া আর ছট্‌রা গুলি, সামনে চোখে পড়ল প্রভাতের সূর্যালোকে উজ্জ্বল সবুজ মাঠ। দেখা গেল সেই মাঠের ওপর দিয়ে একদল সৈনিক ঘন সারিতে মার্চ করে চলেছে। লোকগুগুলো যে এদের পক্ষেরই তা এরা জানত, কেননা, নিজেদের লোকেরা ছাড়া নিউ ইয়র্কের মূল মাটিতে আর কারা থাকবে। এরা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাদের স্বাগত জানাতে ছুটল।

আর তারপরেই থেমে গেল ইয়াংকিরা। মার্চ-করা লোকগুলির গায়ে যে সবুজ কোট, একজন চিৎকার করে ওঠে, 'ওরা হেসিয়ান!'

পালাবার চেষ্টা করে এরা; চারদিকে বেপরোয়া ছোটে। পেছনে রয়েছে নৌ-সৈনিকেরা আর সামনে জার্মানেরা।

যুদ্ধজাহাজের কামানগুলো থেমেছে। একটা অন্যরকমের স্তব্ধতা মাঝে মাঝে ব্যঙ্গাত্মক চিৎকারে ভগ্ন হচ্ছে:

'ইয়ংকি! ইয়ংকি! ইয়ংকি!'

মানহাট্টান দ্বীপের একেবারে দক্ষিণ বিন্দুতে ঘনবদ্ধ নিউ ইয়র্ক শহর। এখনও শহর না বলে গ্রামই বলা চলে, যদিও ওলন্দাজ বাসিন্দারা রেড ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ ঠেকাতে কাঠের দেয়াল তুলেছিল তা ছাড়িয়ে এখন নিউ ইয়র্ক বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যেই, সেই সময়েই লোকে ঐ গলির নাম দিয়েছিল ওয়াল স্ট্রীট। শহরটা আঁকাবাঁকা রাস্তায় ভরা। সামনে সব ছাদ পর্যন্ত সিঁড়ি-ওঠা লাল ইটের বাড়ি ওলন্দাজদের। অবশ্য সম্প্রতি বাড়ি তৈরীর ধরন প্রায় সবই জর্জিয়ান শৈলীর, মধ্য-অ্যাটল্যান্টিকের বসতি-গুলোর মত। উজ্জ্বল ছোট্ট হাসিখুশি শহর, পেছনে বনে-ভরা পাহাড় আর মানহাট্টান দ্বীপের সবুজ মাঠের সম্পদ।

ওয়াশিংটনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃদ্ধ ইহুদী পাট্‌নাম্ শহরটির দায়িত্ব নিয়েছেন হাজার পাঁচেক সৈনিক নিয়ে। এরা প্রধানত নিউ জার্সি আর পেনসিলভ্যানিয়ার স্থানিক বাহিনী। এরা নিউ ইংল্যাণ্ডের ইয়াংকিদের চেয়ে যুদ্ধে একটু বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছে। সেইজন্যে কনেকটিকাট, রোড দ্বীপ আর ম্যাসাচুসেট্‌সের সৈনিকদের বিশেষ অবজ্ঞা করে। তা ছাড়া রণনীতির দিক দিয়েও মধ্যপ্রদেশের লোকেদের ইয়াংকিদের থেকে আলাদা রাখাই ভালো। দেখা হলেই এরা পরস্পরে প্রায়ই রক্তারক্তি না করে ছাড়ে না।

পাঁচ হাজার স্থানিক সৈনিক শহরের প্রান্তে ছাউনি ফেলেছিল, বেশীর

ভাগই উত্তর প্রান্তে আর নদীর নিম্নভাগে দুই তীরে। শনিবার বিকাল বেলাতেই পাট্‌নাম্ ব্রিটিশ নৌবহরকে উপসাগরে ঘোরাঘুরি করতে লক্ষ্য করেছেন এবং সেই অন্ধকার রাতে, নদীর দুই দিক থেকে কি রকম শব্দ-গুলোতে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে বহরের একটা কিংবা দুটো বড় জাহাজ নোঙর ফেলে নদী বেয়ে আসছে। কিন্তু তরুণ বীর, হার্লেম থেকে ঘোড়ায় ফিরে এসে বৃদ্ধকে আশ্বাস দিয়েছিল যে স্পেন্সার ইস্ট নদীর ধার বরাবর পুরোপুরি পরিখা খুঁড়েছেন এবং হাডসন নদীর সমগ্র মানহাট্টান তীরটা টহল দেওয়া হচ্ছে। অতএব পাট্‌নাম্ ঘুমোতে গেলেন, একটু অস্বস্তিতেই অবশ্য; জেগে উঠলেন ব্রিটিশদের কামানের বজ্রধ্বনিতে।

কোনমতে জামা-জোড়া পরে নিয়ে, ছুটে বাইরে গিয়ে দেখেন যে তাঁর পেনসিলভ্যানিয়া আর জার্সির স্থানিক সৈনিকেরা ইতিমধ্যেই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। কাঁটাঝোপের মধ্যে থেকে খরগোসের মত কামানের গোলায় তারা ছাউনি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, সন্ত্রস্ত অবস্থায়, শহরের তৃণাস্তীর্ণ গলি আর সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলোতে এসে ভীড় করেছে।

প্রায় অনিদ্রায় সারারাত কাটিয়ে ফ্যাকাশে মুখে, অ্যারন বার ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত খারাপ খবরটি পেয়ে গিয়েছেন। মুখে ফেনা-ওঠা ঘোড়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে তিনি পাট্‌নামের সদর দপ্তরের সামনে দাঁড়িয়ে যা জানতে পেরেছিলেন তা তাঁকে বলে দিলেন।

'ওরা নেমে পড়েছে।'

'ব্রিটিশেরা?'

'জার্মানেরাও—দ্বীপের দুদিকেই।'

'সংখ্যায় কত?'

ভাঙা গলায় বার বললেন, 'জানি না। আমি কেমন করে জানব কত জন? মনে হয় হাজার হাজার।'

হাল্কা তলোয়ারের ওপর রাখা হাতখানা ভীষণ কাঁপছে পাট্‌নামের। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'ওরা নামতে পারে না।'

'আমি বলছি হাজারে হাজারে নেমেছে।'

'ওরা নেমে থাকলে আমরা ইঁদুরের মত কলে ধরা পড়েছি—'

উত্তেজনায় দেহখানা বেঁকে গিয়েছে ছেলেটির। মাথা নাড়ল।

'পশ্চাদপসরণ—'

'এখনই, নষ্ট করবার সময় নেই—দেখছো না দ্বীপের দুই দিকেই নেমেছে।'

'হাঁ, হাঁ ;' পাট্‌নাম্ স্খলিত গলায় বললেন।

'আমি বলছি আপনাকে, একেবারে এখনই।'

'যদি সেনাপতির সঙ্গে যোগাযোগ হত,' অনিশ্চিত ভাবে বললেন পাট্‌নাম্।

বার অনুনয় করলেন, 'কিন্তু আমাদের মধ্যিখানে যে ওরা, দ্বীপের দুই ধারেই। বুঝতে পারছেন না! আর দুই দিক থেকে যদি ওরা মেলে তাহলে আমরা কোথায় যাব—নদীর মধ্যে?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়তে লাগলেন।

পরবর্তীকালে, অনেক বছর ধরে, বারের মনে, যারা অবলীলায় বলেছিল 'পশ্চাদপসরণ সোজা' তাদের সম্পর্কে অনুচ্চারিত কিন্তু তিক্ত অবজ্ঞা থেকে গিয়েছিল। তিনি জানতেন এগোনো সোজা কিন্তু যখন কেউ পিছু হঠে তখন সে মরে, আর মরা সহজ নয়।

সেইদিনে এটা সহজ ছিল না। সকালের প্রখর সূর্য হেমন্তের বাতাস থেকে সব গতি যেন সেঁকে তুলে নিয়েছে। মানহাট্টান দ্বীপের মাঠে মাঠে সোনার বরণ গমের ডাঁটাগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থির, শক্ত হয়ে। শহরের মধ্যে নাগরিকেরা জানলা দরজা খুলে দেখে মহাদেশের স্থানিক সৈনিকেরা সঙ্কীর্ণ অলিগলি দিয়ে স্রোতের মত চলেছে। যা ঘটেছে তা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে আর তারপর শুধু কয়েক মিনিটের জন্যে পেনসিলভ্যানিয়া আর নিউ জার্সির সৈনিকদের মধ্যে শৃঙ্খলা বা আত্মনির্ভরতা বলে কিছু ছিল। দ্রুত-গতিতে এগিয়ে চলে তারা এবং একটু পরেই ছুটতে আরম্ভ করে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। আর তারপরেই পাঁচ হাজারের প্রায় সব সৈনিকই ভয়ে ত্রাসে উত্তর দিকে একসঙ্গে ছুটতে থাকে।

এরা ছুটতে ছুটতে অফিসারদের ছাড়িয়ে চলে গিয়ে, সরু সরু গলিতে ভীড় করে, তিতির পাখী যেমন মাঠময় ছড়িয়ে যায় সেই রকম চতুর্দিকে ছিটিয়ে গেল ; ঝোপঝাড় ভেঙে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল ভুল করে। সমস্ত দ্বীপটা ভরে গেল সন্ত্রস্ত মানুষে মানুষে। ব্রিটিশেরা তাদের ফাঁদটি পুরো পাতবার আগেই এরা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে, ছাড়া পাবার জন্যে, ছোটে তো ছোটেই।

ছুটতে ছুটতে কেউ কেউ অন্ধ অভ্যাসেই বন্দুক ধরে আছে হাতে ; অন্যেরা কেউ কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ; আবার কেউ কেউ বা নিজেদের দলের লোকেদেরই পাগলের মত গুলি করছে। কিছু পড়ছে আর মরছে, নিজেদেরই বেয়নেটেই বিদ্ধ হয়ে ; আর যাদের তাদের আদেশ দেবার কথা তাদেরই

গুলিতে অফিসারগুলো মরছে।

ঐ যেখান দিয়ে ধূলিময় ব্লুসিংডেল রোড কিংস্‌ব্রিজের দিকে গেছে সেই পশ্চিম মুখে বেশীর ভাগই ছুটছে। অন্যেরা, ক্লান্তিতে অর্ধমৃত অবস্থায়, হোঁচট খেতে খেতে, হামাগুড়ি দিয়ে, পড়তে পড়তে, পূব দিকে বেঁকতেই, এসে পড়ল স্পেন্সারের ধ্বংসাবশিষ্ট নিউ ইংল্যাণ্ডারদের ওপর। পূব দিকের নদীতীরে সে এক ভীতিপ্রদ বিকট হাতাহাতি লড়াই। ইয়াংকিরা, পেনসিলভ্যানিয়ান আর জার্সির লোকেরা, তৃষ্ণাদগ্ধ গলায় কর্কশ শব্দ করে, টলতে টলতে, কিছুই না দেখে এগিয়ে চলে, ত্রস্ত শিশুদের মত, জার্মানদের ঝকঝকে বেয়নেট থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে; আর জার্মানেরা 'ইয়ংকি' 'ইয়ংকি' বলতে বলতে। ইচ্ছে করে সজোরে বেয়নেট চালিয়ে, ওদের কর্কশ শব্দ স্তব্ধ করে দিয়ে, শিশুগুলোকে, ছেলেগুলোকে ঠেলে দিচ্ছে ধাতুর মত নিস্পন্দ, রাজকীয় নৌবহরের লালকুর্তাদের দিকে।

যে কটি কামান তাঁর কাছে ছিল সেই কটি অতি যত্নে হেনরি নক্স সাজিয়ে ফেলেছেন। তিনি পাট্‌নামের সঙ্গে শহরেই ছিলেন। কতকগুলো নদীর দিকে মুখ করে সাজিয়েছেন, কতকগুলো তাদের পাশে; কয়েকটিকে আবার মুখ নীচু করে একটু পেছনে একটা উঁচু জায়গায় সাজিয়েছেন কাছাকাছি গোলাগুলি ছোঁড়বার জন্যে। অন্যগুলো ইস্ট নদী আর হাডসন নদীর মোহনার দিকে সজোরে গোলা চালাচ্ছে। তা সত্ত্বেও এ সবই ব্যর্থ চেষ্টা। তাঁর এমন কামান ছিল না যা দিয়ে ওদের নৌবহরের বড় বড় জাহাজ-গুলোকে একটু হুল ফোটাবার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারে। ছোট ছোট সব খেলার বন্দুক, ছয়-আট পাউণ্ডের গোলা ছাড়ে। ব্রিটিশদের প্রচণ্ড গোলা-বাজির নিধন-গর্জনের পাশে তারা একটু আলো আর শব্দ সৃষ্টি করে। তাদের ধ্বনি শোনাই যায় না। তাঁর অন্য কামানগুলো, জাঁদরেল রাক্ষস-গুলো আর কি, যেগুলো চল্লিশ পাউণ্ডের গোলা ছুঁড়তে পারত, সেগুলো ব্রুকলিনের কাদার মধ্যে শিকগোঁজা অবস্থায় পড়ে আছে।

এই ক্ষতির ফলে নক্সের অস্বাভাবিক আকুলতা হয়েছে যে-কটি কামান রয়েছে সে-কটিকে আগলে রাখার। এই ছেলেটিকে অন্য ছেলেরা কর্নেল বলত। জন্ম থেকে জমিয়ে রাখা এর স্বভাব। এক সময়ে খনিজ পদার্থ জমাত, তারপর নানারকম পাতা, পরে পোকামাকড়, পরে বই এবং তারও পরে কামান-বন্দুক। নিজের সংগ্রহের প্রত্যেক কামানটিকে সে চিনত। বরফ জমে-যাওয়া বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে সে শত শত মাইল হেঁটে ক্যানাডার সীমানা থেকে আনতে গিয়েছিল কয়েকটি কামান। জলের মধ্যে থেকেও

কয়েকটাকে তুলে এনেছিল, পাহাড়ের মাথা থেকেও গোটা কয়েক নামিয়েছিল। নিজের হাতে সেগুলো পরিষ্কার করে নিজেই সেগুলোর জন্যে গাড়ি বানিয়েছিল। কাউকে মারবার ইচ্ছে যে তার ছিল তা নয়। অনেকদিন আগেই সে স্থির করে ফেলেছিল যে সে ন্যায়ের দিকেই আছে। তারপর এ সব ব্যাপার চিন্তা করা ছেড়ে দিয়ে শুধু ভাবত কতগুলো কামান সে সংগ্রহ করেছে। বয়েস ওর ছাব্বিশ বছর। এই ভীষণ ব্যগ্রতা, আর যে ভার্জিনিয়ান শেয়ালশিকারী তার চেয়ে সর্ববিষয়ে বিপরীত প্রকৃতির তাঁর প্রতি একান্ত নিষ্ঠা, তার ওপর স্বার্থলেশহীনতা—এই সবে মিলে তাকে দেখায় আরও অনেক বেশি বয়স্ক। প্রকাণ্ড, একটু হাস্যকর চেহারা, চতুরতার বেদনাদায়ক অভাব—এই সবে তাকে তার লোকেরা ভালোও বাসত।

আজ রবিবার সকালে যখন ব্রিটিশদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে দ্বীপ উঠল জেগে, যখন শুরু হল উত্তরে এগোবার মুখোমুখি যুদ্ধ, নক্স অন্যদিকে ঘুরে গেল কামানগুলোর কাছে। ধীর গতিতেই গেল, গোমরামুখে, অবিচল পদক্ষেপে। কাউকে পেছনে আসতে আদেশ দিল না। কোন পরিকল্পনা, কোন চিন্তা না করেই সে শুধু কামানগুলোর কাছাকাছি থাকতে চাইল; আর সে ছুটতে রাজী নয়।

পালাবার ইচ্ছা গোপন না করেই গোলন্দাজেরা দাঁড়িয়েই ছিল কামানগুলোর কাছে। তারা পালাতে যাবে এমন সময় দেখল তাদের কর্নেল বিষণ্ণভাবে একটি কামানের পাশে দাঁড়িয়ে। তারা থেমে গেল। কর্নেল যেন হঠাৎ এক অনাথ শিশু হয়ে গিয়েছেন এবং কিছুই আর করবার নেই এই ভীষণ জেনেই যেন অপেক্ষা করছেন। তারা থেমে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে; তারপর কয়েকজন স্বস্থানে ফিরে গেল, পরে অন্যেরাও। তারপর একজন ক্যাপ্টেন মিলার শুধু বলল, 'কর্নেল, বাহিনী ছুটে পালাচ্ছে।'

ধীরে ধীরে আত্মমগ্নতা থেকে বেরিয়ে এলেন নক্স, 'হাঁ—'

'এখানে আমরা কিছুই করতে পারব না।'

'কামানগুলো এখানেই আছে,' বললেন নক্স এবং তাঁর চিন্তাটা হল এই রকমের যে তিনি কামানগুলো ছেড়ে গেলে আর কিছুই থাকবে না, কিছুই না।

ক্যাপ্টেন যুক্তি দিল, 'স্যর, এখানে থেকে কোন লাভ নেই।'

'তোমাদের এখানে থাকতে হচ্ছে না,' ঘাড় নাড়লেন নক্স।

তখন জোর গলায় ক্যাপ্টেন বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, কর্নেল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কামানগুলোর সঙ্গে আমাদেরও ব্রিটিশেরা যে নিয়ে যাবে,

তাতে কি লাভ ?'

পুনরুক্তি করলেন নক্স, 'তোমাদের এখানে থাকতে হচ্ছে না।'

'কিন্তু, দোহাই, কর্নেল, ঐ বেজন্মাগুলো পালিয়েছে বলে—'

'হাঁ, ওরা পালিয়েছে,' শেষ দুটি কথা নক্স উচ্চারণ করলেন হিংস্র ক্রোধে।

গোলন্দাজেরা চারদিকে ঘুরতে লাগল কিন্তু পালাবার চেষ্টা করল না কেউ। তারা শুধু পা ঘষছে আর তাকিয়ে রয়েছে মাটির দিকে। একটি পনের বছরের ছেলে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। উত্তর দিক থেকে পলায়নপর বাহিনীর তীব্র শব্দ আসছে আর তার ওপর ব্রিটিশদের গোলার দুম দুম শব্দ।

কয়েক মিনিটের জন্যে কেউ কিছু বলে না। তারপরেই প্লিমাহের একটি সতের বছরের ছেলে, পদে লেফ্‌টেনান্ট, সানন্দে বলে ওঠে, 'আহা, আমরা যদি সবাই এইখানেই মরি তাহলে জায়গাটা অতি যাচ্ছেতাই বলতে হবে। এখান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে চমৎকার একটি ছোট্ট পাহাড় আছে। সেখানে কামানগুলো সাজিয়ে একটু যুদ্ধ করা যায়। ছায়া পাবার মত গাছও আছে।' বলে শেষ করে।

আর একজন বললে, 'এখানটায় অসহ্য গরম।'

বাহিনীর অবশিষ্টাংশ যখন পালিয়েছে তখন তারা যে অভিযানের প্রস্তাবটি করছে তাতে সকলেই ভয়ে, উত্তেজনায় হাসতে থাকে।

'কোন্ পাহাড় ?' নক্স জিজ্ঞাসা করলেন।

'লোকে বলে বাঙ্কার হিল।'

সকলের মুখে মৃদু হাসি দেখেন নক্স। লক্ষণটা ভালো। এই এলোমেলো বাহিনী যে একটি অর্ধ-বিজয় লাভ করেছিল সে আর একটি বাঙ্কার হিলে। একটু প্রাণ পেলেন নক্স; গোলাবারুদের গাড়ি বোঝাই করবার আদেশ দিলেন; আর কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিলেন দু-একটা ঘোড়া পাওয়া যায় কি না দেখবার জন্যে। অনুসন্ধানে তিনটি বুড়ো ঘোড়া পাওয়া গেলে সেই তিনটেকে আট পাউণ্ডের গোলা ছোঁড়বার গাড়িতে যোড়া হল। অন্য কামান-গুলো এবং বাকী গোলাবারুদের গাড়ি বাহিনীর লোকেরা যেমন পারল তেমনি নিয়ে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই বিচিত্র বাহিনী চলতে শুরু করল শহরগুলোর নানা জিনিস ছড়ানো পথের ওপর দিয়ে। গাড়িগুলোর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। পথে ছড়ানো অসংখ্য সৈনিকদের ব্যাগ, মরচে-ধরা বেয়নেট আর পুরনো বন্দুক। আমেরিকান বাহিনীর পেছনে পড়ে রইল এই সব।

ইতিমধ্যেই শহরের লোকেরা ব্রিটিশদের স্বাগত জানাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। এই আমেরিকানেরা তাদের কাছে বাজে জঞ্জাল, বিদায় হলেই বাঁচে। তারা ভেংচি কেটে হেসে সার বেঁধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল মন্থরগতি কামানবাহী গাড়িগুলো দেখতে। ছেলেগুলো চিৎকার করতে করতে ছুটল, 'ঘোড়া যোগাড় কর, ঘোড়া যোগাড় কর।' আর প্রসাধনে উজ্জ্বল ডজনে ডজনে মহিলারা। এঁদের জীবিকা সব খোয়া গিয়েছে সৈনিকদের হাতে। তারা চিৎকার করে, শাপমন্যি করতে করতে গোলন্দাজদের গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিল, ছুঁড়ে মারল যত ময়লা নর্দমায় ছিল সেই সব। ডাইনে বাঁয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে নক্স একটি কামানের গাড়ির চাকা ঠেলবার চেষ্টা করছেন; কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে।

ঘামে চপচপে হয়ে সেই বাহিনী শেষ পর্যন্ত বাঙ্কার হিলে পৌঁছে দেখল সে স্থান ইতিমধ্যেই দখল হয়ে গিয়েছে। ভারী চেহারার শ্লথগতি গোমরা-মুখ জেনারেল মিলিন্যান তাঁর বাহিনীর বেশীর ভাগ লোককেই একসঙ্গে সামিল করে এই পাহাড়ের ওপর উঠিয়েছেন। সেখানে তারা অর্ধ-ভীত, অর্ধ-বেপরোয়া হয়ে তাদের কামানগুলোর ওপর শুয়ে রয়েছে এবং তাদের তিক্ততা এখন চরমে উঠেছে এইজন্যে যে তাদের ত্রাসের প্রথম অবস্থাটি কেটে গিয়েছে।

যা দেখলেন তা বিশ্বাস করতে না পেরে নক্স জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কি করবেন শুনি?'

মিলিম্যান গর্জে উঠলেন, 'ঐ বেজন্মাগুলো একবার আসুক না। তারপর কি করব তা আমরা জানি।'

মাথা নাড়লেন নক্স। তিনি মিলিম্যানকে বিশেষ ভালো করে জানতেন না, তাঁর দিকে তেমন আকৃষ্টও হননি। কিন্তু এখন দুজনে একসঙ্গে, দু-জনের একই চিন্তা। বিষাদ কেটে গিয়ে একটা ভয়-মিশ্রিত উল্লাস নক্সকে পেয়ে বসেছে। পাট্‌নামের বাহিনী মিলিয়ে গিয়েছে। রৌদ্রস্নাত ছোট্ট পাহাড়ের ওপর থেকে এরা দেখতে পাচ্ছে শুধু একটি ছোট্ট নদী আর একটি শান্ত, সাদা খামারবাড়ি। নক্স বুঝলেন এই শেষ—বিপ্লব মিলিয়ে গেল একটা বিশ্রী ত্রাস আর পূর্ণ পরাভাবের মধ্যে। নিউ ইয়র্কের বেশ্যারা মজা মারবে আর হয়তো মাসের পর মাস ধরে যাচ্ছেতাই গালাগালি দেবে, কিন্তু কালক্রমে তারাও ভুলে যাবে। তিনি নিজে অন্তত ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলতে চান না বা কোন নগণ্য কোন শহরের জেলে বছরের পর বছর পচতে চান না। যে সব গৌরব অর্জন করতে পারেননি সেগুলো নিয়ে মিথ্যে কথাও

বলে বেড়াতে চান না। যে ন্যায়সঙ্গত আদর্শে বিশ্বাস করেছেন এবং যার জন্যে যুদ্ধ করার সাহস পেয়েছেন তারই জন্যে এইখানেই তিনি প্রাণ দেবেন।

চিৎকার করে বললেন, 'দু পাউণ্ড আর পাঁচ পাউণ্ডের কামান পাহাড়ের ওপরে তোল। আসল গোলা ভরে সারি দিয়ে সাজাও। এক পাউণ্ড, তিন পাউণ্ড আর চার পাউণ্ডের গুলো পাশে ছুঁড়বে ছোট ছোট গোলা।'

মিলিম্যানের লোকেদের কম্পিত গলার কর্কশ আনন্দধ্বনি ভেসে এল; তারা ছুটে এল চড়াই দিয়ে কামানগুলোকে টেনে তুলতে সাহায্য করতে। মিলিম্যান মাথা নাড়লেন এবং নীরবে, নক্সের হাতখানা মুঠোতে ধরে। পরের কয়েক মুহূর্ত কেবল কাজ আর উত্তেজনা—ভয় নৈরাশ্য সব ভুল হয়ে গেল—এমনই ভুল যে কেউ লক্ষ্যই করল না কে মুখে ফেনা-ওঠা ঘোড়ায় চড়ে তাদের দিকে আসছে রাস্তা দিয়ে।

আরও ক্লান্ত, আরও ফ্যাকাশে-হয়ে-যাওয়া বার আসছেন। গলা এত শুকিয়ে গিয়েছে যে তিনি শুধু একটু কর্কশ বিষণ্ণ শব্দ বার করতে পারলেন গলা দিয়ে। একজন গোলন্দাজ একটি ঘটি থেকে তাঁকে একটু পান করতে দিল। মুখ থেকে দুবার কেবল থু থু করে বালি ফেলে তিনি দুবার পান করবার পর মিলিম্যানকে রেগে বললেন, 'ধোৎ তেরি, সেনাপতি, এ সব কি হচ্ছে?'

'দেখতেই পাচ্ছেন। আমরা পালাইনি।'

'হা যীশু, জানি আমি, জানি। কিন্তু জান কি আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ব্রিটিশেরা তোমাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করবে?'

মিলিম্যান ঠোঁট শক্ত করে চেপে মাথা নাড়লেন।

'হে যীশু, হে যীশু, তাহলে তাই! আত্মঘাতী হবে? যে রেজিমেন্টটা সাহসে ভর করে পালায়নি তাদের খুন করার কথাই শুধু ভাবতে পারলে? তাতে কি আমাদের স্বাধীনতা আসবে? তাতে কি বিপ্লব সার্থক হবে?'

'ছুটেছি তো অনেক।'

'অনেক ছুটেছ? বলছ অনেক ছুটেছ! তুমি আলের ওপরে বসে আমাকে শোনাচ্ছ যে অনেক ছুটেছ!'

'চুলোয় যাক, মেজর, আপনার ঐ রকম কথা আমি শুনতে রাজী নই!'

'যেমন খুশি আমি শালার তেমনি কথা বলব।'

'নিকুচি করেছে! না! বিশ বছরের এক হাঁদার কাছ থেকে আমি ওসব

শুনতে রাজী নই।'

বার প্রায় তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনাকে শুনতে হবে। শুনতে হবে, সে আমি বিশ হই আর না হই। যথেষ্ট হিম্মৎ আছে আমার—'

'বার!' নক্স গর্জন করে উঠলেন।

ছেলেটি চুপ করে গেল, কাঁপতে কাঁপতে, ঘামতে ঘামতে ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল, ভাঙা গলায় নিম্নকণ্ঠে বলল, 'বেশ, হ্যারি। আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি ঠিকই বলেছি। আমি দুঃখিত।'

একজন গোলন্দাজ শান্তকণ্ঠে বলল, 'কর্নেল নক্স।'

'বেশ, বেশ, কর্নেল নক্স। তবু ঈশ্বরের দোহাই হ্যারি, আমার সঙ্গে এস। এই সব উন্মাদের বীরপনার সমর্থন কোরো না।'

'পালানোর বদলে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করাটা কি বীরপনা—শুধু কেবল পালিয়ে যাবার বদলে? আজ শহরে কি ঘটেছিল দেখেছিলে?'

'দেখেছি।'

'আর এখন আমাদের পালাতে বলছ।'

'আমি তোমাদের বাঁচতে বলছি—শুধু বাঁচতে।'

নক্স জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসের জন্যে? কি আর বাকী আছে?'

'বিপ্লব, এবং সেটা মৃত্যুর চেয়ে বড়! মৃত্যুতে কি আছে! ওতে কিছু ফয়দা নেই। ঈশ্বরের কাছে দিব্যি করে বলছি, হ্যারি, বিশ্বাস কর।'

'আমি আমার কামান ছেড়ে যাব না।'

বার লোকগুলোর দিকে মুখ ফেরালেন। তাঁর ফ্যাকাশে মুখে শুধুই নৈরাশ্য। তিনি তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'কি বলছি শুনতে পাচ্ছ? তোমরা কি মরতে চাও? পেনসিলভ্যানিয়ার ঘৃণ্য বেজন্মা সব, তাই কি শুধু চাও? কিংস্‌ব্রীজে যে বাহিনী রয়েছে তারা যুদ্ধ করতে চলেছে, হয়ত বিশ বচ্ছর ধরে করবে, হয়ত চিরকাল; কিন্তু তোমরা, পেনসিলভ্যানিয়ার ঘৃণ্য বেজন্মারা শুধু মরতে চাও!'

উত্তর এল একটি ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে, এবং ছেলেটি, ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও ওদের মনোভাবটি ঠিক বুঝে নিয়ে চিৎকার করে বলল, 'এস আমার পেছন পেছন!' তারা কেমন করে পাহাড় বেয়ে স্রোতের মত নেমে এসে তার পেছনে ছুটল তা তিনি ফিরেও দেখলেন না; তিনি ঘোড়ার গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে সোজা উত্তরে ছুটলেন। এমন কি মিলিম্যান পর্যন্ত, গলা ফাটিয়ে বারকে শাপমন্যি করতে করতে, সকলের শেষে চলতে লাগলেন।

পড়ে রইল গোলন্দাজ বাহিনীর লোকেরা। তারা ছিল নক্সের সঙ্গে এবং

এখন তাঁর দিকে তাকিয়ে, একটুও না নড়েচড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁরই হুকুম তামিল করে তাঁরই হাতে জীবনমরণের সিদ্ধান্ত তুলে দিল। নক্সের মুখে কথা যোগাল না। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি উত্তর দিকে চলতে শুরু করলেন আর তাঁর বাহিনীর লোকেরা নিস্তেজ হয়ে গিয়ে তাঁকে অনুসরণ করল। তাদের হাত, মাথা যেন ঝুলে পড়েছে। যেখানে চকচকে কামানগুলো কোন জীবন্ত মানুষের চেয়েও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে রইল, সেদিকে তারা ফিরে তাকালো না।

ব্রিটিশ নৌবহরের চারখানি জাহাজ থেকে বিধ্বংসী গোলাবর্ষণের শব্দ শুধু মৃতদের কানেই গেল না।

সেই রবিবার সকালে সর্বাধিনায়ক রাত্রে গভীর নিদ্রার পরে, ভোর হবার আগেই উঠে পড়েছেন। বিলি তাঁর ঘরের বাইরেই ঘুমোত। কর্তা বিছানায় যে এপাশ ওপাশ করছেন তা সে ঘুমের মধ্যেই শুনতে পেত। মোমবাতি জ্বেলে, তার কালো মাথাটি নেড়ে, মুখে হাসতে হাসতে সে তাঁকে পোশাক-আশাক পরতে সাহায্য করল।

'রাতটা ভালই কেটেছে,' বিলি বলল।

'হ্যাঁ, অন্য অনেক রাত্তিরের থেকে ভাল।'

'মিসেস প্যাটসিকে ছেড়ে আসার পরে এখন আপনি ভালই হয়ে উঠছেন।'

'হ্যাঁ, একটু ভাল,' ভার্জিনিয়ান মৃদু হেসে উত্তর দিলেন। আজ সকালে তাঁর মেজাজ খুব শরিফ।

সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামতে নামতে বিলি বলতে বলতে গেল, 'কেটলিটা চাপিয়ে দিয়ে আসি।' সে গাইতে গাইতে নামল, 'কেটলিটা চাপিয়ে দিয়ে আসি, জলটা ফুটতে দিয়ে আসি।'

সব সময়েই ভার্জিনিয়ানের প্রাতরাশে থাকত কেক, মধু আর চা। তিনি বেশ তৃপ্তি করেই খেয়ে লক্ষ্য করলেন যে হ্যারিসন তখনও ওঠেননি; স্থির করলেন যে হার্লেমে যে বাহিনী ব্যূহ রক্ষা করছে তাদের একবার সকাল সকাল পরিদর্শন করে আসবেন। বিলি তাঁর এই সিদ্ধান্তটি আগেই বুঝতে পেরেছিল এবং প্রকাণ্ড মানুষটি মরিস আবাস থেকে বেরিয়ে আসতেই নিগ্রোটি ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। ওয়াশিংটন ঘোড়ায় চেপে হাত নেড়ে রাস্তা দিয়ে জোর কদমে চলতে শুরু করলেন।

প্রভাতের প্রথম ধূসর আলো তখন রাত্রির কালিমাকে দূর করে দিচ্ছে

যখন তিনি ক্লান্ত সান্ত্রীদের পার হয়ে মিফ্‌লিনের ছাউনিতে উপস্থিত হলেন। স্পেন্সারের ডিভিশনের কয়েকটি রেজিমেন্ট নিয়ে মিফলিন মানহাট্টানের মাঝবরাবর স্বল্পসংখ্যক সৈনিকের বূ্যহ রক্ষা করছিলেন। তিনি সর্বাধিনায়কের দীর্ঘ ঋজু দেহখানি চিনতে পারলেন। এত ভোর হলেও তিনি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত, খুশিতে মৃদু মৃদু হাসছেন। তিনি বাহু নেড়ে কথা বলবার জন্যে মুখ খুলেছেন এমন সময়ে দূরে ঐ চারটি জাহাজ থেকে একসঙ্গে কামান দাগার গুম গুম শব্দ কানে এল।

ভার্জিনিয়ান শক্ত হয়ে গিয়ে নত হয়ে ঘোড়ার পায়ে কাঁটা বিঁধে ছোটালেন সদ্য-ঘুম-ভাঙা ছাউনির মধ্য দিয়ে। মিফলিন ছুটলেন একটি ঘোড়ার জন্যে কিন্তু তিনি ঘোড়ায় চড়বার আগেই ভার্জিনিয়ান তাঁর লক্ষ্যের বাইরে চলে গিয়েছেন।

পশুটাকে নির্দয়ভাবে মারতে মারতে ওয়াশিংটন চার মাইল গিয়ে তবে প্রথম দেখতে পেলেন ভীতত্রস্ত বাহিনীর সবচেয়ে দ্রুত পলায়মান একটি দলকে। ততক্ষণে কুয়াশা কেটে গিয়েছে, সূর্যের সোনালী আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে শস্যের ক্ষেতে, ফলের বাগানে। রাস্তা ছেড়ে বেপরোয়া ঘোড়া চালিয়ে একটি স্রোতস্বতী এবং একটি বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে ওদের মধ্যে এসে পড়লেন এবং যতদূরে দৃষ্টি যায় দেখতে পেলেন শত শত মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে, ছুটে, লুকিয়ে, টলতে টলতে চলেছে। ঘোড়া থামিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করলেন; তাদের সামনে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেন কিন্তু তাদের শূন্য চোখে তাঁকে চেনার কোন চিহ্নই দেখা গেল না। তারা ছুটছে তো ছুটছেই। একজন আবার তাঁকে গুলিও করে বসল।

তিনি চিৎকার করে বললেন, 'থামো!'

তারা ভীড় করে তাঁকে ছাড়িয়ে চলে গেল।

'তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

মিনতি করে বললেন, 'থামো তোমরা!'

'তোমরা জানো আমি কে। আমি তোমাদের সেনাপতি! আমি তোমাদের সর্বাধিনায়ক!'

'থামো, থামো বলছি!' তিনি তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন।

'পাথরের দেওয়ালগুলোর পেছনে গিয়ে দাঁড়াও!'

'কামানগুলো ছোঁড়ো!'

তারা কুকুরে-তাড়ানো খরগোশের মত ভীড় করে এগিয়েই চলল।

'ঈশ্বরের দোহাই, থামো!'

তিনি আবার ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের মধ্যে চলে গেলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা চাবুকটি হাত থেকে ছিঁড়ে না নিল ততক্ষণ চালিয়ে গেলেন। তিনি পিস্তল বার করলেন কিন্তু ঘামে ভিজে থাকায় গুলিই ছুটল না। পিস্তল-গুলো ওদের দিকে ছুঁড়ে মেরে তলোয়ার বার করলেন। তাদের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের কেটেকুটে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে, মিনতি করে, অনুনয় করে শেষে আবার তলোয়ার চালাতে লাগলেন—কিন্তু তারা ছুটেই চলল।

তারা মাঠের ওপর দিয়ে দৈত্যের মত ছুটে চলেছে। রেগে চিৎকার করতে করতে তাঁর গলা ভেঙে গেল।

তখন তিনি আর ঘোড়া না ছুটিয়ে একেবারে চুপটি করে বসে রইলেন। তারা সামনে দিয়ে পালাতে লাগল। তাঁর শিথিল আঙুল থেকে তলোয়ার খসে পড়ল ভিজে মুক্তোর মত ঘাসের ওপরে, উজ্জ্বল শিশিরের ফোঁটার মধ্যে চকচক করতে লাগল। ডাণ্ডার মত সোজা তাঁর মেরুদণ্ড, যেন জোর হারিয়ে ফেলেছে। অসংলগ্ন হাড়ের একটা লম্বা থলের মত তিনি ঘোড়ার জিনের ওপর এলিয়ে পড়লেন।

দেখলেন ব্রিটিশ বাহিনী দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে, এই কয়েকশো গজ দূরে মাত্র। বাতাস না থাকলেও মনে হচ্ছে নৌবাহিনীর সৈনিকগুলো যেন উড়ন্ত লাল ফিতে। তবু তিনি নড়লেন না, মনে হল তিনি যেন শূন্যে ঝুলে আছেন; অনুভব করলেন তিনি যেন আর নেই এবং অস্পষ্ট বিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন তিনি এখনও কি করে দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন এবং অনুভব করতে পাচ্ছেন।

ব্রিটিশ বাহিনী আর শ খানেক গজ দূরে মাত্র।

দেখলেন ঠিক তাঁর পাশেই মিফলিন দাঁড়িয়ে। মিফলিনের গলা তাঁর কানে এল যেন বহুদূর থেকে। মিফলিন অনুনয় করছেন, 'চলে আসুন স্যর, চলে আসুন।'

তাঁর চারদিকে অন্যেরাও ছিলেন। তিনি যখন মরেই গিয়েছেন তখন এরা তাঁকে চলে আসতে বলছে কেন।

'দয়া করে চলে আসুন স্যর, দয়া করে।'

তাঁর চোখে পড়ল মিফলিনের মুখ কেমন কুঁচকে বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

'দয়া করে চলে আসুন, স্যর।'

তখন তিনি মিফলিনের হাতে লাগামটা দিয়ে ঘোড়াটিকে চালিয়ে নিয়ে

যেতে দিলেন। ব্রিটিশেরা যে গুলি ছুঁড়েই চলেছে এতে কিছু যায় আসে না। কিছুতেই এখন কিছু যায় আসে না।

৭. সহৃদয় শ্রীমতী মারে

ব্রিটিশ বাহিনী যুদ্ধে শিক্ষণপ্রাপ্ত; এদের অভ্যাস করিয়ে করিয়ে জগতে একটি শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। অবিচলিত স্থৈর্যে এরা যে কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। যে ব্রিটিশ সেনাপতি গর্ব করে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর বাহিনীকে চ্যানেলের সৈকতের বালির উপর দিয়ে মার্চ করিয়ে ফ্রান্সে যাবার হুকুম দিতে পারেন এবং শেষ সৈনিকটির মাথা জলের তলায় অন্তর্হিত হওয়া পর্যন্ত তাদের মার্চ করাতে পারেন, তিনি কিছু বাড়িয়ে বলেননি। তিনি সঠিক তথ্যই বলেছিলেন। ঠিক একই ভাবে তিনি তাঁর বাহিনীকে পাহাড়ের চূড়োয় মার্চ করিয়ে নিয়ে গিয়ে দলে দলে ঝাঁপ দেবার আদেশ দিতে পারতেন। তাতে লালকুর্তা বাহিনীর মধ্যে কোন দ্বিধা বা বিরক্তি দেখা দিত না।

কিন্তু ব্রিটিশ সৈনিকদের শিক্ষার মধ্যে কোথাও শেখানো হয়নি যে শত্রুপক্ষ যুদ্ধ না করে পালাতে থাকলে কি করতে হবে। একটি পশ্চাদ-পসরণকারী সৈন্যদল এক জিনিস; তখন কর্তব্য হল ঘন শ্রেণীবদ্ধভাবে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের নৈতিক বল ভেঙে দিয়ে বিশৃঙ্খল করে দেওয়া। কিন্তু এই অ্যামেরিকান সৈনিকদের তো পশ্চাদপসরণকারী বাহিনীও বলা চলে না।

যখন সেনাপতি হো নিউ ইয়র্ক শহরে তাঁর বাহিনীর বেশীর ভাগ অংশকে নামিয়েছেন, তখন একটিও সুস্থ দেহ অ্যামেরিকান সৈনিককে দেখতে পাওয়া যায়নি। শুধু অসুস্থ আহতেরা গাদাগাদি হয়ে ছিল গীর্জা আর ইহুদীদের মন্দিরগুলোর মধ্যে। খুব গরম পড়েছে এবং মোটাসোটা হো সাহেবের রীতিমত অস্বস্তি হচ্ছে। বহু আমেরিকান জিনিসের মধ্যে যেটি তিনি সবচেয়ে অপছন্দ করতেন তার প্রথমেই ছিল এই মহাদেশের আবহাওয়া। এখানকার ঋতু সম্বন্ধে ঠিক করে কিছু বলবার উপায় নেই। গ্রীষ্ম হয়ে ওঠে শীত, হেমন্ত হয়ে ওঠে গ্রীষ্ম, আবার জানুয়ারীতে বা বছরের অন্য কোন সময়ে মৃদু বসন্তের দিনও পাওয়া যায়। আমেরিকানদের মতনই তাদের দেশের আবহাওয়াটাও যাচ্ছেতাই, অর্থহীন এবং খাপছাড়া।

ছায়াতেই তাপমাত্রা বিরানব্বই ডিগ্রী; লালকুর্তার শ্রেণীগুলি গাদাগাদি

হয়ে সঙ্কীর্ণ গলিপথে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার ওপর সেনাপতি হো তাঁর স্যাঁতসেঁতে জিনের ওপরেই বসে এক আগ্রহী, কৃতজ্ঞসম্পন্ন নাগরিক সমিতির অভিনন্দন গ্রহণ করছেন, খাদ্যশস্যের ব্যাপারী ফিনিয়াস থ্যাচার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করে বলল :

'হে মান্যবর মহোদয়, আমরা যে কষ্ট পেয়েছি, এই বদমায়েস চোর ছিনতাইবাজদের দলের হাতে সে সব নিয়ে আপনাকে কিছু বলবার আমার ইচ্ছা নেই।'

'আঃ, তা তো বটেই,' অধৈর্যে মাথা নাড়লেন হো।

'পরম দয়ালু আমাদের মহারাজের অনুগত প্রজা হিসেবেও আমাদের ধৈর্যের কথা আপনাকে—'

'ত তো বটেই।'

'কিন্তু আপনাকে আমাদের মুক্তিদাতা হিসেবে অভিনন্দন জানাতে—'

'ঠিকই তো, ঠিকই তো,' এইরকমই সমানে চলতে থাকবে কি না তা ঠিক না করতে পেরেও হো সায় দিলেন।

'আমাদের রক্ষক—'

বাহিনী শেষ পর্যন্ত সুশৃঙ্খলে এঁকেবেঁকে পথের ওপর দিয়ে শহরের বাইরে চলে গেল, যেন প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ অজগর। জয়ঢাক আর বাঁশী বাজতে থাকে; বাহিনীর পতাকাগুলো সগর্বে ঊর্ধ্বে ওড়ে; চলমান পায়ের ধপ ধপ শব্দের সঙ্গে বিচিত্র সুর মিলিয়ে কামানগুলো ঘড় ঘড় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে চলল। সৈন্যশ্রেণীর পুরোভাগই সেনাপতি হো এবং তাঁর পার্শ্বরক্ষীরা। সকলেই সাদা ঘোড়ার ওপর। এমন সুন্দর দৃশ্য মানহাট্টানের শান্ত গ্রামীণ অঞ্চল কখনও দেখেনি। এদের ঘিরে চারদিকে, মাঠে, পথে ছড়িয়ে রয়েছে আমেরিকানদের পড়ি-তো-মরি করে পালিয়ে যাবার সব নিদর্শন—ব্যাগ, বন্দুক, বেল্ট, টুপি, বারুদের চোঙা, গুলিভর্তি থলি, পুরনো বেয়নেট।

একজন পার্শ্বরক্ষী মন্তব্য করে, 'ওদের ভীষণ তাড়াহুড়ো ছিল, দেখছি!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হো বললেন, 'এই বিশ্রী গরমে তাড়াতাড়ি! পশ্চাদপসরণের সময়েও দেশীয় লোকেদের বিস্ময়কর শক্তি বটে!'

'বেশীদূর গিয়ে লড়তে পারবে না ওরা।'

অভিযোগের কণ্ঠে হো বললেন, 'এই স্থানীয় লোকগুলো এত কথা বলে কেন? এত কথা না বললে আমরা ঘণ্টাখানেক আগেই আমাদের গন্তব্যপথে এসে পড়তে পারতাম। কেবল কথা, কথা।'

ঘোড়সওয়ারেরা চলল। গরম বাড়তে থাকল। তাদের চমৎকার ইস্ত্রী

করা রঙীন ইউনিফর্ম ঘামে ভিজে সপসপে হয়ে উঠল। এর মধ্যেই দেখা হয়ে গেল জার্মানদের প্রথম দলের সঙ্গে। এরা ইস্ট নদী থেকে দ্বীপের আরও ওপরের দিকে নেমেছিল। হাসতে হাসতে, চিৎকার করতে করতে, নোংরা, সন্ত্রস্ত আমেরিকান ছেলেদের যুদ্ধবন্দীর দলকে দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ক্লান্তিতে তারা প্রায় হাঁটতেই পারছে না। নিজেদের কীর্তিতে জার্মানেরা খুব গর্বিত কিন্তু লালকুর্তা নৌবাহিনীর দল এদের দিকে একবারও না তাকিয়ে সোজা সামনে তাকিয়ে মার্চ করে চলে গেল।

ওদের কাউকে কাউকে হো জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুদ্ধ শেষ হয়ে যাচ্ছে না কি, সেনাপতি?'

ওরা মাথা নেড়ে বন্দীদের নিয়ে এগিয়ে গেল।

'একগুঁয়ে জানোয়ার সব।'

'শেষ হয়ে যাচ্ছে না কি?' হো আবার জিজ্ঞাসা করলেন; অবাক হলেন ওরা নিজেদের ভাষা নিজেরা বুঝতে পারছে না দেখে।

একজন পার্শ্বরক্ষী মন্তব্য করে, 'যাচ্ছেতাই ব্যাপার, ঐ রকম করে দল ভেঙে এগিয়ে যাওয়া।'

'উচ্ছন্নে যাক,' বললেন হো। একে গরম লাগছে, তার ওপর ক্লান্ত, বিরক্তিও খুব। সারাদিনে আর কিছুই করবার নেই এক আমেরিকান বন্দীদের সংগ্রহ করে বেড়ানো ছাড়া। আশা করেছিলেন একটা যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল পরিখা-রক্ষিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে সৈন্য নামাবার সেতুপথ তৈরী করা। ভেবেছিলেন ওদের নোওয়ানো খুব শক্ত হবে। তার বদলে ওয়াশিংটনের সৈন্যদল, বলা যেতে পারে, একেবারে মিলিয়ে গেল। দীর্ঘকায়, একগুঁয়ে শেয়ালশিকারীকে তিনি সম্মান করতেন, একটা সম্ভ্রমবোধ ছিল তাঁর প্রতি এবং একজন হুইগ হিসেবে বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর অনেক দিক থেকে সহানুভূতিও ছিল, অন্তত তত্ত্বের দিক থেকেও।

তাঁর মনে কোন ঘৃণা নেই; শুধু একটা অধীর ইচ্ছা আছে যুদ্ধে ইয়াংকিদের সামনে পেয়ে, বেশ কষে খোস মেজাজে ধোলাই দিয়ে, যুদ্ধ শেষ করে দেবেন। যেমন সব যুদ্ধ শেষ হয় আর কি। একটা মনোভাব সৃষ্ট হবে যাতে দু পক্ষেরই গণ্যমান্যদের টেবিলের দু দিকে বসে স্বাস্থ্যপান করা চলে। কিন্তু এই—এই একান্ত ত্রাসে, এই ঘৃণ্য ভীরুতায় তাঁর গা বমি দিয়ে ওঠে। বিপ্লব তো শেষ হয়ে গেল, তার আদর্শ গেল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে। যেমন সব আদর্শই যায়। তার ওপর এত গরম।

মনে মনে তিনি খুশী যে শীঘ্রই ইংলণ্ডে পাড়ি জমাতে পারবেন।

হাল্কা অস্ত্রধারী বাহিনীর এক অফিসারকে এখান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে নৌকো থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি ঘোড়ায় চড়ে সৈন্য-বাহিনীর সামনে এসে, কুর্নিশ করে, আমেরিকানদের পালানোর আরও খুঁটিনাটি খবর দিলেন হোকে।

তিনি সাগ্রহে বললেন, 'ওদের সকলকে রাতের আগেই পাকড়াও করব।'

হো জিজ্ঞাসা করলেন, অবশ্য তেমন বিশেষ আগ্রহে নয়, 'আন্দাজ কতজন?'

'এই দ্বীপেই, কমপক্ষে হাজার দশেক।'

টুপি খুলে, কপাল মুছে, হো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ বড় শিকার।'

'যদি একটু তাড়াতাড়ি করেন, স্যর!'

'যথেষ্ট সময় আছে।'

'হাঁ স্যর, তা আছে স্যর—কিন্তু আমার মনে হয় যে ওদের কয়েক হাজার এই দ্বীপের ওপরেই আছে, এখান থেকে পশ্চিম দিকে। জালে-পড়া খরগোশের মত আমরা ওদের কচকচিয়ে কেটে ফেলতে পারি।'

'হাঁ, সে তো বটেই, জানেন তো। এক গ্লাস মদ পেলে বাঁচতাম। এই জার্মানগুলোর লাইন ভেঙে আসা আমি একেবারে পছন্দ করি না। একজন কাউকে খুঁজে বার করুন যে ওদের ঐ যাচ্ছেতাই ভাষাটা বলতে পারবে।'

'দেখছি, স্যর। ওরা প্রায় শ পাঁচেক বন্দী নিয়ে যাচ্ছিল।'

'ওদের দল ছেড়ে আসা উচিত নয়। আচ্ছা, ঐ যে ওখানে, ও বাড়িটা কার?'

জর্জিয়ান ধরনের একটি খাসা বাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। বাড়িটি রাস্তা থেকে প্রায় শ দুয়েক গজ দূরে। একটি ছায়াচ্ছন্ন বারান্দা এবং বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি। দুজন নিগ্রো চাকর জানলার কাঠের খড়-খড়িগুলো নামিয়ে দিচ্ছিলো। ভোরবেলাকার গোলাবাজির সময় স্পষ্টতই এগুলো নামিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বারান্দায় তিনজন মহিলা বসে হাত-পাখায় বাতাস খাচ্ছিলেন।

'বলতে পারি না, স্যর। মনে হয় শত্রুপক্ষের পেছু ধাওয়া করার জন্যেই ওরা লাইন ভেঙেছে।'

'শৃঙ্খলা রাখার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তোমার কি মনে হয় ওরা আমাদের তেষ্টা মেটাবার জন্যে একটু কিছু দেবে?'

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই, অধস্তনদের হাত নেড়ে তাঁকে অনুসরণ করতে বলে এবং সৈনিকদের ডেকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে তিনি ঐ বাড়িটির দিকে ঘোড়া ছোটালেন। নিজের আগের কথা নিয়ে আলোচনা করতে করতেই হাল্কা পদাতিক বাহিনীর অফিসারটি তাঁর অনুসরণ করলেন। রঙীন পোশাক পরা সমস্ত দলটি একটু দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলেন যেখানে ঐ মহিলারা বসেছিলেন সেইখানে।

মহিলারা উঠে দাঁড়ালেন, যতটা না ভীত তার থেকে বেশী উত্তেজিত। সেনাপতি হো একটানে টুপি খুলে এমন নাগরের হাসি হাসলেন যে তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। এঁদের সকলেরই বয়স তিরিশের নীচে এবং সকলেরই এমন একটি সরল মনোহারিতা ছিল যে হোর মনে হল আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের মধ্যে এইটিই সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু। এঁদের মধ্যে একজনের রঙ ফরসা, চোখ দুটি নীল, চুল আঁচড়ানো শনের মত। অন্য দুজনের রঙ চাপা। সকলেই দেখতে সুশ্রী।

'আমার মিনতি আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমার আর আমার লোকেদের তেষ্টায় প্রাণ যাবার যোগাড়; এবং মরুভূমিতে মরূদ্যানের মত এই ছায়াময় বিশ্রামের আবাসটুকু দেখে—'

হো ঘোড়া থেকে নেমে নমস্কার করে তাদের সামনে উপস্থিত হলে তাঁরা হেসে বললেন, 'উইলিয়াম হো, আপনাকে যে কোন সাহায্য করতে আমরা সবিনয়ে প্রস্তুত।'

সোচ্চারে তাঁরা বললেন, 'মহামান্য মহোদয়!' এবং মধুর নমস্কার করলেন। হো জোর দিয়ে বললেন, 'এ মর্যাদা আপনাদের পরিচারকের প্রাপ্য।' তারপরে তিনি একে একে তাঁদের সামনে উপস্থিত করলেন কর্নেল বেন্টলিকে, কর্নেল জেমিসনকে, মেজর ল্যাসকে, ক্যাপ্টেন লরিংকে,ক্যাপ্টেন অ্যাটারবিকে, লেফটেন্যান্ট ব্রেস্টোনকে এবং লেফটেন্যান্ট বার্ডকে। তাঁরা সকলেই খুব সম্মানিত বোধ করলেন। যে মহিলারা কখনোই ইউনিফর্মের, রঙের, এবং ভদ্র ব্যবহারের অপূর্ব প্রকাশ দেখেননি, তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিলেন মিসেস মারে, মিসেস ভ্যান ক্লীহাট এবং মিস পেনরোজ বলে। মিস পেনরোজই হলেন সুকেশী, গৌরবর্ণা এবং তিনি হাল্কা পদাতিক বাহিনীর ক্যাপ্টেনের অন্য জায়গায় চলে যাবার ইচ্ছেটাও স্তব্ধ করে দিলেন। তাঁরা যখন পরস্পরকে নমস্কার করছিলেন ও গল্প করছিলেন তখন জেনারেল হো তাঁদের মনে করিয়ে দিলেন নিজেদের তেষ্টা পাওয়ার কথা।

মিসেস মারে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, 'আপনারা আমাদের কি

অসভ্যই না মনে করছেন।' তিনি হাততালি দিয়ে একটি চাকরকে ডেকে ক্ল্যারেট এবং ঠাণ্ডা পাঞ্চ আনতে বললেন। জেনারেল হোর কাছে যেন কৈফিয়ৎ দিলেন, 'আপনারা আমাদের ক্ষমা করবেন। জানি আপনারা পোর্টই পছন্দ করবেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই গ্রামাঞ্চলে পোর্ট যোগাড় করা খুব শক্ত।'

'ক্ল্যারেটই এখন অমৃত,' বললেন হো।

মৃদু হেসে মিসেস মারে বললেন, 'ভেতরে খুব ঠাণ্ডা। যদি আমার এই দীন কুটীরে আপনারা—'

'আপনার এই কুটীরটি মনোরম আশ্রয়স্থল,' হো বীরপণা করে বাধা দিয়ে বললেন।

লাঞ্চের পরে হুইস্ট খেলবার টেবিল পাতা হলে মিস পেনরোজ মন্তব্য করলেন পথে যে গরীব লোকেরা পড়ে রয়েছে তাদের অবস্থা কি শোচনীয়। এতদূর থেকে ব্রিটিশ বাহিনীর অগণিত সৈনিকদের মনে হচ্ছে রোদে ঝলসানো মাঠের ওপর ফেলে-দেওয়া দগদগে লাল ফিতে। একটি সৈনিকও তার স্থান থেকে নড়েনি; মনে হয় যেন চিরকাল ধরে নিজেদের রক্তবর্ণ দীপ্তি নিয়ে তারা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

কর্নেল জনসন গোঁফ মুছে, জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে বললেন, 'মোটেই না, মোটেই না, তা মনে করবেন না। যুদ্ধ করাটা তো চড়িভাতি করা নয়, একেবারেই নয়।' কর্নেল এতই বেশী মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁর নিম্নপদস্থেরা দূর থেকে মিস পেনরোজকে শুধু দেখেই যাচ্ছিলেন।

মিস পেনরোজ মনের আবেগেই জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, 'যুদ্ধ হতে হবেই বা কেন? ঐ ভীষণ কামানগুলোর শব্দে আমি ভোরের পরে চোখের পাতা বুজতে পারিনি, আর তারপর সারা সকাল ঐ দুর্ভাগা লোকগুলো ছুটে পালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মিসেস মারে খড়খড়ি নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'শান্ত হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। শুধু এইটুকু আশা করা যায় যে মাথার ওপর বাড়িখানা পুড়ে শেষ হয়ে যাবে না।'

কর্নেল ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'যুদ্ধটা, কি জানেন, মহিলাদের পক্ষে বড় বিশ্রী জিনিস।'

জেম্‌স্‌কে তা না বলে, মিস পেনরোজ অবিশ্বাসের সঙ্গেই বললেন তাঁদের, 'জেম্‌স্‌ যুদ্ধ করতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে ইংলণ্ড চালান করে দিলেন। জেমসের সব সময়েই একটা মেজাজ ছিল।'

মাথা নেড়ে, এবং ত্রুটি স্বীকারের মধ্যে সকলকে টেনে নিয়েই, কর্নেল

আবার বললেন, 'মহিলাদের পক্ষে বিশ্রী ব্যাপার।'

মিসেস মারে কর্নেল জেমিসনকে হুইস্টে চার পুরতে ডাক দিচ্ছিলেন। মিস পেনরোজ হুইস্ট খেলতেন না। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নিম্নপদস্থেরা বলে উঠল তারা তাস খেলায় মোটেই ভালো নয়।

চা খাবার সময় হবার মধ্যেই হো তাঁর তৃতীয় বোতল ক্ল্যারেট শেষ করেছেন এবং ঈশ্বরের কাছে শপথ করতে রাজী ছিলেন যে জীবনে কখনও তিনি এমন মনোরম সঙ্গীদের সঙ্গে বিকেল কাটাননি।

মিসেস মারে প্রতিবাদ করলেন, 'কিন্তু জানেন তো, আমরা বিদ্রোহী।'

'আঃ কি যে বলেন, মিসেস মারে!'

কর্নেল বেন্টলি স্বস্তিতেই বললেন, 'বিদ্রোহী! যত সব বাজে কথা! বিদ্রোহী আর নেই।'

বিদ্রোহীদের বিষয়ে মিসেস ড্যান ক্লীহাট বললেন যে তাঁর স্বামী ফিলাডেলফিয়াতে রয়েছেন এবং এই হতভাগাদের শেষ ব্যক্তিটি নিউ ইয়র্ক ছাড়ার আগে তিনি ফিরছেন না মৃদু হেসে বললেন, 'সত্যি, কি ভয়াবহ দৃশ্য। ওদের দুজনকে আজ সকালে আপনাদের দেখা উচিত ছিল। ধুলো-কাদায় সর্বাঙ্গ ভর্তি, গাড়ি রাখবার ঘরে লুকোবার চেষ্টা করছে।'

মিসেস ব্যাখ্যা করলেন, 'জ্যাকসন তাদের দফা সেরে দিয়েছেন।'

মিস পেনরোজ বললেন, 'যদি ইউনিফর্ম পরে থাকত তাহলেও না হয় কথা ছিল। আপনারা তো মনে করেন, মনে করেন তো যে, ঐ লোকগুলো যে কংগ্রেসের তাদের ইউনিফর্ম আছে—মানে সেনাবাহিনী তৈরি করতে গেলে, আমি বলছি যে কোন রকমের ইউনিফর্ম।' তিনি জানলা দিয়ে সপ্রশংস চোখে তাকালেন ঐ যেখানে লালকুর্তা বাহিনী রৌদ্রে দাঁড়িয়েছিল সেইখানে।

মিসেস মারে মৃদু হেসে বললেন, 'ওরা এত বেশী গরীব! একটু উঁচু স্তরের লোকেরা ওদের কাউকেই স্থান দেবে না।'

'শুনছি শুইলারেরা, পিন্টার্ডেরা এবং বীকম্যানেরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে আছে।'

'কেউ কেউ—হাঁ, সে তো উঁচু লোকদের মধ্যেও কুলাঙ্গার থাকে তো। রুজভেল্ট বেনসন এবং হফ্‌ম্যানেরাও ঐ উটকো দলের সঙ্গে গিয়েছে। তবে তাদের শিক্ষা হবে। মাথার তাজ ধুলোয় পড়ে লুটোতে লুটোতে আসবে।'

ক্ল্যারেটের চতুর্থ বোতল শুরু করে গেলাস উঁচু করে ধরে হো বলে

উঠলেন, 'যুদ্ধ শেষ হবার কামনায়।'

'আপনি তাই মনে করেন নাকি?'

'সে তো বটেই। শুধু লোকগুলোকে বন্দী করতে যা বাকি।'

'এত বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম আমরা।'

'মহিলাদের পক্ষে বিশ্রী ব্যাপার,' কর্নেল জেমিসন সায় দিলেন।

মিসেস মারে যোগ করলেন, 'আর জিনিসপত্রের দাম এত অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে।'

ডিনারের সময় সেনাপতি হো জোর গলায় বললেন, 'না না, কি যে বলেন, আপনারা এমন মধুর, এমন মনোরম ব্যবহার করেছেন মিসেস মারে, কিন্তু আমরা তো অনাহূত অতিথি।'

'কিন্তু আপনারা তো জানেন না আপনারা এখানে আসবার পর থেকে আমরা কত নিরাপদ বোধ করছি,' মিস পেনরোজ জোর দিয়ে বললেন।

'একটা যুদ্ধ হচ্ছে। ব্যাপারটা মোটেই সুখের নয়, কিন্তু মানুষের কর্তব্য,' বললেন জেনারেল হো।

তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন মিসেস মারে, 'আপনি নিজেই যে বললেন আজ সকালেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে।'

জ্যাকসন সেনাপতিকে ক্ল্যারেটের পঞ্চম বোতল এনে দিলেন।

বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা হল, মানহাট্টানের বৃক্ষশ্রেণী এবং ক্ষেতগুলোর ওপর দিয়ে মৃদুমন্দ বাতাস বইতে শুরু করল। মারেদের বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল এবং খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে কাপ ডিশের টুং টাং শব্দ এবং হাসির শব্দ আসতে থাকল।

ইতিমধ্যে শেষ পলায়নপর আমেরিকানটি উত্তরে চলে গিয়ে হার্লেমের ব্যূহের পেছনে আশ্রয় পেয়েছে।

৮

বুড়ো পাট্‌নাম্ মিফলিনকে কনুই দিয়ে আস্তে গুঁতো মেরে বললেন, 'ওঁকে বলুন না।'

'কি বলব?'

'ওঁর সঙ্গে কথা বলুন।'

'কি বলব? ওঁকে আমি বলবটা কি?'

'জানি না, তবু কথা বলুন। আরে, দেখছেন না ওঁর সঙ্গে কারও কথা বলা দরকার?'

'কি কথা বলব ?'

'যা খুশি। ওঁকে বৃষ্টি থেকে ভেতরে আসতে বলুন না।'

'শুধু এই ?' মিফলিন বোকার মত বলে আবার যোগ করলেন, 'আপনি ওঁকে বলুন না বৃষ্টি থেকে সরে আসতে।'

কি করে তিনি বাহিনী নিয়ে পালিয়ে এসেছেন এই কথা ভেবে পাট্নাম্ বললেন, 'আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারব না।'

সেই সেপ্টেম্বরের ভীষণ গরম এবং গুমোটের পরে অন্ধকারের সঙ্গে বৃষ্টি নেমে এল। জোর তীব্র বৃষ্টি, ভীষণ ঠাণ্ডা, গায়ে যেন বেত মারে, তবু এতে স্বস্তি এল; কেননা যে আমেরিকানরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তাদের ওপরে ব্রিটিশেরা আর কামান দাগতে পারবে না। পরাজিত ইয়াংকিরা একটা সুযোগ পেল হার্লেমে আমেরিকান ব্যূহের মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়ার মত কোনমতে পার হবার। বিনা ছাউনিতে, বিনা জামাকাপড়ে অবিশ্রান্ত বর্ষণে শীতে কাঁপতে লাগল।

এই আমেরিকান ব্যূহটিতে ছিল মিফলিনের ব্রিগেডগুলো, ম্যাসাচুসেটসের লোক, মার্বলহেডের জেলেরা, বস্টনের স্থানীয় বাহিনী এবং মিডলসেক্সের চাষীরা। এরা কিন্তু তখনও শক্ত হয়ে ঘাঁটি আগলে; হয়ত এইজন্যেই যে ব্রিটিশ এবং জার্মান সৈনিকেরা এত উত্তরে মানহাট্টান দ্বীপ পর্যন্ত পৌছতে পারেনি বলে।

দক্ষিণতম প্রান্ত থেকে, দ্বীপটিকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে বিভক্ত করে, উত্তরের সঙ্কীর্ণ, গভীর উপত্যকার মধ্যে দিয়ে পরিখাগুলো খোঁড়া হয়েছে। হাডসন নদীর তীরে ক্লেয়ারমন্টের কাছে গভীর ও সঙ্কীর্ণ আর ইস্ট নদীর কাছাকাছি গিয়ে চওড়া। সেই সময়ে এটাকে 'ফাঁপ রাস্তা' বলা হত। একটি বিপর্যস্ত বাহিনীর পক্ষেও অবস্থানটি ভালো, কেন না, আক্রমণ করতে হলে ব্রিটিশদের উৎরাই বেয়ে নেমে এসে, উপত্যকার পাদদেশ পার হয়ে, আবার চড়াই-এ উঠতে হবে। ১৫ই সেপ্টেম্বরের সারা বিকেল এবং সন্ধ্যে কনেকটিকাট, নিউ জার্সি এবং পেনসিলভ্যানিয়ার ভীত মানুষগুলো টলতে টলতে কোন রকমে ঐ ফাঁপ রাস্তায় ঢুকে পড়ে, ম্যাসাচুসেটসের পরিখার পেছনে নিরাপত্তা খুঁজে পেল। মার-খাওয়া, নিরুৎসাহ এই লোকগুলো মাটিতে বুকে হেঁটে চলতে চলতে নিউ ইংল্যাণ্ডারদের কত বিদ্রূপই শুনল। নিউ ইংল্যাণ্ডারেরা আক্রান্তও হয়নি, অবরুদ্ধও হয়নি। তারা অবশ্য সাহসের গর্ব করতে পারে, দু সপ্তাহ আগে ব্রুকলিন পাহাড়ে তাদের সাহস কোথায় ছিল সে কথা একেবারে ভুলে গেছে।

মধ্যপ্রদেশগুলোর লোকেদের উত্তর দেবার কিছু ছিল না। তারা একদম না নড়েচড়ে পড়ে রইলো—শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে লক্ষ্য করল অফিসারেরা কি চেষ্টা করছেন এখানে একটি ব্রিগেড ওখানে একটি ব্রিগেড সংগ্রহ করবার জন্যে। কনকনে বৃষ্টি নেমে এলেও তারা প্রায় নিস্পন্দ হয়েই রইল।

বিপর্যস্ত বাহিনীর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ভার্জিনিয়ান বাঁয়েও তাকান না, ডাইনেও তাকান না। কিন্তু তিনি চলে যাবার পরে সৈনিকেরা তাঁকে মাথা নেড়ে অভিবাদন জানায়, পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে তারা ওঁর চোখের দিকে তাকিয়েছে কি না। ওঁর সকালের কাজকর্মের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে কনেকটিকাটের লোকেরা একটু প্রাধান্য অর্জন করল। তারা বর্ণনা করল যে তিনি একেবারে কেমন বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন, তলোয়ার দিয়ে তাদের কচুকাটা করেছেন।

'টম জোনসের আঙুলই কেটে উড়িয়ে দিয়েছে,' বললে একজন।

আর একজন নিজের কানের পেছনটা কেমন দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠেছে দেখিয়ে বললে, 'চাবুক দিয়ে লাগিয়েছে এইখানে।'

'ওঁর মেজজটা খিঁচড়ে গিয়েছে,' স্থির করলে আর একজন: 'একেবারে গিয়েছে, একেবারেই বিগড়েছে। চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখ না।'

খুব নীচু গলায় একটি হার্টফোর্ডের ছেলে বর্ণনা করল কি ভাবে সর্বাধিনায়ক ঘোড়ার ওপর বসে অপেক্ষা করছিলেন ব্রিটিশদের হাতে মরবার জন্যে।

নক্স, পাট্‌নাম্‌, মিফলিন এবং নোলটন ও বার একসঙ্গে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলেন যে ভার্জিনিয়ান ঐ মুষলধারার বৃষ্টির মধ্যে পায়চারি করছেন। ইতিমধ্যে মধ্যরাত্রি অতীত তবু তিনি হেঁটেই চলেছেন, সামনে পেছনে, সামনে পেছনে, প্রায় চার ঘণ্টা ধরে। চলার গতির পরিবর্তন নেই; হাঁটছেন একই রেখায়, পায়ের জুতোর তলায় মাটি দলা পাকিয়ে কাদার তাল হয়ে উঠছে। নীল কোট ভিজে সপসপে, বেঢপ হয়ে উঠেছে; টুপির একটা কোণা ঝুলে কানের ওপর ঝুলে পড়েছে। তা থেকে কাঁধের ওপর অবিরাম জল ঝরে পড়ছে। হাত দুটি ঝুলছে পাশে নিস্তেজে এবং মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড হাত দুটি অদ্ভুত মুঠিতে পাকিয়ে উঠছে আবার খুলছে।

আর সহ্য করতে না পেরে নক্স পাট্‌নামের সুরে সুর মিলিয়ে মিফলিনকে ওঁর কাছে গিয়ে মিনতি করলেন কথা বলবার জন্যে। এবং পাট্‌নাম্‌ প্রায় কাতর ভাবে আবার বললেন, 'ওঁকে বৃষ্টি থেকে সরে আসতে বলুন।'

মিফলিন মাথা নেড়ে বললেন, 'বেশ,' এবং প্রধান সেনাপতির কাছে গিয়ে বললেন, 'স্যর, যদি মনে কিছু না করেন—'

দীর্ঘকায় লোকটি হাঁটা থামিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার মিফলিনের দিকে তাকিয়ে, আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

'স্যর, মনে কিছু করবেন না, বৃষ্টি থেকে সরে আসুন।'

'কি ?'

'আমি বলছিলাম যে আপনি, স্যর, বৃষ্টি থেকে সরে আসুন। সরে আসুন স্যর। আপনি একেবারে ভিজে গিয়েছেন।'

'ভিজে ? তুমি আমাকে কি বলবার চেষ্টা করছ মিফলিন ?'

'আপনি ভিজে গিয়েছেন স্যর—একেবারে সপসপে হয়ে ভিজে গিয়েছেন। আপনার ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'মিফলিন, তোমার কাজে মনোযোগ দিলে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেব,' ভার্জিনিয়ান শান্ত স্বরে বললেন।

'স্যর, আপনি যা ইচ্ছে হয় বলুন কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় মরলে পৃথিবীতে কারুর কোন উপকার হবে না।'

'তুমি নরকে গেলে, উচ্ছন্নে গেলে আমি তোমায় ধন্যবাদ দেব মিফলিন।'

'জেনারেল ওয়াশিংটন, দয়া করে—'

এবারে নক্স মিফলিনের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, পাট্‌নাম্‌ পেছনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। ওয়াশিংটন হাঁটা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়রা, ব্যাপার কি ? আপনাদের কোন কর্তব্য নেই, কোন ব্রিগেড নেই—?'

'জেনারেল ওয়াশিংটন, কৃপা করে বৃষ্টি থেকে সরে আসুন,' এই কথা বলেই নক্সের স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল এবং তিনি পেছন ফিরলেন। সকলে মিলে অসহায় ভাবে ঐ দীর্ঘকায় লোকটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন শেয়ালশিকারী কোমল কণ্ঠে বললেন, 'শুনুন, আমরা এখন আমার সদর দপ্তরে যাব। আমরা কেউই তো আর শুকনো নেই, তাই না ?'

নক্স আর মিফলিন তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। বিলি যখন একটা লম্বা লোহার হাতাতে এক মগ পানীয় গরম করছে তখন তাঁর জামাকাপড় এঁরা খুলে দিলেন। তিনি তখন শান্ত, তন্দ্রালু এবং এঁরা যখন তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কম্বল ঢাকা দিয়ে দিলেন তখন তিনি কোন প্রতিবাদ করলেন না। পানীয়টি যখন তিনি খেলেন তখন নক্স তাঁর ঘাড় এবং মাথা ধরে

রইলেন। একটু পরেই তিনি শিশুর মত শান্তিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন।

এঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলে বিলি তাঁদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। তাঁরা মাথা নেড়ে কোমল সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন, 'উনি ঘুমোচ্ছেন।' ভাবখানা এমন যেন ঐ কালো নিগ্রোটি পিতৃস্থানীয় এবং তার জানবার অধিকার আছে।

বিলি জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর অসুখ নয় তো?'

মিফলিন মাথা নেড়ে বললেন, 'না—মানে অসুখ নয়, আমার তো তা মনে হয় না।'

মিফলিনের মুখে আর কোন কথা যোগালো না; ঐ দীর্ঘ ক্লান্ত শরীরে যা ঘটেছে তা বর্ণনা করার মত ভাষা নেই। নিজের কথার ওপর নিজের বিশ্বাস না থাকায়, নক্স আগুনের সামনে বসে বঙ্কিম অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। লকলকে এঁকেবেঁকে ওঠা অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়েও নক্স মনে শান্তি পেলেন না, আশাও কিছু জাগল না। একটা স্বপ্ন ভেঙে যাবার পর তাঁর একগুঁয়ে, একেবারেই কল্পনাশক্তিহীন মন আর একটি স্বপ্নের হদিশ পেল না। এত সব জিনিস চলে গিয়েছে: দীর্ঘকায় শেয়ালশিকারীর সম্মান গিয়েছে কেননা তিনি ভার্জিনিয়ার অভিজাত ব্যক্তি; কিন্তু নক্সের ক্ষেত্রে সম্মানের চেয়ে আরও অনেক বেশী কিছু গিয়েছে—মনোরমা স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী, স্নেহময় গৃহ, বহু গ্রন্থ, বহু আশা, একটি জাতি, একটি পুরো গণতন্ত্র। এইসব নিয়ে একটি সোচ্চার স্বপ্ন তাঁর কান এমন ঝালাপালা করে তুলেছিল যে তাঁর ঐ দুর্গত, নোংরা, ছোট্ট এই দেশটুকুর জন্যে তিনি তাঁর ধনপ্রাণ সব দিতে তৈরি হয়েছিলেন।

আর একটি লম্বা হাতা আগুন থেকে বের করে বিলি বললে, 'এই নিন আপনাদের মদের সরবৎ।' যে রান্নাঘরে তাঁরা বসেছিলেন সেটি ভরে গেল পোড়া চিনির ঘরোয়া সুগন্ধে।

'আপনি খাবেন নাকি?' মিফলিন নক্সকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তারপর তাঁরা দুজনে অগ্নিকুণ্ডের দু পাশে বসে সাংঘাতিক স্তব্ধ আগ্রহে ঐ ফুটন্ত গরম গরম মগের পর মগ গলায় ঢালতে লাগলেন।

তাঁরা যখন গাড়িবারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন তখন তাঁরা মত্ত, মেজাজ বেশ শরিফ। একটু পরেই অতিপানে একেবারে মত্ত, তিক্ত, বিষাক্ত হয়ে উঠল তাঁদের মন। সব আনন্দ চলে গেল, মদ্যপানের সব সুফল গেল চলে। বর্বরতা, দেহকামনাও লুপ্ত হল। অশ্লীল ছড়া এবং কুৎসিত রসিকতাও

গেল। পরস্পরে ধরাধরি করে তাঁরা মরিসদের বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায় ধীরে ধীরে এদিক আর ওদিক করতে লাগলেন। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে; চাঁদের ভূত উঠেছে যেন আকাশে এবং কুয়াশা ভরা রাত্তিরে লনের উতরাইতে একজন সান্ত্রী আসা-যাওয়া করছে। নক্স পেছন ফিরে বাড়ির অপূর্ব স্তম্ভ-গুলোর দিকে তাকিয়ে এবং এই বাড়ির টোরি মালিকের কথা ভেবে একটা যাচ্ছেতাই গাল দিয়ে উঠলেন।

বর্বর আগ্রহে মিফলিনও তাতে সায় দিলেন।

তাঁর অভ্যাসমত, ভোরের একটু আগেই, প্রধান সেনাপতি জেগে উঠলেন; তাঁকে দেখে মনে হল যে ঘণ্টা দুই ঘুমোনোর পরে তিনি বিশ্রাম পেয়ে মনের গ্লানি কাটিয়ে উঠেছেন। তাড়াতাড়ি পোশাক-আসাক পরে নিয়ে, প্রাতরাশের টেবিলে বসে, প্যানকেক আর মধু খেতে খেতে অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল রীডের কথা শুনছিলেন। ব্রিটিশদের গতিবিধির খোঁজ নেবার জন্যে সন্ধানীবাহিনীর দেওয়া খবরাখবরে তাঁর একেবারে গলা পর্যন্ত ভর্তি: প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক রীডের একটা কেমন ঢিলেঢালা ভাব আছে, চেহারাটি কৃশ কমনীয়, একটু যেন মেয়েলি ভীরুতায় মাখা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ছোট খোদাই-করা মূর্তির মত আর চোখ দুটি বড় বড় নীল। এতে ঐ ভাবটি আরও বেড়েছে। তাঁর স্পর্শকাতরতা এত বেশী যে অন্যেরা যখন কষ্ট পায় তখন তিনি পেছনে থাকেন—যেন নিজের আহত হবার সামর্থ্য পরীক্ষা করে নিতে তাঁর ভয় আছে। কখনও কখনও ভার্জিনিয়ানের মনে হত রীড তাঁকে ভয় করেন। তাই, আগের দিন, তাঁর কিছু করার নেই জেনেও, রীড আধ-বোঁজা চোখ দুটি দিয়ে নেমে-আসা সর্বনাশ দেখেছেন। নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে, সুপুষ্ট ঠোঁট কামড়েছেন। তারপর খুব সকালে, লোকে যখন আগের দিনের ঘটনায় একেবারে হতভম্ব হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে এবং কিছু করছে না, তিনি সবচেয়ে বিশ্বস্ত একটি দল বেছে নিয়ে, খুঁজে বার করতে পাঠিয়ে দিলেন ঠিক কোথায় ব্রিটিশেরা আছে এবং কি করতে মনস্থ করছে।

এই সন্ধানীবাহিনীর নেতা ছিলেন টমাস নোলটন। তাঁর বিশ্বাস হয়নি যে ব্রুকলিন পাহাড়ের যুদ্ধে সব ইয়াংকিরাই ছিল ভীতু। তিনি ছিলেন কনেকটিকাটের এক দলের সঙ্গে এবং না পালিয়ে তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে আরও কয়েকজন তাঁর পাশেই রয়ে গেল এবং তাঁরই মত পালাল না। বিশেষ করে একজন, কভেন্ট্রির স্কুল-শিক্ষক ন্যাথান হেলকে নোলটন যখন জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কেন অমন স্থির হয়ে ব্রিটিশদের

গুলিবৃষ্টির মধ্যে গায়ে বর্ম-টর্ম কিছু না দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন উত্তর হল, 'যাবার কোন জায়গা ছিল না বলে—' তারপর যুক্ত হল, চিন্তাকুল স্বরে, 'বিপ্লবের ওরা কিছু জানে না। ওটা খেলা নয়। ওটা হয় শেষ নয় শুরু।'

এই কথাটির যে কোন অর্থ আছে এটা নোলটনের মাথায় ঢুকল না। বিদ্রোহী হওয়ার চেয়ে যুদ্ধ করাটাই তাঁর পেশা। ইয়াংকি বলে যুদ্ধের এই দিকটা তিনি বোঝেন। ভালো করে কামানোর পর তাঁর একমাত্র গর্ব ছিল যে তিনি নিজেই নিজের কর্তা। তা ছাড়া বয়স্ক জীবনে তাঁর একবারই মাত্র কান্না পেয়েছিল একটি বুড়ো চাষীকে দেখে। তার সব গিয়েছে। হতাশ হৃদয়ে সে জীর্ণ পা দুখানাকে টেনে টেনে, আর একজনের জীবিকা অর্জন করতে চলেছে। স্বাধীনতার প্রতি নোলটনের যে আকর্ষণ সেটা যুক্তির দিক থেকে নয়। জালে-পড়া সেই শেয়ালীর মত তাঁর প্রতিক্রিয়া যে নিজের পা কামড়ে ফেলে দিয়ে নিজের বাচ্চাদের কাছে ফিরে যাবে, সে মৃত্যু হলেও। তাঁর বিশেষ ভাবনা ছিল এই যে একদল লোক যদি তিনি পেতেন যারা গুলির শব্দ শুনলেই পালাবে না, তাহলে কিছু ফায়দা হত! স্পেন্সার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিলে, নোলটন বিশ বছরের হেল, সতের বছরের মর্টন এবং উনিশ বছরের লেককে ক্যাপ্টেন হিসেবে নিয়ে, ভালো নিশানা আছে এমন কয়েকজনকে সংগ্রহ করে একটি ছোট সন্ধানী-বাহিনী তৈরী করলেন। এই বাহিনীতে তিরিশের বেশী বয়েস কারও ছিল না, বেশীর ভাগই কুড়ির নীচে; কিন্তু শিশুদের পর্যন্ত একটিই বৈশিষ্ট্য যে তাদের বিশ্বাস! কি একটা অজানা কারণে তারা ব্রুকলিন থেকে পালায়নি।

এই সন্ধানীবাহিনীটিকেই রীড চারিদিকে অনুসন্ধান করতে পাঠিয়েছিলেন ব্রিটিশেরা কোথায় আছে খুঁজে বার করবার জন্যে। এখন সর্বাধিনায়কের প্রাতরাশের টেবিলের বিপরীত দিকে বসে তিনি নিজের কথা সাগ্রহে বলতে লাগলেন।

বললেন, 'বুঝছেন না স্যর, লালকুর্তারা জানে আমরা হেরে গিয়েছি। মানে, কিছু মনে করবেন না, কিন্তু ওরা জানে, ওরা জানে!'

বিশালকায় লোকটি তাঁর সুশ্রী অ্যাডজুটান্টের দিকে নির্মম ভাবে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে সে কথা মনে করিয়ে দিতে হবে না, মিঃ রীড।'

'কিন্তু সেইটিই তো আসল কথা, স্যর, যে, তারা সেটা জানে! এখন যদি আমরা পাল্টা আক্রমণ করি, ওরা টলতে টলতে পেছিয়ে যাবে।'

অনাগ্রহে বিশালকায় ব্যক্তিটি মাথা নাড়লেন এবং তাঁর না-বলা কথার উত্তরে চেঁচিয়ে বললেন, 'কিন্তু সে তো কালকের ঘটনা, স্যর। গতকালটা

আর এমন কি ব্যাপার ?'

ভার্জিনিয়ান বিড়বিড় করে বললেন, 'সেটাই তো মনে করিয়ে দিচ্ছে।'

'কিন্তু যুদ্ধ তো আমরা করতে পারি !'

'না, মিঃ রীড, যুদ্ধ আমরা করতে পারি না। আমরা পালাতে—এমন কি সুশৃঙ্খলায় পালাতেও পারি না।'

অ্যাডজুট্যান্ট হাত মেলে ধরে ভুল স্বীকার করলেন, 'দুঃখিত স্যর ; আমি স্বীকার করছি ভুল করেছি। পরে বললেন, 'কিন্তু সন্ধানীবাহিনীটা ?'

'ফিরে আসবে,' নিরুৎসাহে বললেন দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি, 'ওদের ছুটবার পা আছে। তাই ফিরে আসবে।'

মরিসদের বাড়ি থেকে তাঁরা ফাঁপা রাস্তার ব্যূহে গেলেন ঘোড়ায় চড়ে, দেখা হল মিফলিনের সঙ্গে। তিনি রীডের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ভার্জিনিয়ানের একটু পেছনে রীড নিজের দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে, অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন।

আজকে আর তিনি আগের সেই দীর্ঘকায় ক্ষেত মালিক নেই। শুধু স্মৃতিগুলো আছে ; ভেতর থেকে একটা ঠেলা তাঁর দেহটাকে চালাচ্ছিল, কতকগুলো প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নিচ্ছিল। এই দুঃস্বপ্নের মত পরাজয়ের আগে যা কিছু আগে ঘটেছে সেই সবের মধ্যেই তিনি বেঁচে ছিলেন। বর্তমানটা একটা বুকভাঙা বিরতি। এর পরে আর আগামীকাল বলে কিচ্ছু নেই। সেই রূপহীন এলোমেলো স্মৃতিগুলোর মধ্যে থেকে ভালোমন্দ সব রকমের জিনিসই বেরিয়ে আসতে থাকে। একটি সময়ের কথা মনে এল : একটা পয়েন্টার কুকুরবাচ্ছা, অসুস্থ হয়ে, পশুসুলভ নিঃস্বার্থ অসীম ভালো-বাসায়. ওঁর চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে মরে গেল। এমন অদ্ভুত শোকে ওঁর মন পূর্ণ হয়ে গেল যে, সে শোক তাঁর সৎ মেয়ে প্যাটসি, তাঁর এত আদরের ভালোবাসার প্যাটসি মারা যেতে যেমন হয়েছিল সেই রকমই। মেয়েটির অসুস্থ মন অবশ্য শান্তি পেয়েছিল। শোকের সবটুকুই বেদনা নয় ; এ শোকের সঙ্গে ভালোবাসার মিল আছে। আবার এখন মনে পড়ছে এক প্রতিবেশীর বাড়ি যাওয়ার কথা। তাদের ষোলটি ছেলেপুলে—সুশ্রী, স্বাস্থ্য-বান বাচ্ছা সব, হাসছে খেলছে তাঁকে ঘিরে। শোকের সঙ্গে ভালোবাসার এই মেশামেশি সহ্য হচ্ছিল না। তাঁর নিজের কোন ছেলেপুলে ছিল না বলে তিনি বাধ্য হয়ে নিজেকে বাইরের বাড়িতে বদ্ধ করে রাখলেন। হাতের ওপর মুখ রেখে বসে তিনি, ঐ যে ষোলটি যারা তাঁর নিজের কখনই হবে না তাদের জন্যে দুঃখে নয়, দুঃখ ঐ নামহীন পয়েন্টার কুকুরছানাটার জন্যে

আর ঐ অর্ধোন্মাদ সৎ মেয়েটির জন্যে।

কিন্তু গতকাল যা ঘটেছে এবং তারও আগে তিন সপ্তাহ ধরে, সেটা ভয় নয়, শোক নয়, শুধু অসাড়-করে-দেওয়া নৈরাশ্য। তাঁর সব দম্ভ চূর্ণ করে দিয়েছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে নড়া-চড়া ভালো। তাই পরিখাগুলোর ব্যূহের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে চললেন। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে নোংরা নিউ ইংল্যাণ্ডারেরা আর মিডল্যাণ্ডারেরা। ফাঁপা রাস্তার তলা দিয়ে রীড আর মিফলিন যাচ্ছেন তাঁর পেছন পেছন। তাঁদের ভয় এই যে একলা থাকলে উনি কি করে বসেন, বিশেষ যখন ব্রিটিশ ব্যূহের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন। উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন প্রভাত, কাল রাতের প্রচুর বৃষ্টির পর স্নিগ্ধ, আরামদায়ক। বাতাসে ভেসে আসে পাখীর, মোরগের আর শিকারী কুকুরের ডাক। প্যালিসেড পাহাড় থেকে হাডসন নদীর ওপর দিয়ে খর বাতাস বইছে, এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে উপত্যকার ওপর দিয়ে, শুকনো পাতা ছড়িয়ে, খুশীতে গাছগুলোকে দুলিয়ে দিয়ে।

মর্নিংসাইড পাহাড়ের চড়াই-এ তাঁরা উঠতে শুরু করেছেন এমন সময় কানে এল বন্দুকের গুলি ছিটিয়ে আসার শব্দ, মাইল খানেক দূর থেকে ছোঁড়া হচ্ছে বলে মনে হয়। দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি ঘোড়া থামিয়ে, কোন আগ্রহ না দেখিয়েই কান পেতে শুনলেন, কিন্তু রীড ঘোড়া ছুটিয়ে এসে চিৎকার করে বললেন, 'নোলটনের সন্ধানীবাহিনীর গুলি, স্যর, ওরা খুঁজে পেয়েছে—এইবার ওদের টেনে বার করে আনবে।'

দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি নড়লেন না। যে শব্দ একসময়ে তাঁকে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারত সেই শব্দে এখন তিনি অবিচলিত, অনাগ্রহী। নোলটনের সন্ধানীবাহিনীকে আরও সৈনিক দিয়ে জোরদার করে ব্রিটিশদের ফাঁদে ফেলার কথা তাঁর কানে যাচ্ছে কিন্তু তিনি শুনছেন না। বন্দুকের শব্দ আসতে থাকে, রীডও কথা বলে চলেন; তারপর তাঁর গলাও মিলিয়ে যায়; তিনি তাকান মিফলিনের কঠিন মুখের দিকে কিছু সহানুভূতির আশায়। তারপর তাঁরা দুজনেই ঘোড়ার ওপর নির্বাক হয়ে বসে থাকেন।

গুলির শব্দ বন্ধ হলে রীড বললেন, 'ওরা ফিরে আসবে এইবার। কিন্তু যুদ্ধ একটা ওরা করেছে, স্যর। ওরা যে একটু মারামারি করেছে এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির মধ্যেও প্রতিটি গুলি বোঝা যাচ্ছিল।'

তবু ভার্জিনিয়ান নড়েন না।

ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে নোলটনের লোকগুলোকে প্রথম দেখা গেল। ওরা ছুটছে না কিন্তু মাপা গতিতে পেছনে হাঁটছে—হাতে বন্দুকগুলো; কোন বিশৃঙ্খলা. তাড়াহুড়ো বা ভয় নেই। কেউ কেউ আহত, সঙ্গীদের কাঁধে হাত রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে। অন্যদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নোলটনকে দেখা গেল—একটা ভালুকের মত দেখতে, প্রকাণ্ড চেহারা, রীডের দিকে হাত নেড়ে হি হি করে হাসতে হাসতে, তাঁর চোখে পড়ল প্রধান সেনাপতিকে। ছোট্ট সন্ধানীবাহিনীটি এক জায়গায় জমা হয়ে, ঐ যেখানে তিন সেনাপতি বসেছিলেন সেইদিকে দৌড়াল।

সেই মুহূর্তে পাহাড়ের ওপর থেকে শিকারীর গলার আওয়াজ ভেসে এল।

এইটিই হল শেষ, সবচেয়ে তীক্ষ্ণ আঘাত। ভার্জিনিয়ান শেয়ালশিকারীর মনে দাগ কেটে বসে গেল। বুঝেছিলেন যে এটা তাঁকেই উদ্দেশ করে। নির্মল বাতাসে, আধ ডজন ভেরীতে খুশীর সুরে গান ভেসে আসতে লাগল:

শিকারে যাব আমরা
শিকারে যাব আমরা
শিয়াল ধরে আমরা
পুরব তারে বাক্সেতে
ধরব মোরা ছাড়তে।

মর্নিংসাইড পাহাড়ের পেছনে, প্রান্তর, ক্ষেত বনের আড়ালে কি যে চলেছে তা আর শেয়ালশিকারীর পক্ষে দেখার দরকার ছিল না। ভদ্রলোকেরা, অভিজাতেরা, হবু-অভিজাতেরা, রুচি-দেখানো বিলাসীরা—সকলেই মজা পেয়ে গিয়েছে। তাদের সূক্ষ্ম, তলোয়ারে কাটার মত ব্রিটিশ-সুলভ রসিকতা পেয়ে বসায়, যাকে আঘাত করতে চায় তাকে ঠিক মেপে আঘাত করছে—একটা গ্রামাঞ্চলের শেয়ালশিকারীর এত সাহস যে সে নিজেকে একেবারে অভিজাত ভদ্রলোক ভেবে বসে আছে।

বাহিনীতে আর কেউ না বুঝুক তিনি ঠিকই বুঝেছেন। তিনি জানতেন ঠিক কেমন করে একজন চালবাজ লোক একটি ব্যক্তির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেই তাকে শেষ করে দিতে পারে; বুঝতে পেরেছিলেন কেমন করে তারা তাঁর বিপ্লবের শোচনীয় ব্যঙ্গকে ধ্বংস করে দিয়েছে, এটাকে একটা শেয়ালশিকারে পর্যবসিত করে. খেলার মত করে খুশীতে শেষ করে দিয়েছে। স্পষ্টই তাঁর চোখের উপর তাদের মূর্তিগুলো ভাসছে—পুরনো বন্দুকগুলো পেছনে নিয়ে

সকালের রোদে তারা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে—চাপা হাসি হেসে ভেরীবাদকদের খোঁচা মেরে ঐ শিকারের গানই চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা জানে যে কোথাও, কোনপ্রকারে এটা তাঁর কানে পৌঁছবেই। ডাকাডাকি করছে পরস্পরকে; শেয়ালধরা কুকুরদের যেন উৎসাহ দিচ্ছে :

'ইঐকস! ইঐকস!'

উনি ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে পড়তেই ওঁর মস্ত হাতখানা চমকে-ওঠা নোলটনের কোটে আটকে গেল; গর্জন করে উঠলেন :

'এই ইয়াংকি বেজন্মা, বল্ ভয় পেয়েছিস কি না?'

'সত্যি বলছি স্যর, না!'

'আমাকেও ভয় পাস না, ওদেরও না?'

শান্তভাবে নোলটন বললেন, 'ঈশ্বরের এই সবুজ পৃথিবীতে কিছুতেই আমি ভয় পাই না।'

'তাহলে বল, একটি দল নিয়ে এখান থেকে ঐ বাঁদিকে উপত্যকা দিয়ে নেমে, পাহাড়ের পূব দিক দিয়ে চড়াই ভেঙে—পার পেছনে যেতে—পার—ঐ শেয়ালশিকারীদের?'

নোলটন হি হি করে উত্তর দিলেন, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'তাহলে উচ্ছন্নে গিয়ে দেখ একবার। রীড, ওর সঙ্গে যাও। একটা রেজিমেন্ট সঙ্গে নাও—না, না, ইয়াংকিদের নয়, উইডনের ভার্জিনিয়ার লোকেদের নাও আর মেজর লাইচকে। মনে রেখ, ওদের পেছনে। শেয়াল-শিকার নয়, ভালুক-ধরা ফাঁদ!'

রীড আর শুনবার জন্যে অপেক্ষা না করে, ভার্জিনিয়ানদের সংগ্রহ করবার জন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন পেছনে ব্যূহের দিকে আর নোলটন তাঁর দলের আহতদের বাছাই করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে শিকারীর ডাকটা বেঁকে হাডসন নদীর দিকে নেমে গিয়েছে।

শেয়ালশিকারী মিফলিনের দিকে ফিরে, যেদিকে গিরিসঙ্কটটির মুখ নদীর দিকে খোলা সেই দিকটা দেখিয়ে সংক্ষেপে বললেন, 'ঐ দিকে আমি মুখোমুখি আক্রমণ চাই।'

বোকার মত মিফলিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুখোমুখি আক্রমণ?'

'সেনাপতি, তোমার মাথায় ঢোকাবার জন্যে আমাকে কি একটা কথা বিশ বার বলতে হবে? ওদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে চাই। যদি বন্দুক ধরে ওদের গুলি করে উড়িয়ে দিতে পারে তাহলে তোমার শ-কয়েক নোংরা ইয়াংকি আমার চাই। ওরা দক্ষিণের চড়াই দিয়ে উঠবে, অন্তত আধ ঘণ্টা

খানেক। তারপর তারা পালাতে পারে।'

মিফলিন মাথা নেড়ে সেইদিকে ছুটলেন; রাগ আর আনন্দে মন তাঁর উদ্বেল।

মর্নিংসাইড পাহাড়ের পূর্বদিকের চড়াই বরফে ঢাকা এবড়ো-খেবড়ো। নোলটন তাঁর কনেকটিকাটের সৈনিকদের আর লাইচ তাঁর ভার্জিনিয়ানদের নিয়ে উঠতে লাগলেন, নিঃশব্দে, ক্ষিপ্রগতিতে। সৈনিকদের ডান দিকের কাঁধে ঝোলানো পট্টি থাকায় সেই দিকেই ভারী বন্দুকগুলো ঝোলানো অথবা ছেঁড়া শার্টের ফুটোয় মধ্যে দিয়ে ঢোকানো। চূড়াটার ওপরে উঠবার জন্যে তারা এতই আগ্রহী যে সেই সময়টুকুর জন্যে ভার্জিনিয়ান আর ইয়াংকিরা তাদের পরস্পরের প্রতি গভীর ঘৃণা-বিদ্বেষ ভুলে গেল। ঐ ব্যঙ্গাত্মক বিউগ্‌লের বাজনা শেয়ালশিকারীর মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে সেইটি বুঝেই নোলটন বেশ খুশী; কিন্তু এটুকুও তিনি বুঝলেন যে ভার্জিনিয়ানেরা কি ভীষণ কষ্টের মধ্যে এগিয়েছে। যারা পরস্পরের কাছে অপরিচিত, পরস্পরকে মেরেছে, পরস্পরের রক্তপাত করেছে, তাদের সঙ্গে স্বল্প কথাবার্তায় তাদের কাছাকাছিও তিনি এসেছিলেন।

নোলটনের প্রকৃতি গভীরও নয়, জটিলও নয়। তিনি বুদ্ধিজীবীও নন, বিপ্লবীও নন কিন্তু কর্মের উন্মাদনা ভালোবাসতেন আর ক্যাম্পজীবনের সঙ্গীসাথী লাভ। এতদিন ধরে যে যুদ্ধ বাধব বাধব হয়েছিল তাতে তাঁর যোগ দেবার খুবই ইচ্ছে; তাই আজ তিনি এখানে। আর মনে কিছু তৃপ্তিও পাচ্ছেন এই ভেবে যে তিনি ঠিক দিকেই যোগ দিয়েছেন। খুঁটিনাটি তিনি ভেবে দেখেননি তবে যারা আবেগকে যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাদের কথা মেনেই তাঁর শান্তি। তিনি স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই করছেন কেন না তাঁর কাছে স্বাধীনতা সোজা, সরল জিনিস। এটা হল হাত-পা বাঁধা অবস্থায় হাজতে থাকার বিপরীত।

কাঁপা রাস্তার দক্ষিণ দিকে বেশীদূর তিনি আর রীড তখনও পৌছাননি; ব্রিটিশদের পেছনে এসে পড়ার বদলে, তাঁরা চূড়ায় উঠে, ভুল করে, একেবারে সবুজ-কুর্তা একদল জার্মানের পাশে এসে পড়লেন। ওরা সন্তর্পণে বুঝে বুঝে আমেরিকান ব্যূহের দিকে এগোচ্ছিল। মেজর লাইচ যেমন দুটি হাতের তালু একটা পাথরের ওপর রেখে সাবধানে নিজেকে মাটির সমান্তরাল করেছেন অমনি একজন জার্মান অফিসারের চোখ পড়েছে চূড়ার ধারটাতে।

জার্মানটি চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে, এই তো?'

ফাঁদে-পড়া ষাঁড়ের মত লাইচ গর্জন করে ওঠেন: নোলটন ডিগবাজি খেয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ান। পেছনে আসে ভার্জিনিয়া আর কনেটিকাটের লোকেরা। চূড়ায় পৌঁছবার জন্যে উদ্‌ভ্রান্ত তাড়াহুড়োতে তাদের হাত পা মুখ পাথরে কেটে ছড়ে যায়।

জার্মান সৈনিকদের শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে 'ইয়ংকি' 'ইয়ংকি' ধ্বনি। একজন অফিসার ঘোড়ার গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে ছুটিয়ে চিৎকার করে ওঠে: 'থেমে যাও!'

ঠিক সুতোয় ঝুলোনো পুতুলের মত জার্মানেরা থেমে যায়, অস্ত্র লক্ষ্য করে বিস্তৃত ব্যূহে ঘুরে দাঁড়িয়ে যায়। তখনও গর্জন করতে করতে লাইচ সেই জার্মান অফিসারটিকে পিস্তল তুলে তাক করলেন যে তাঁকে প্রথম দেখেছিল এবং ঠিক বুকেই গুলিটি করলেন।

ঘোড়সওয়ারটি চিৎকার করে উঠল, 'নামিয়ে ধর।'

জোর বাতাসে গমের শীষের মত বন্দুকগুলোর মাথা নেমে এল।

'ছোঁড় গুলি!'

আমেরিকানদের মুখের ওপর বন্দুকের গুলি গিয়ে আছড়ে পড়ে। মেজর লাইচের গর্জন থেমে গেল তিনটি বুলেটে—দুটি পেটে, একটি দাবনায়। মুখ থুবড়ে পড়ে, গোঙাতে গোঙাতে রক্তপাতেই তাঁর জীবনান্ত হল। লম্বা লম্বা হাত নেড়ে, নোলটন চিৎকার করে তাঁর লোকেদের চূড়াটা পার হয়ে আসতে বলতে গিয়ে কপালে বেঁধালেন একটি বুলেট। তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন, রীড ধরলেন তাঁকে।

আবার হুকুম হল, 'বন্দুক নামিয়ে!'

তবু আমেরিকানেরা পাহাড়ের থাক থেকে যুদ্ধ করে চলেছে।

'গুলি!'

বাতুলের মত একগুঁয়েমিতে সেই গুলির ঝড়ের সামনাসামনি হওয়া যায় না। আমেরিকানেরা পাহাড়ের থাক আঁকড়ে রইল কিন্তু চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে পারল না। পাথরের ওপর রেখেই তারা বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করল এবং তারপর ছাগলের মত কোনমতে পাহাড় আঁকড়ে ধরে, বন্দুকে ফের গুলি ভরার চেষ্টা করল। কিন্তু তা কি আর করা সম্ভব!

নোলটনের গুরুভার বহন করে রীড পেছনে হটে এলেন। কনেকটিকাট সন্ধানীদের দুজনের সাহায্যে এনে শোয়ালেন পাহাড়ের একটি ঢাকা থাকের ওপর। এই মারামারির গণ্ডগোলের মাঝে, নোলটন কি বলছেন শুনবার জন্যে, রীডকে খুব নীচু হতে হয়েছিল। শেয়ালশিকারীর সম্পর্কে কিছু

বলছিলেন ঐ পাহাড়ের থাকের দিকে নির্দেশ করে। বলছিলেন : 'বলবেন যে, আহত হয়ে পড়লাম বলে, আমাকে এইখানেই থামতে হল। বলবেন আমি ভয় পাইনি—'

মিফলিন লেফটেনান্ট কর্নেল ক্রেরীকে হুকুম দিলেন শ-দুই ম্যাসাচুসেটস ইয়াংকি নিয়ে শত্রুর মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে। লোকগুলোকে গোনা হলে তাদের অসংবদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে যেতে যেতে বললেন, 'যুদ্ধ তোমাদের করতে হবে না। সে করবার তাগদ তোমাদের নেই। তবে ঘন্টাখানেকের জন্যে, উপত্যকার ওপারে, ঐ পাহাড়টার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আর ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে বলছি যে পালাতে যাবে তাকেই গুলি করব।'

গোমরা মুখে তাঁর দিকে তারা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, কোন উত্তর দেয় না। বাড়িতে তৈরি শার্টগুলো বাতাসে পতপত করে উড়তে থাকে।

'পা চালাও!' বলেন মিফলিন।

উপত্যকার একেবারে নীচে দিয়ে তারা চলতে শুরু করে, প্রথমে হাঁটতে থাকে, তারপর দৌড়তে আরম্ভ করে। শেয়ালশিকারী দ্রুতবেগে মিফলিনের কাছে এসে জানতে চান ওরা দৌড়চ্ছে কেন?

অস্বস্তিতে মিফলিন বলেন, 'কি জানি, স্যর।'

ওরা বনের মধ্যে ঢুকছিল এবং চূড়ায় না পৌছনো পর্যন্ত মিফলিন ওদের শার্টগুলো দেখতে পেলেন, সবুজের ওপর সাদা ছোপের মত। ওরা চূড়া পার এবং পরমুহূর্তেই শোনা গেল এক ঝাঁক গুলির আওয়াজ।

মিফলিন বললেন, 'ঐ শুনুন, ওদের মনোযোগ ফিরেছে।'

ওদের ফিরে আসার জন্যে দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি অপেক্ষা করতে লাগলেন, অপেক্ষা করতে লাগলেন উৎরাই ভেঙে হুড়হুড় করে ওদের নেমে আসবার জন্যে, যত তাড়াতাড়ি পা দুখানাকে ছোটাতে পারে তত তাড়াতাড়ি। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, সারি সারি পরিখায় হাজার হাজার নোংরা, মার-খাওয়া ইয়াংকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুকের আওয়াজ শুনছে।

গুলি চলতে থাকে। মিফলিন অবিশ্বাসভরে, ধীরে ধীরে বললেন, 'আরে কি ব্যাপার, ওরা রুখেছে।'

যে উৎরাই পলায়মান মানুষে ভর্তি হয়ে যাবার কথা সেই উৎরাই-এর পাশে ভার্জিনিয়ান একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু সে উৎরাই অদ্ভুত শূন্য।

'ওরা রুখেছে,' আবার বললেন মিফলিন।

'উচ্ছন্নে যাও, মিফলিন! আমার কি চোখ কান নেই! এখান থেকে সরে পড়। একটা রেজিমেন্ট সঙ্গে নিয়ে ওদের একটু জোর দাও।'

নিজে চড়াই ধরে ওপরে উঠে গেলেন। মিফলিন তাঁকে ডাকছিলেন ফিরে আসবার জন্যে, একা না যাবার জন্যে, কিন্তু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন গাছের সারির মধ্যে দিয়ে একেবারে পাহাড় পর্যন্ত। দেখলেন অতি অল্প এক দল নাছোড়বান্দা নিউ ইংল্যাণ্ডার একটা পাথরে দেওয়ালের পেছনে গুঁড়ি মেরে রয়েছে। একটা ড্রাগুনের আক্রমণ তারা ইতিমধ্যেই প্রতিহত করেছে এবং এখন নীরবে সম্মুখীন হয়েছে একদল হালকা অস্ত্রধারী পদাতিক বাহিনীর। বাহিনীটি নেমে আসছে তাদের ওপর। প্রায় শ চারেক গজ দূরে এখনও।

ঠিক তাদের পেছনেই তিনি ঘোড়া থামালেন। এবং ইয়াংকিদের দিকে এমন করে তাকিয়ে রইলেন যেন তারা অন্য জগতের লোক। দেওয়ালটার পেছনে মাঠে দুই ড্রাগুন সৈনিক ঘন ঘাসের মধ্যে শুয়ে, বাতাসে তখনও বারুদের টোকো গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাঁর দিকে ইয়াংকিরা ফিরে তাকালো বটে কিন্তু মোটে কয়েকজনই অভিবাদন করল। সর্বাধিনায়ককে দেখে তারা খুশী হল না. এবং তিনিও কিছু বললেন না, আদেশও দিলেন না।

হালকা পদাতিকেরা তাদের দলের পতাকা ওড়াতে ওড়াতে এবং দ্রুত তালে জয়ঢাক বাজাতে বাজাতে নিকটতর হয়ে, যখন মাত্র শখানেক গজের মধ্যে এসে গিয়েছে তখনও কোন গুলি ছুটল না। মিফলিন সেই সময়েই তাড়াহুড়ো করে তাঁর রেজিমেন্টকে নিয়ে এসে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গ্রীন, দীর্ঘ অসুস্থতা থেকে উঠে এখনও তাঁর মুখ মড়ার মতোই ফ্যাকাশে, চোখ দুটো কিন্তু জ্বলছে।

তিনি বললেন, 'আরও পাঁচশো সৈনিক নিয়ে পাট্‌নাম আসছেন স্যর।'

আরও পেছনে একটা হুড়মুড় শব্দে দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন নক্স এবং তরুণ হ্যামিলটন দুটি ঘোড়ায় চেপে একটি হালকা কামান টানিয়ে নিয়ে আসছেন। ইয়াংকিরা সামনেই সাহায্যকারী সৈনিকের দল ছুটে আসছে দেখে, পাথরের দেওয়াল টপকে, ব্রিটিশ পদাতিকদের আক্রমণ করল। কোন শৃঙ্খলা নেই, কোন বূ্যহ রচনা নেই, কোন পদ্ধতি নেই। শয়ে শয়ে নিউ ইংল্যাণ্ডার চিৎকার করতে করতে ঝাঁকে ঝাঁকে গিয়ে পড়ছে ব্রিটিশদের ওপরে, গুলি করছে, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারছে, বেয়নেট আটকাচ্ছে খালি হাতে, হাসছে, কাঁদছে, মরছে—তবু ব্রিটিশদের হটিয়ে দিচ্ছে।

ভার্জিনিয়ান যুদ্ধের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, তাদের মতনই চিৎকার করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন, হাসতে লাগলেন। তিনি জানতেন যে নিয়মানুসারে যুদ্ধ এটা নয় এবং তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর শুধু এটাই ভাল লাগছে যে স্বেচ্ছায় লোকগুলো যুদ্ধ করছে। তিনি মিফলিনের প্রতি গর্জন করে পাট্‌নামকে বলতে বললেন তাঁর পাঁচশো সৈনিককে আরও তাড়াতাড়ি এনে উপস্থিত করতে। একজন অশ্বারোহী পার্শ্বচরকে নক্সের কাছে পাঠালেন জানতে যে নক্স তাঁর কামানগুলোকে শত্রুদের পাশে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে গোলাবৃষ্টি করতে পারেন কি না। এবং মুহূর্ত পরেই আর একজনকে পাঠালেন মিফলিনের কাছে শুধু পাট্‌নামের পাঁচশোকে নিয়ে আসবার জন্যে নয়, দীর্ঘ যুদ্ধের ক্ষেত্রে যে আরও পাঁচশো ছড়িয়ে আছে, তাদেরও নিয়ে আসার জন্যে। এতে হয়তো উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত ম্যাসাচুসেটসের লোকগুলো অবরোধ থেকে বাঁচবে।

ইতিমধ্যে যে একদল ব্রিটিশ পদাতিক, যারা কোন প্রতিরোধই আশা করেনি, শুধু আমেরিকানদের ব্যূহটা খুঁজে বার করতে চেয়েছিল, এখন দেখতে পেল শত্রুর সংখ্যা বহুগুণে বেশী। এবং যাদের মনে হয়েছিল চিৎকার করা পাগলের দল তাদের সামনে থেকে বিপর্যস্ত হয়ে তারা হটে যেতে লাগল। হটছে তো হটছেই এবং এই প্রথম ব্রিটিশ বাহিনীকে সম্মুখযুদ্ধে হটে যেতে দেখে ইয়াংকিরা একেবারে বেসামাল হয়ে পড়ল। তারা ভুলে গেল বন্দুক তৈরী হয়েছিল ছোঁড়বার জন্যে; তারা বন্দুক ব্যবহার করছিল লাঠির মতো, হাত পা চালাচ্ছিল, পাথর ছুঁড়ছিল, মাথা দিয়ে, কাঁধ দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল—লাথি মারছিল, খামচাখামচিও করছিল। ব্রিটিশ সৈনিকেরা তাদের ব্যূহ সুশৃঙ্খল রাখলেও, বন্দুকে গুলি ভরতে না পেরে, বেয়নেটের চকচকে ফলাগুলো এগিয়েই দিচ্ছিল।

ইয়াংকিদের সামনে তারা প্রায় মাইলখানেক হটে গিয়েছে এমন সময় ব্রিটিশ ব্যূহের পাশ দিয়ে গিয়ে পেছন দিয়ে আক্রমণ করবার রীডের সর্বনাশা চেষ্টার দফারফা করে জার্মানীরা পশ্চিম দিক দিয়ে ঘুরে এসে আমেরিকান সৈনিকদের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করল। ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্য পাশেও ছট্‌রা গুলির অবিশ্রাম বর্ষণ শুরু হল। দুই দল লালকুর্তা, গোলাগুলির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে হালকা পদাতিক বাহিনীকে সাহায্য করতে এল।

ইয়াংকিরা হাল ছেড়ে দিল। তাদের সমগ্র বাহিনী ছিন্নভিন্ন, দলিত, মথিত; কিন্তু তারা পালালো না। তারা হেঁটেই পিছু হটতে লাগল, আঘাত

করতে করতে, বন্দুকের কুঁদো চালাতে চালাতে, শাপমন্যি করতে করতে, আহতদের বহন করে নিয়ে। মাটির প্রতিটি ইঞ্চি আঁকড়ে ধরে চলতে চলতে তারা আবার ফাঁপা পথের মুখে এসে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশরা উতরাই ভেঙে পিছু নিচ্ছে না দেখে তারা ব্যঙ্গে চিৎকার করে উঠল। ব্রিটিশেরা আমেরিকান ব্যূহকে সোজাসুজি আক্রমণ করার সুযোগ তো নিল না।

তারা পরাজিত হল কিন্তু পালিয়ে গেল না; বন্দুক তারা ছাড়েনি, শত্রুর মুখোমুখি হয়েই ছিল। যে শেয়ালশিকারী ঘোড়ার ওপরে ডাণ্ডার মতো সোজা হয়ে বসেছিলেন তাঁরা তাঁরই মতো গর্বিত। তাঁর গলা আবেগে এমন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, যে ছেলেগুলো তাঁকে ঘিরে হিহি করে হাসছিল তাদের তিনি একটি কথাও বলতে পারলেন না।

তৃতীয় পর্ব ঃ ওয়েস্টচেস্টার

স্বাধীনতা ধ্বনিত হোক

নিউ ইয়র্কের নাগরিকদের যেটুকু বা দরদ ছিল বিপ্লবীদের জন্যে ব্রিটিশেরা শহর দখল করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেটুকু তারা ঝেড়ে ফেলে দিল। একজন নবাগতের চোখে পড়ত যে খারবান নাগরিকদের মধ্যে একটা যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে তীব্র—কারা বিপ্লবীদের বেশী ঘৃণা করত তাই নিয়ে। যারা বেশী ধনী নাগরিক তাদের মধ্যে অবশ্য ব্রিটিশ রেজিমেন্টের বড় বড় অফিসারদের কাছে খানাপিনার নিমন্ত্রণ পাঠাবার প্রাণপণ হিড়িক পড়ে গিয়েছে। একজন জেনারেলকে ধরতে পারা বাঞ্ছিত তো বটেই, প্রকাণ্ড সম্মানের কথা। একজন কর্নেল কি মেজরকে ধরাও যথেষ্ট। তরুণ কোন ক্যাপ্টেন বা তার নীচের কাউকে ধরাটাতেও তেমন নাক সিঁটকানোর কিছু নেই। নিউ ইয়র্কের ভালো বাসিন্দাদের মনোভাবে কিন্তু কোন ভণ্ডামি নেই; প্রথম থেকেই তারা ঠিক জানত রুটির কোন্ দিকটায় মাখন লাগানো আছে।

এ তো গেল অভিজাত এবং ধনবানদের কথা; মধ্যবিত্তেরা এই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যে এইবার তারা দোকান খুলতে পারবে, জানলার খড়খড়ি নামাতে পারবে। তাদের কাছে কাজই হল স্থায়িত্ব, প্রতিষ্ঠা। এই পরিস্থিতির মানে হল তারা আবার আগের মতো কাজকর্ম শুরু করতে

পারবে, শুধু পাওনা পাবার প্রতিশ্রুতি আর কাগজের বাজে টাকার ভরসায় নয়, সাচ্চা, নিরেট, জ্বলজ্বলে সোনার টাকা পাবে। হাজার হাজার ব্রিটিশ সৈনিক ও নাবিকদের তারা পাবে দামী খরিদ্দার হিসেবে; এবং তার মানে হল নিউ ইয়র্ক বন্দরে অন্তত বহির্বাণিজ্য শুরু হবে ব্রিটিশদের বন্দুকের রক্ষণাবেক্ষণে।

সত্যিই, ব্রিটিশেরা শহর দখল করায় আনন্দ আর স্বস্তি ভিন্ন আর কিছু বিশেষ ছিল না কারও। বাজে লোকে নিউ ইয়র্ক যেন উপচে পড়ছিল। চারদিকের গ্রামাঞ্চল থেকে এরা এসেছিল। পুরুষগুলো জীবনে কখনও একদিন খেটে খায়নি। এরা বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পরে বুঝল যে ইয়াংকিদের যুদ্ধ করতে হতে পারে। আর এসেছিল সেই সব মেয়েছেলেরা যারা প্রাচীনতম ব্যবসা করে। এই শেষেরগুলোর সংখ্যায় আশ্চর্য লাগে। আক্ষরিক অর্থে হাজার হাজার—তের বছরের খুকী থেকে ফোকলা বুড়ী পর্যন্ত, দেখতে সুন্দর থেকে আরম্ভ করে বীভৎস পর্যন্ত। কোথা থেকে যে এসেছে তা কেউ জানে না। বিশ্বাস করা যায় না যে শহরের স্বল্পসংখ্যক অন্তেবাসীর মধ্যে এত সব নষ্ট মেয়েমানুষ ছিল। ইয়াংকিরা যখন শহর দখল করেছিল তখন এই মেয়েদের দেখা গিয়েছিল নির্লজ্জ বিশৃঙ্খলায়, ঐ নিউ ইংল্যাণ্ডবাসীদের মতোই। কিন্তু এখন ব্রিটিশেরা আসায় তারা আশ্চর্যরকম সেজেগুজে ফুটে উঠেছে। আঁকাবাঁকা সরু পথের ওপর দিয়ে তারা চলেছে গর্বভরে—নিজেদের রেশমী পোশাক আর পালকের সজ্জা দেখাতে দেখাতে আর প্রতিটি লালকুর্তা বা জার্মান বা হাইল্যাণ্ডারের কানে কানে দাম বলতে বলতে। নিউ ইয়র্কের ভালো মানুষেরা এদের সহ্য করে চলে, এমন কি এদের উপস্থিতি ওদের ভালোই লাগে। কেন না ভালো মানুষের মেয়েদের ওপর অত্যাচারের ভয়টা কেটে যায় এরা থাকলে। নাগরিকেরা বলে, 'সব জায়গাতেই যখন আপেল ফলছে তখন আর নিষিদ্ধ ফল পাড়তে যাবে কে?'

ব্রিটিশদের অবতরণের পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে শহরের রূপ যেন ছুটির দিনের। খানাপিনা, নাচ, আরও খানাপিনা, নিমন্ত্রণ, নাচ এবং আপ্যায়ন। যে সব মেয়েরা দেহ বিক্রী করত শুধু তারাই নয়, তথাকথিত সৎ নাগরিকদের মধ্যেও পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। খারবান লোকেরা কানাডা বা ইংলণ্ডে চলে গিয়েছে, অনেকেই পরিবার রেখে গিয়েছে। এক আমেরিকান আর একজন আমেরিকানকে যতখানি ঘৃণা করতে পারে ততখানি ঘৃণা নিয়েই, তরুণ বয়সীরা, বিপ্লবীদের ভুঁইফোড় বলে ঘৃণা করে, যোগ দিয়েছে

গিয়ে ওয়েস্টচেস্টারে এক রবার্ট রোজার্সের সৈন্যদলে। এই রবার্ট রোজার্স প্রাণহীন, হিসেবী, অদ্ভুত নিষ্ঠুর এক ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। কয়েক বছর আগেই সে তার রোজার্স রেঞ্জার্সদের নিয়ে রক্তপাত ও পাশবিকতার জন্যে বেশ নাম করেছে।

মনুষ্যজাতিটাকে একদম ঘৃণা করে রবার্ট রোজার্স নাম করে নিয়েছে। কিসের বা কার জোর কত এইটুকুই তার কাছে শুধু বিবেচ্য এবং জোর মানে তার কাছে শুধু গায়ের জোর, বুদ্ধির নয়। কাউকেই না ভালোবেসে, এমন কি নিজেকেও না ভালোবেসে, যে সব বিশৃঙ্খল জনসমষ্টি তাদের আবাসকে নূতনভাবে গড়তে চায় তাদের সে ঘৃণা করে। ওর জীবন একটা জ্বলন্ত গোলার গতিপথের মতো—পেছনে ফেলে রেখে যায় মৃত্যু আর যাতনা। বহু বছর ধরে পরাজয় আর দুর্ভাগ্য সয়ে সয়ে আজ সে নেতা হতে চলেছে নিউ ইয়র্কের আর ওয়েস্টচেস্টারের টোরিদের। এখনও পর্যন্ত অবশ্য রোজার্স একটি উপদ্রব মাত্র, আমেরিকান বাহিনীর আশেপাশেই ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে—সান্ত্রীদের কাটছে, পলাতকদের ধরে ধরে মজা করে ফাঁসি দিচ্ছে। উত্তর আফ্রিকার করসেয়ারদের কাছ থেকে এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে সে যে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, সেই অভিজ্ঞতাকেই আরও চেঁচেছুলে সূক্ষ্ম করে প্রয়োগ করছে এই ফাঁসি দেওয়ার শিল্পে।

নিউ ইয়র্কের লোকেরা দু দলকেই পথ ছেড়ে দিয়েছিল। ব্যবসায়ী এবং শ্রমিকদের যুবক ছেলেরা বাপেদের মন ভেঙে, মায়েদের বুক ভেঙে, একটা বাজে, নির্বোধ গুপ্তদলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সে দলের নাম—স্বাধীনতার সন্তান। কথা ছেড়ে যখন কাজের সময় এল তখন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন নামে এক ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ছোকরার দলে এরা অনেকেই গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগ দিল। এখন আর তারাও নেই। এদের দল আর রোজার্সের দলের জায়গায় এখন এল ব্রিটিশ বাহিনী—সঙ্গে এসে ঢুকল একদল বাজে, অশিক্ষিত ভবঘুরের দল। নিউ ইয়র্কের যে অল্পসংখ্যক কয়েকজন ব্রিটিশদের স্বাগত জানায়নি তারা হল ইহুদিরা। তাদের সমস্ত আশা এবং স্বপ্ন ঐ ছন্নছাড়া ইয়াংকিদের সঙ্গেই তিরোহিত হয়েছে। আপনা থেকেই তারা তাদের ভাগ্য যুক্ত করেছিল বিপ্লবের সঙ্গে। অস্ত্র ধারণে সক্ষম প্রতিটি ইহুদি বিপ্লবী বাহিনীতে যোগ দিয়েছে ; আবেগের তাড়নায় তাদের ভাষা উগ্র। সেতু পার হয়েই তারা সেটি উড়িয়ে দেয়, পেছনে ফিরে আসার পথ রাখে না। ওদের সিনাগগগুলো আহতে ভর্তি, আর তাদের বাড়ির বাইরে ঘরে চলে পরিকল্পনা। একটা তাসেই হারজিৎ এই মনে করে যে জুয়াড়ীরা খেলে

সেই মনেই ইহুদিরা তাদের সব টাকা দিয়ে দিয়েছে। এদের তরুণেরা চলে গেল ইয়াংকিদের সঙ্গে, শুধু পড়ে রইল তারাই মাটির তলার গুদামঘরে যারা বিষাক্ত ক্ষতে পড়ে গোঙাচ্ছে।

এ পরিস্থিতি তাদের পক্ষে নতুন নয়। ইতিহাসের ধূলিধূসরিত কমে কমে দীর্ঘকাল ধরে এই পরিস্থিতি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দরজা জানলা তালা দিয়ে এবং খিল দিয়ে বন্ধ করে মেয়েরা বসে নিঃশব্দে কাঁদছে। নিউ ইয়র্কে পরাজিত এবং অপমানিতদের জন্যে একমাত্র এরাই চোখের জল ফেলছে। বুড়োরা সিনাগগে জড়ো হয়ে এই প্রার্থনাই করছে যে নির্বাসিতদের এই শেষ পশ্চাদপসরণের পরেও যেন সেই 'প্রতিশ্রুত আবাসভূমির' কিছু আশা থাকে। কেবল হেম স্যালোমন নামে একজন ক্ষয়রোগগ্রস্ত অভিবাসী পোলিশ-ইহুদি অস্ত্রধারণে একেবারেই অক্ষম বলে পেছনে পড়ে রইলেন। নিচের গুদামঘরে বসে যে বেপরোয়া দলটি পরিকল্পনা ভাঁজছিল তাদের দাঁত খিঁচিয়ে কথা বলতে গেলে কাশির সঙ্গে তার রক্ত উঠল। ঈশ্বরের নামে শপথ করে সে বললে যে এই মোটে শুরু হয়েছে।

এই রকম নিউ ইয়র্ক শহরে, ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের বিশে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যার প্রথম দিকে একজন যুবক এ রাস্তায় সে রাস্তায় লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার বাড়ির তৈরী বাদামী রঙের পোশাকের কনুই, হাঁটু এবং পেছনে তাপ্পি-মারা ; তার পুরনো গোল টুপি, প্রান্ত চ্যাপ্টা। উত্তরের দেশের লোকের এই রকম টুপিই এখন বেশি পছন্দ। ছেলেটির বয়েস খুব কম, মোটে কুড়ি স্বচ্ছ নীল চোখ আর লালচে গালে তাকে আরও তরুণ দেখাচ্ছে। দেশ-গাঁয়ের লোকেরা যেমন একটু দ্বিধায় হেলেদুলে চলে অপরিচিত শহরের রাস্তায়, এরও হাঁটার ধরন তাই। সমস্ত ভাবটা হচ্ছে একেবারে নির্দোষ দর্শকের।

লালকুর্তা দেখলেই জবুথবু হয়ে একটু দাঁত বের করে হাসছে। একটা মরচে-ধরা ইয়াংকি ভোঁতা বেয়নেট রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে কৌতূহলী আঙুলে তার ধার পরীক্ষা করে। তার পা চলছে সবদিকে আবার কোনদিকেই নয়—ইস্ট নদীর ধার দিয়ে হাডসন নদীর পাড়ে জেলেদের ছাউনিগুলো পর্যন্ত—শহরের ওপরের দিকে ডাচ হাওয়াকলগুলো থেকে বোলিং গ্রীনের মসৃণ তৃণভূমি পর্যন্ত।

বোলিং গ্রীনে ব্রিটিশেরা ষোল পাউণ্ডের কামান বসিয়েছে। এইগুলোতে ছেলেটির একেবারে ছেলেমানুষী কৌতূহল। ধার ঘেঁষে ঘেঁষে সেগুলোর কাছে গিয়ে সে কামানগুলোর ঠাণ্ডা উপরিতল স্পর্শ করে ফেলল।

'এই, এদিকে, ওসব চলবে না,' সান্ত্রী বলল।

ছেলেটি মন্তব্য করল, 'চমৎকার বড় বড় কামান তো!'

'বেশ। তা আমি ওর চেয়ে অনেক বড় বড় দেখেছি। এখন, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও।'

পরে তাকে পায়চারি করতে দেখা গেল একটা এলোমেলো গুদামঘরের কাছে। এটাকে ব্রিটিশেরা গোলাবারুদের গুদামঘরে পরিবর্তিত করেছে। সেখান থেকে বেশ গালমন্দ দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিল।

শহরের ওপরের দিকে, ওয়ালস্ট্রীটের কয়েকটা অঞ্চলের উত্তরে, একজন চলমান পাহারাদার তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে—সে কে এবং অন্ধকার হয়ে যাবার পর নিউ ইয়র্কের পথে পথে তার কি প্রয়োজন।

সার্জেন্টকে সে সোজাসুজি উত্তর দিলে, 'জার্সি থেকে আসছি; মেজর রোজার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।'

ঘাড় ঝাঁকিয়ে উত্তর দেয় ছেলেটি।

'শোন। রাস্তা থেকে সরে পড়ে নিজের কাজে মন দাও। না হলে ঐ যোগাযোগটা জেলেই হবে,' শাসিয়ে দিল তাকে সার্জেন্ট।

তারপর সে অন্ধকার গলিগুলোতেই রয়ে যায় আর সার্জেন্টের আলো আসছে দেখলেই খরগোসের মতো তেড়ে ছুট। গত তিনদিনে মোটে কয়েক ঘণ্টা ঘুমোনোর ফলে সে বড় ক্লান্ত কিন্তু হোটেল-ফোটেলে তার যেতে ইচ্ছে হল না। একটু সম্ভাবনা তো আছেই সেখানে তাকে চিনে ফেলবার। সন্ধ্যা যত পার হয়ে যায় তত তার ক্লান্তি বাড়ে; ভাবে এক ইহুদীর বাড়ি গিয়ে গৃহকর্তার দয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, চাইবে একটু আশ্রয় ও শয্যা। প্রথম যে বাড়িটি ঠিক করল সেটি খালি, একেবারে নিরানন্দ। দরজার সামনে লালকুর্তা সান্ত্রী। তখন তার মাথায় এল যে আর একটি খুঁজতে গেলে ভীমরুলের চাকে হাত দেওয়া হবে।

সেদিন সন্ধ্যায়, পথে, রাস্তার মেয়েরা তাকে বারে বারে থামিয়েছে, আর তাদের প্রত্যেককে সে একই উত্তর দিয়েছে, 'আমার টাকা নেই!' কিন্তু এইবারে একজন তাকে থামাতে এবং সে ঐ একই কথা বলাতে, তার বাহু আঁকড়ে ধরে মেয়েটি বললে, 'চলে যেও না।'

বাহুর ওপর সেই একটু চাপেই মনে হল সে যেন ফাঁদে-পড়া পশু: বুঝতে পারলে কত ভঙ্গুর তন্তুর ওপর তার স্নায়ুগুলো বাঁধা। জোর করে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার দিকে তাকাতেই দেখলে কৃষ্ণ-নয়না ছিপছিপে একটি মেয়ে, অতিপ্রসাধনে কোন রুচি নেই। পরনে ছেঁড়াখোঁড়া লেসের

ঘাগরা, মাথায় সবুজ টুপি—পালকটি এলোমেলো হয়ে কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে।

হিহি করে মেয়েটি হেসে বললে, 'ভয় কিসের?'

'কিছুরই না। আমার টাকা নেই।'

তার সুশ্রী, বালকের মতো মুখখানার দিকে তাকাতে তাকাতে তার এই স্পষ্ট ভাষণে মেয়েটি বললে, 'আমি তো টাকা চাইনি। জগতের দিকে আর এই ছেলেটির দিকেও সে চেয়ে থাকে ধৃষ্ট বেপরোয়াপনায়। কোমরে হাত রেখে, থুতনি উঁচু করে সে শুধোয়, 'ইয়াংকি? না?'

'না—'

'তাহলে ভয় কিসের। আমি একটা যাচ্ছেতাই গলদাচিংড়ি নই।' ছেলেটি হাঁটতে শুরু করে, মেয়েটি চলে তার পেছনে লাফিয়ে লাফিয়ে, আবার তার বাহু চেপে ধরে, বলে, 'কিসের ভয় তোমার? আমি জানি তুমি ইয়াংকি। এখানে যখন বাহিনী ছিল তখন তোমাকে আমি দেখেছি।'

ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে এমন নির্বাক হতাশায় মেয়েটির পাশে তাকায় সে যে মেয়েটি ভয়ে পেছিয়ে আসে। মেয়েটির কব্জিটি এমন শক্ত করে ধরে যে ব্যথায় মৃদু মৃদু আর্তনাদ করতে থাকে। মেয়েটি তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকাতেই তার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। ছেলেটি লক্ষ্য করে।

'আঃ, ছেড়ে দাও! পাহারা আসছে!'

চট করে তাকিয়ে আলোর ফুটকিটা দেখেই ছেলেটি চম্পট দেয়। সে শুনতে পায় মেয়েটিও তার পেছন পেছন ছুটছে। রাস্তাটার শেষে এসে দেখে পথ বন্ধ—আর একটা দোলায়মান আলো। দুইয়ের মাঝে ধরা পড়ে। অন্ধকার সরু গলির দুই দেওয়ালে তার দেহমন খায় ধাক্কা। দেহ ব্যাপারটা বুঝতে চায় তার পা দুখানা কেবল মাটি ভাঙে নৈরাশ্যে। হাতের ওপর মেয়েটির মুঠির চাপে সচেতন হয়ে ছেলেটি ওর পেছন পেছন এক ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ে—গর্তটা অন্ধকার নিরেট। ঢুকে পড়ে একটা দরজা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে। দরজা বন্ধ হলে একেবারে মেয়েটির পেছনেই সে দাঁড়িয়ে, কানে আসছে তার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস।

মেয়েটি ফিসফিস করে বলে, 'এই—তোমার গায়ে জোর আছে—আমার সমস্ত হাতখানা ব্যথা করছে যে।'

ফিকফিক করে হাসল সে অন্ধকারে—ভয়ে। তার উরু এবং বুকের ওপরে মেয়েটির উষ্ণ দেহের চাপ ছেলেটিকে উতলা করে তোলে। আর এখন যখন তাকে দেখতে পাচ্ছে না, শুধু উগ্র গন্ধ পাচ্ছে চুলে এবং জামা-কাপড়ে ঢালা

সুগন্ধের। তার আশ্রয়টুকু পেয়ে ছেলেটি এখন কৃতজ্ঞ বোধ করতে পারছে এবং যে প্রসাধন করা বেশ্যাটা তাকে রাস্তায় ডাক দিয়েছিল তাকে বাদ দিয়ে আর কিছুকে সে এখন ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছে।

'আমার কাছে চকমকি আছে। আলো চাই?' জিজ্ঞাসা করে মেয়েটি।

'না।'

উত্তরটা খুব দ্রুত এবং স্পষ্ট; অনুভব করে মেয়েটির দেহ কেমন শক্ত হয়ে ওঠে এবং তরুণ বয়সে এই প্রথম ছেলেটি বোঝে ব্যথার অদৃশ্য অবর্ণনীয় আবেগ। একটু দ্বিধায় পড়ে। আবার ফিরে আসে মনে অহমিকা এবং তার বংশমর্যাদা। মনে পড়ে মেয়েটা কি। মনে পড়ে গির্জাতে সাদা একটা বোর্ডে লেখা উপদেশে এই নষ্ট মেয়েদের কি স্পষ্ট সরল বর্ণনা আছে—পেছনে শয়তান আর সামনে নরক। সে পুনরুক্তি করে, 'আমার কাছে টাকাকড়ি কিছু নেই।' মেয়েটির মুখ দেখতে পাচ্ছে না বলে তার মনে আনন্দ হয়।

ছেলেটির হাত ধরে ঘরের ওদিকে নিয়ে গিয়ে মেয়েটি তাকে বসতে বলে। ছোবড়ায় ভরা শক্ত তাকিয়াটা মেয়েটির ভারে হুসহুস শব্দ করে। ও কিন্তু ছেলেটির কাছ থেকে দূরেই বসে। ছেলেটি অস্বস্তিতে শক্ত হয়ে বসে থাকে, পিঠ সোজা করে, হাতে হাত এঁটে ধরে। কিন্তু ক্লান্তি ফিরে আসে। বিছানাটা আছে দেখেই শুতে ইচ্ছা করে তার।

'তোমার নাম কি?' শুধোয় মেয়েটি।

'ন্যাথান হেল।'

'তুমি বিপ্লবী না কি?'

'হ্যাঁ।' লুকিয়ে রাখবার আর প্রয়োজন কিসের। কোথায় যেন তার ইয়াংকি ঢাকনাখানা ফেটে গেল।

'বাহিনী থেকে পালাচ্ছ?'

'না।'

মেয়েটি করুণস্বরে অভিযোগ করে, 'আমি ঐ গলদাচিংড়িগুলোর হাতে তোমায় তুলে দিতে পারতাম।' মুহূর্তের জন্যে অন্ধকারের মধ্যে তার গলাটা শোনাল একটা ছোট্ট মেয়ের মতো: 'তোমরা ইয়াংকিরা কেবল টাকা বোঝ। আমাকে কেবল শোনাচ্ছ তোমার কাছে টাকা নেই। ওসব আমি ভাবি না।'

'তুমি যে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে চাই।' ভেবে ভেবে ঠিকঠাক কথাগুলো বললে ছেলেটি। তার মনে

হল সে মস্ত, সবল—তার মূল্য আছে—এই একুশ বছরের জীবনে সে মানুষ হিসেবে নিজেকে এত বেশি করে আর কোনদিন বোঝেনি। কিন্তু মেয়েটি কোন উত্তর দিল না। একটু পরেই ছেলেটি বোঝে মেয়েটি কাঁদছে, অন্ধকারে নিঃসঙ্গ একটা বেড়ালের ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দের মতো। কিছুক্ষণ ছেলেটি অস্বস্তিতে বসে থাকল ; তারপর ওকে হাতড়াতে লাগল এখানে সেখানে—প্রথমে একখানি উষ্ণ বাহু, তারপর কোমল বুকে হাত পড়ল। উত্তেজিত ক্লান্ত হয়ে সে পেছিয়ে এল, পাপের ইচ্ছার সঙ্গে নিঃশব্দ দ্বন্দ্ব করতে লাগল ; জোর করে কথা বলতে হল তাকে। তার নাম জিজ্ঞাসা করল বিশুষ্ক ঠোঁট নেড়ে।

'হেলেন।'

'শোন, কেঁদ না।'

'আমি কাঁদছি না। যদি চাও তো ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকতে পার।'

অন্ধকারে তার কোন কাজটিই মেয়েটি দেখতে পাচ্ছে না এ কথা ভুলে গিয়ে সে মাথা নেড়ে চুপ করে বসে থাকে, ঢোলে। শেষে পায় তার হাতের স্পর্শ জামার আস্তিনে।

'কত বয়েস তোমার ?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'একুশ।'

মেয়েটি বললে, 'আমার আঠার। তুমি বিয়ে করেছ ?'

'না।'

সরল ভাবেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, 'একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার ভাব-সাব আছে ?'

আবার অন্ধকারে মেয়েটি দেখতে পায় না ওর মুখের ওপরে প্রতিক্রিয়া। ওর কাছে মেয়েটি ঘেঁষে বসতে যেতে তাকিয়াটা খসখস করে ওঠে। ওর আঙুলগুলো ছেলেটির ঘরে তৈরি জামার ওপর দিয়ে ছেলেটির দেহের স্পর্শ পেতে চায় ওর বাহুতে।

'কোথায় বাড়ি তোমার ?' শুধোয় মেয়েটি।

'কানেকটিকাটে কভেনট্রিতে।' ছেলেটি আধ-ঘুমন্ত। যে আবেগকে সে অতিক্রম করতে পারেনি বললেই চলে সেই অদমিত আবেগ তার ক্লান্তিকে করে তোলে রসাল, মদের মতোই মিষ্টি নেশা যেন। কথা বলে সে, ঠোঁট যেন নড়েই না। কণ্ঠস্বর আসে ফিসফিস করা কথার মতো।

তাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে মেয়েটি বলে, 'শুয়ে পড়।' নিজেকে ছেলেটি

এলিয়ে দেয়, তাকিয়ার ওপর তুলে দেয় পা দুখানা। মেয়েটি পাশে বসে ওর সুগোল গালে টোকা মারে। সে শুয়ে থাকে খুশীতে, আরামে, আর ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে যান্ত্রিকভাবে মেয়েটির কথার উত্তর দেয়, একবার জোর গলায় বলে ওঠে যে তার কাদামাখা জামাকাপড়ে মেয়েটির বিছানা নোংরা হয়ে যাবে।

'ও কিছু নয়,' বলে মেয়েটি হেসে উঠল এবং ছেলেটি তাকে নিজের জুতো খুলে নিতে দিল। মেয়েটি বললে, 'আমি কখনও কানেকটিকাটে যাইনি। বেশ সুন্দর জায়গা?'

ফিসফিস করে ছেলেটি বললে, 'আমার প্রায় মনেই নেই!'

'তুমি কি চাষী?' মেয়েটি জানতে চাইল।

'স্কুলের শিক্ষক।'

মেয়েটির গলায় গভীর, আন্তরিক শ্রদ্ধাঃ 'অ্যাঁ! বল কি! সত্যি? ঠিক বলছ?'

'ঠিকই বলছি। আমি ইয়েল কলেজে পড়েছি,' ছেলেটি বললে, তন্দ্রার মধ্যেই, একটুও অবাক না হয়ে যে সে এই বেশ্যাটাকে নিজের দাম বোঝাতে চাইছে।

'সে কি!' তারপর মেয়েটি কবুল করে, 'আমি লেখাপড়া জানি না।'

ঘুমের ঘোরে ছেলেটা হেসে উঠল।

'আমি লেখাপড়া জানি না,' মেয়েটি এমন স্বরে পুনরুক্তি করল যেন কেউ ভগবানের কাছে স্বীকারোক্তি করছে যে আমি জগতের পর জগৎ সৃষ্টি করে শূন্যে নিক্ষেপ করতে পারি না।

তার বাড়ির গুদামঘরে মোমবাতির আলোয় ক্ষয়রোগী ছোট্টখাট্ট ইহুদি হেম স্যালোমনকে দেখাচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুঁকড়ে যাওয়া প্রেতাত্মার মতো। সে পরিকল্পনা করছে, মিনতি করছে আর ক্যামব্রিসের রুমাল মুখে দিয়ে কাশছে। তার সঙ্গে রয়েছে একজন স্কচ, জলবিভাগের লোক, এক মোটা-সোটা ডাচ দোকানদার, ইংরেজি প্রায়-না-জানা একজন আহত পোল আর সিনাগগের বৃদ্ধ, রক্তচক্ষু চৌকিদার। স্যালোমন নিজেকে এবং অন্যদেরও সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যেটা করতে বলছে সেটা একটা ভীতিপ্রদ, বেপরোয়া কাণ্ড। আর এই নিয়ে সেই বিকেলের শুরু থেকেই তর্কাতর্কি চলছে; আর এখন, মাঝরাতের কয়েক ঘণ্টা আগেও, তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বটে, তবু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি।

চুপ করে বসে তারা পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চোখের চারদিক লাল হয়ে উঠেছে। জানত সকলেই এরা যে, শীগগির, খুব শীগগিরই সিদ্ধান্তে একটা আসতে হবেই। এদিকেই হোক, ওদিকেই হোক; তবে এই থেমে থাকতে থাকতেই ওরা প্রথম স্পষ্ট, সম্পূর্ণ ধারণা করতে পারল যে ওদের পরিকল্পনার মানেটা কি দাঁড়ায়। এই তো নিউ ইয়র্ক শহর, আমেরিকার চাবিকাঠি, সবচেয়ে ভালো বন্দর, সবচেয়ে ভালো নোঙর করার জায়গা। এখানে খাবার আছে, আশ্রয় আছে, স্বাচ্ছন্দ্য আছে, আবার এইখানে শত্রুরাও আছে। এইখানটিতে আরামের আবাস, স্থলপথে এখানে আসা যায় না। ব্রিটেনের শক্তিশালী নৌবহর চিরকাল এই স্থানটিকে কব্জা করে রেখে দিতে পারে। এইখানে একটি বিষাক্ত কাঁটা আমেরিকার গায়ে বিঁধে আছে। আর যাই ঘটুক না কেন, এর ফলে আমেরিকা যন্ত্রণায় কাতরাবে।

পরিত্রাণের একটি উপায়ই আছে এবং সেটি ওয়াশিংটন আগেই বুঝেছিলেন কিন্তু উপনিবেশের প্রতিটি সামরিক পর্যবেক্ষক যেটিকে একমাত্র উপায় বলে মনে করতেন, সেইটি প্রয়োগ করতেই কংগ্রেসের নিষেধ। যে বিষাক্ত ক্ষত সারানো যায় না তাকে কেটে বাদ দিতে হয়। নিউ ইয়র্ককে ধ্বংস করতে হবে, পুড়িয়ে ফেলতে হবে, রেখে যেতে হবে ধোঁয়াখওয়া পোড়া কাঠের স্তূপ যা টোরীদেরও সুখ দেবে না, ব্রিটিশ ও জার্মান আক্রমণকারীদেরও না। নিরপরাধ লোকেরা যদি কষ্ট পায় সে হবে শুধুমাত্র বিপ্লবের জন্যে দেওয়া মূল্য। বিপ্লব একটা খেলা নয়। এটা একদিকেই যায়— বিপ্লবীদের পেছনে জ্বলে নরকের আগুন।

স্যালোমন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে, 'পেছন ফিরে তাকাতে পারবে না।'

ডাচ দোকানী একগুঁয়েমিতে মাথা নাড়ে, অভ্যস্ত ভঙ্গীতে জোর দিয়ে বলে, 'ধ্বংস কোন সমাধান আনে না।'

স্যালোমন কিন্তু বলেই যায়, 'ফিরে তাকাতে পারবে না।'

মাঝরাতের* কিছু পরে ন্যাথান হেল জেগে ওঠে, এবং আলকাতরার মতো অন্ধকারে কিছু দেখতে না পাওয়ার প্রথম অনুভূতিতে হাতড়াতে থাকে, খড়ের গদীর ওপরে গড়ায় এবং তার মনে পড়ে কি করে সে এখানে এল। অন্ধকারে সবকিছু ঢাকা ছিল বলে মেয়েটির স্মৃতি তার কাছে কেমন অস্পষ্ট; অন্ধকারের মধ্যে সে ঠিক করে উঠতে পারে না। মোজা পরা পায়ে মেঝের ওপর দিয়ে এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে সে জুতোজোড়াটা খুঁজে পেয়ে পায়ে দিয়ে নেয় এবং যেদিকে দরজাটা রয়েছে মনে হয়

সেইদিকে হোঁচোট খেতে খেতে এগিয়ে যায়। এখান থেকে বাইরে খোলা বাতাসের মধ্যে যাবার একটা অদম্য ইচ্ছা জেগে ওঠে তার।

দরজা খোলার পর তারার আলো ঘরে এসে ঢুকতে সে যেখানে ঘুমিয়েছিল সেই জায়গাটার কিছু কিছু চিনে উঠতে পারে—জানলাহীন ছোট্ট ঘরখানা, বিছানাটা, চেয়ারখানা আর এক কোণে দলা-পাকানো কি একটা তাকে লজ্জায়, দুঃখে এক মুহূর্তে মনে করিয়ে দিল যে মেয়েটি বিছানায় তার পাশে না শুয়ে, দেবসুলভ মর্যাদায়, তাকে আরাম ও সম্মানের জায়গাটি ছেড়ে দিয়েছে। তার কাছে গিয়ে তাকে জাগাবার সাহস ওর হল না। তার বদলে সে হোঁচোট খেতে খেতে রাস্তায় নেমে পড়ল, তার ইয়াংকি আত্মস্তরিতার খোলস বহু জায়গাতেই তখন ভাঙা। সে হেঁটেই চলল। একটু ঘুমের পরে ক্লান্ত দেহের টনটনানি বেড়েই গিয়েছে। বেশ্যাটার বাড়ি থেকে ছ-সাতটা ব্লক পার হয়ে এসেই ছেলেটি বুঝল যে নিউ ইয়র্ক শহর পড়তে শুরু করেছে।

প্রথম প্রথম আগুনের ছোট ছোট শিখাগুলোকে এত অবাস্তব বলে মনে হচ্ছিল যে সে ওগুলোকে কোন আমলই দিল না; কিন্তু পরে যখন সে দেখল যে রাস্তা দিয়ে চিৎকার করতে করতে লোক সব ছুটছে তখন ঐ আগুনের পুরো অর্থটা তার মগজে ঢুকল। তখন সেও অন্যদের সঙ্গে ছুটতে আরম্ভ করল—এই সহজাত বোধের তাড়নায় যে যেখানটায় ভিড় এবং উত্তেজনা সব থেকে বেশী সেইখানেই তার নিরাপত্তাও সব থেকে বেশী। শুধু তাই নয়, ছেলেমানুষী তার এত বেশী যে আগুনের ভয়াবহতা তার ভাল লাগছে এবং সে স্বেচ্ছাসেবী আগুন নেভানো দলের অর্থহীন হাত পা নাড়ায় যোগ দিয়ে বসল। এ তো ঘটছেই; এর সঙ্গে রয়েছে সেনাবাহিনীর নানা রঙের ইউনিফর্ম, প্রাণপণ চিৎকার করা বেশ্যার দল, কামানের হুম হুম হুঁশিয়ারী আর সাধারণ মানুষের উন্মাদ কোলাহল। কভেনট্রিতে ছোট ছোট আগুন লাগার ফলে কাজে উৎসাহের যে বিরল মুহূর্তগুলো এর জীবনে এসেছিল, এই বর্তমান দৃশ্য তার থেকে অনেক বেশী রোমাঞ্চকর। সেই সময়কার ছোট ছোট শহরের আমেরিকায় সেই আদিম আগুন নেভানোর পদ্ধতির দিনে তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে বড় বড় আগুন নেভানো যায় না। তবে এখন সে এগিয়ে গেল এই জন্যে যে এইটিই এখনকার একমাত্র দুর্ঘটনা যাতে কোন লোকের মানসিক আবেগ কিছু বেরিয়ে গিয়ে স্বস্তি আসতে পারে।

জ্বালানি কাঠের বাক্সের মতো ডাচেদের বাড়িগুলো ইতিমধ্যেই দাউ দাউ করে জ্বলছে, কাঠ ফাটার, কড়ি-বরগা ভেঙে পড়ার আর দেওয়াল

পড়ার আওয়াজ—সব মিলিয়ে রণক্ষেত্রের আওয়াজ যেন। রাত্রি হয়ে উঠল দিন। রাত্রিবাস-পরা মানুষে গিজ-গিজ করা উজ্জ্বল আলোকিত পথগুলো, লালকুর্তাদের প্রাণপণে একটু পথ করার চেষ্টা হাতে-চালানো পাম্প নিয়ে যাবার জন্যে, বিস্ময়ে ছেলের মনে পড়িয়ে দেয় সেই সব অস্পষ্ট ছবিগুলো যেগুলো সে সংগ্রহ করেছিল তার প্রাচীন ইতিহাসের পাঠ থেকে। আকস্মিক আনন্দে সে মনে মনে ভাবল যে, নীরো বেহালা বাজাতে বাজাতে রোম যেমন পুড়ছিল এটাও তেমনি নিশ্চিত একটি যুগ শেষ হয়ে যাবার লক্ষণ। সেই আগুনের দ্যুতিতে আর উন্মত্ত উত্তেজনায় সে ভুলে গেল তার সঙ্গী-সাথীদের শাস্তি এবং তিক্ত পরাজয়ের কথা; কেবলই মনে হতে লাগল যে তাদেরই বিজিত জ্বলন্ত এই শহরের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশেরা কত ছোট, কত অসহায়।

সেই মুহূর্তে, কয়েক মাইল উত্তরে, রবার্ট হ্যারিসন ভার্জিনিয়ানকে গভীর ঘুম থেকে টেনে তুলে, আগুনের আলোতে উজ্জ্বল দক্ষিণ দিকের এক জানলায় নিয়ে আসে। দুটি প্রাণীই তখন সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, তখনও পুরো ঘুম ভাঙেনি, তখনও ভাবছেন কিসের এই অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, বিস্ময়কর আলো। যতখানি সম্ভব শান্ত হয়ে হ্যারিসন স্থির করলেন: 'সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, স্যর, নিউ ইয়র্ক জ্বলছে। আমাদের বাহিনীগুলোর হাতে এমন কিছু নেই যাতে এই অনুপাতের আলো হতে পারে।' এবং তারপরেই তিনি চোখ বেঁকিয়ে তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টিতে ভার্জিনিয়ানকে লক্ষ্য করে বুঝতে চেষ্টা করলেন ঐ লম্বা মুখের ওপর যে ভাব ফুটে উঠেছে ওটা আনন্দ, গর্ব, না হতাশা। কিন্তু সর্বাধিনায়কের অবয়ব অবিশ্বাস্যরকম শান্ত। তিনি শুধু বললেন, 'হ্যারিসন, দেখ; আমার ঘোড়াটায় জিন লাগানো হয়েছে কি না।'

দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে প্রকাণ্ড লোকটি লক্ষ্য করলেন যে আলোর ছটা বাড়ছে। হার্লেমের কাছাকাছি পৌঁছতে পৌঁছতে দক্ষিণ আকাশ আলোয় আগুনে যেন রোদে ফেটে পড়ল। প্রথমে ইনি ভেবেছিলেন একখানা বড় বাড়িতেই বুঝি আগুন লেগেছে অথবা শত্রুদের একখানা বড় জাহাজ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন বুঝলেন যে একটা পুরো শহর না জ্বললে আকাশ এমন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে না। যা তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সেইটিই প্রায় অদ্ভুতভাবে ঘটে যাওয়ায় আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠলেন তিনি। ভীরু কংগ্রেসই তাঁকে এমন অসহায় করে ফেলেছিল বলে তিনি করে উঠতে পারেননি। কি ঘটেছে তার সঠিক খবর না পাওয়া

পর্যন্ত তিনি কিন্তু বিশেষ কোন কিছু না করবারই মনস্থ করলেন।

ফাঁপা রাস্তার উত্তরে পাহাড়ের ওপর একটা ফাঁকা জায়গায় ঘোড়া থেকে নামলেন। সেইখানেই একে একে এসে বাহিনীর অধিনায়কেরা তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে—নক্স, পাট্‌নাম, মিফলিন, স্পেন্সার, মিলিম্যান, গ্রীন, রীড, স্মলউড এবং বোধহয় আরও ডজনখানেক। ছোট্ট দল বেঁধে চুপ করে তাঁরা দাঁড়িয়ে। এই ভয়ঙ্কর, আশ্চর্য ধ্বংসকার্যের সামনে, সবচেয়ে বেশী যিনি কথা বলেন তিনিও, চুপ। কয়েকজন তাঁদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসীও ছিলেন; বেশীর ভাগই কিছু মানতেন টানতেন না; কয়েকজন আবার নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও সবচেয়ে যাঁরা কম বিশ্বাসী তাঁরাও পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও গুরুত্ব বুঝলেন।

ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। আগুনের আলোতে উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো ধূসর কুয়াশায় মিলিয়ে গেল। সকালের উজ্জ্বল সূর্য এই অদ্ভুত ভীতিপ্রদ দৃশ্যকে পরিণত করল সাধারণ বাস্তব দৃশ্যে।

বিশেষ কষ্টের সময়ে, ছোটখাটো দেখতে যে বেশ্যাটি তাকে আশ্রয় দিয়েছিল তার কথা যখন ন্যাথান হেলের মনে পড়ল তখন খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। যে জানলাহীন ছোট্ট খুপরিখানাতে সে ছিল সেখানা যে গলিতে ছিল, বিছানায় চেয়ারে বাড়িই হয়ে উঠেছিল, সেই গলিটা প্রাণপণে খুঁজতে গিয়ে দেখে চারদিকে দাউ দাউ করা আগুনের দেওয়াল। ছুটছে, হোঁচট খাচ্ছে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটে, কাঁধের ধাক্কায় লালকুর্তাদের সরাচ্ছে; কিন্তু সামনে কেবলই অগ্নিশিখার হাসি।

শহরটাকে এবং শহরের যা কিছু সব কিছুর প্রতি ঘৃণায় সে শেষ পর্যন্ত আপনমনে বলতে বলতে চলে এল, 'এইবার আমি ফিরে যাব। অনেকক্ষণ এখানে থেকে যা জানবার সবই জেনেছি। ওরা চাইবে না যে আর আমি এখানে থাকি।'

ভিড়, আগুন থেকে দূরে উত্তর মুখে চলে সে। বড় ক্লান্ত। একটা ছাউনির তলায় কিছু খড় রয়েছে দেখে, খড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। শীগগির, সহজেই ঘুম এল, দেহ একেবারে ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়েছে বলে।

সকালে যখন জেগে উঠল তখন আগুন তার আরও কাছে জ্বলছে। দিনের আলোয় তেমন উজ্জ্বলতা নেই কিন্তু কাঠ ফাটার অবিরাম শব্দে আরও ভয়াবহ। কাপড়-জামা ও মাথা থেকে খড় ঝেড়ে ফেলে তাকে বেরোতে দেখেই ছাউনির মালিক কিছু গালমন্দ করে। একটা কাঠের গামলা থেকে

খানিকটা জল খেয়ে, মাথা মুখ ভিজিয়ে নিয়ে, গায়ের ঝুল ঝেড়ে নেয়। আবার চলতে থাকে উত্তর দিকে।

গত রাত্রের অর্ধ-উদ্‌ভ্রান্ত, উত্তেজিত ভিড় আর চোখে পড়ে না। লোকে আরও শান্ত, আরও সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। ক্ষতি যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে। এখন তারা কোনরকমে প্রতিহিংসা নেবার উপায় খুঁজছে। আগুন নেভানো যায়নি কিন্তু বিপ্লবীরা তো এখনও আছে এবং তাদের ধরে যন্ত্রণা দেওয়া যেতে পারে। একবার দেখে কি এক হতভাগার গলায় ফাঁস পরিয়ে টানছে আর সে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। আর একবার দেখল দাড়িওয়ালা এক ইহুদ রাস্তায় মরে পড়ে রয়েছে।

শহরের প্রান্তে এসে আরও সতর্ক হয়ে সে চলতে থাকে কিন্তু একটু পরেই বোঝে যে লালকুর্তারা সব রাস্তায় পাহারা দিচ্ছে। বারে বারে সে চেষ্টা করে শহর থেকে বেরিয়ে উত্তরে যেতে আর বারে বারেই তাকে সেই পথেই ফিরে আসতে হয়। মনে হতে থাকে সে যেন ফাঁদে-পড়া পশু। ভয় পেয়েছে, ঘামছে, ধোঁয়ায় চোখ লাল হয়ে জল পড়ছে। একবার তাকে তো ছুটে, পাথরের দেওয়াল টপকে কলরব-করা মুরগীদের ঘরে আশ্রয় নিতে হল। সেখান থেকে বেরিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে বেড়া পার হয়ে, গুঁড়ি মেরে কাঁটাঝোপ পার হয়ে, একখণ্ড বনের মধ্যে একটুখানি স্বস্তি পেতে হল। ছোট্ট একটি খাল, সে উপুড় হয়ে পড়ে আকণ্ঠ জল খেয়ে নিলে। গাছ থেকে গাছ পেরিয়ে, অতি সতর্কতার সঙ্গে একটি আপেল বাগানের মধ্যে দিয়ে এক বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রের ধারে এসে পড়ল সে। বাঁ দিকে প্রায় আধ মাইল দূর দিয়ে বড় রাস্তা চলে গিয়েছে। চোখে পড়ল লালকুর্তার পাহারা। উত্তরেই আছে বনাঞ্চল এবং আশ্রয়। সেই আশ্রয় একেবারে চলে গিয়েছে ফাঁপা রাস্তা পর্যন্ত। নীচু হয়ে সে ঘাসের মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটতে শুরু করল।

প্রায় পার হয়ে এসেছে এমন সময় সান্ত্রীর চোখে পড়তেই জবরজং বন্দুক থেকে গুলি ছুটল। বেঁকে গিয়ে দেখে বনের প্রান্তেও লালকুর্তা। ডান দিকে ছুটে দেখে সবুজ ইউনিফর্ম পরা জার্মানেরা পালাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

পেছন ফিরে ছুটতে গিয়ে দেখে চার চারটে অশ্বারোহীর দল তাদের ঘোড়া ছুটিয়ে ওর দিকেই আসছে।

কোট ছিঁড়ে গিয়েছে, লালচে গালে লম্বা কাটা দাগ, সুস্পষ্ট ঠোঁট দুটি একটু কাঁপছে। জেনারেল হোর সদর দপ্তরে সে মেজর রাডলি ক্লেয়ারের

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেজর ক্লেয়ারের পিটপিট করা বিরক্ত চোখের পাতার দিকে। একটি টেবিলের পেছনে মেজর ক্লেয়ার বসে। এলোমেলো লেখা এবং কোনরকমে আঁকা মানচিত্রের টুকরোয় ভরা কাগজের সব টুকরো টেবিলের ওপর ছড়ানো। তাঁর চোখের দৃষ্টির মতোই বিরক্ত গলায় মেজর ক্লেয়ার বললেন, 'তুমিই যে এগুলো লিখেছ তা অস্বীকার করছ না তো?'

'না, স্যর। ওগুলো আমার কাছেই পাওয়া গিয়েছে।'

'হাতের লেখা তো বেশ, দেখছি।'

একটু আশায় ভরা গর্বের ছোঁয়া ছেলেটির গলায়, 'আমি ইয়েল কলেজের কলাবিভাগের গ্র্যাজুয়েট, স্যর।'

'তাই না কি? তোমাদের এই গ্রাম্য লেখাপড়ার কেন্দ্রগুলোর আমি তারিফ করি। তোমার নাম কি?'

'ক্যাপ্টেন ন্যাথান হেল।'

'ঐ পদে-টদে কিছু যায় আসে না। কোন্‌ রেজিমেন্ট?'

'কর্নেল নোলটনের কনেকটিকাট রেঞ্জার্স, স্যর।'

'রেঞ্জার্স—ওঃ, ওরে আমার মাসী রে, তোদের মতো ভিক্ষুকদের কাজের বিভাগের ভারী বৈচিত্র্য তো! তোর রেজিমেন্ট এখন কোথায়?'

'বলতে পারি না, স্যর।'

মেজরের গলায় অধৈর্যের রেশ: 'বলতে পারিস না! উচ্ছন্নে-যাওয়া ছোকরা, তুই একটি গুপ্তচর—বুঝতে পারছিস না?'

হঠাৎ সব বুঝতে পারায় ছেলেটির উজ্জ্বল নীল চোখ দুটি কুঁচকে গেল। মাথা নাড়ল সে।

মেজর বললেন, 'সবটাই শয়তানি—এই কাগজপত্র—অসামরিক পোশাক-আসাক—এই আগুনের মধ্যে—'

অসহায়ভাবে ছেলেটি বললে, 'আমাদের ইউনিফর্ম নেই—আমাদের কারও ইউনিফর্ম নেই।'

দুই-এক মুহূর্ত কাগজপত্রগুলো নেড়েচেড়ে, পাশে দাঁড়ানো প্রহরীকে মেজর বললেন, 'একে কানিংহামের কাছে নিয়ে যাও। কাল সকালে যেন ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হয়।'

পরের দিন সকালে আকাশ এত নীল; বাতাস বইছে জোরে, পাখী ডাকছে, সবুজ ঘাস মুচমুচ করছে, মেপ্‌ল্‌ গাছের পাতাগুলো উল্টে উল্টে গিয়ে বাদামী লালচে রং দেখা যাচ্ছে। ফাঁসি দেখতে যারা ভীড় করেছিল

তাদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে এই চমৎকার আবহাওয়া নিয়ে মন্তব্য না করল, কেন না, হেমন্তে নিউ ইয়র্কের আবহাওয়া এক এক সময় এমন হয় যে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমনটি দেখা যায় না। ঐ প্যালিসেড পাহাড়গুলো থেকে জোর বাতাস বইতে থাকে, হাডসন নদীতে পাতলা পাতলা বরফের চাপ জমে; শহরের রাণীর কাছে বয়ে নিয়ে আসে লক্ষ মাইল সুদূর পশ্চিমের সবটুকু সুগন্ধ।

ঢাকের চাপা আওয়াজ। সে যখন বেরিয়ে এল তখন তার একটিই প্রার্থনা—ভগবানের কাছে একটিই প্রার্থনা—ভয় না পাবার সাহস। আর সেই ভয় নয় যে ভয়ে তারা ব্রুকলিন থেকে পালিয়ে এসেছে, নিউ ইয়র্ক থেকে পালিয়ে এসেছে, যে ভয় তাদের সব মর্যাদা, গৌরব, সৌষ্ঠব হরণ করেছে—যে ভয়ে ছোট ছোট মেয়েরা দেহ বিক্রী করে বেশ্যা হয়, যে ভয়ে তারই সাথী, তারই ভাষায় যারা কথা বলে সেই সব স্বাধীন মানুষেরা, নিজেদের স্বপ্ন ছেড়ে তিন হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে, যে তারা পশ্চাদপসরণ করে করে পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাই সে হাত মুঠি করে, নিজের ভয় নিজের মধ্যেই চেপে রেখে, তৃণক্ষেত্র পার হয়ে চলে এল।

লালচে গাল, নীল চোখ, হলদে চুলে তাকে ছোট ছেলের মতো দেখাচ্ছে। তার সাহস দেখলে দুঃখ হয়, করুণা হয়; হাসবার চেষ্টা করছে; যে জীবন-টুকু বেঁচেছে তার কথা ভাবতে চাইছে না, ভাবতে চাইছে না সেই একটি নারীর কথা যে তাকে আত্মদান করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সে যুদ্ধে যোগ দিতে আসবার সময় কভেন্ট্রির সব লাজুক গ্রাম্য লোকেদের, এমন কি বাবা-মায়ের কথাও না। সে উপলব্ধি করতে চাইছে না যে খোলা বাতাস, নীল আকাশ এবং সবুজ ঘাস এইবারের মতো সে শেষ ভোগ করে নিচ্ছে।

তারপর, সব শেষে, সব জিনিসটাই ভেঙে পড়ল—তার শুধু মনে হল সে বাঁচতে চায়; অন্যদের উষ্ণ আলিঙ্গনে ফিরে যেতে চায়—সেই গরীব, ছেঁড়াখোঁড়া জামাজোড়া পরা দীন লোকেরা যারা সেই ভীতিপ্রদ, বিস্ময়কর, রহস্যময় ঘটনাটি ঘটাচ্ছে যার নাম বিপ্লব।

কিন্তু নিউ ইয়র্কের ভালো মানুষেরা যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ যে লালচে গাল ঠোঁট-কাঁপা ছেলেটার হাসতে গিয়ে ঠোঁট কেঁপে উঠছে, তাকে চিনত না।

যে পর্যুদস্ত বাহিনী ফাঁপা পথের ঠিক মুখটিতে বসেছিল তাদের ওপর জ্বলন্ত ধূমকেতুর মতো দক্ষিণ থেকে নেমে এলেন জেনারেল চার্লস লী। অনেক দিন অনেক সপ্তাহ ধরেই তাঁর আসা প্রতীক্ষিত ছিল। নিউ ইংল্যাণ্ডারেরা মাথা নেড়ে বিজ্ঞভাবে সায় দিল দক্ষিণীদের সঙ্গে এই বিষয়টিতে—সৈনিক ও নেতা হিসেবে সেই গুণগুলো লীর সবই ছিল যার একটিও নেই ভার্জিনিয়ার শেয়ালশিকারীর। তারা বলল কেমন করে চার্লসটাউনে ইনি ব্রিটিশদের আক্রমণ রুখেছিলেন; তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বাণীগুলো জোরে জোরে পড়তে শুরু করল; তাঁর রণকৌশল বালির ওপর এঁকে দেখাল; প্রশংসা করল তাঁর সাহসের, চতুরতারও। বিশৃঙ্খল ইয়াংকি বিপ্লবীদের মধ্যে সবচেয়ে ভীতু, অলস হতভাগাও সজোরে প্রচার করতে থাকে যে জেনারেল লীর নেতৃত্বে সে জগতে একজন সেরা সৈনিক হতে পারত। ইতিমধ্যেই যত দোষ, প্রতিটি ভুল—সব চাপিয়ে দিয়েছে ঐ শেয়ালশিকারীর হাড়-বের-করা কাঁধের ওপর। জেনারেল লী সেনাপতি হলে ব্যাপারটা কেমন অন্যরকম হত এরা তাই আলোচনা করতে থাকে।

শেয়ালশিকারীরও এদের সঙ্গে অনেকখানি মতৈক্য আছে, কেননা মনে মনে তিনি খুব ভাল করেই জানতেন যে সৈনিক হিসেবে তিনি, জর্জ ওয়াশিংটন যা নন চার্লস লী সবদিক থেকেই তাই। লীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা গভীর, আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ। অনেককাল আগে ঠিক এই রকম শ্রদ্ধাই তাঁর ছিল নিজের বিস্ময়কর সহোদর ভাই লরেন্স ওয়াশিংটনের প্রতি—তিনি নিজে যা নন লরেন্স তাই ছিলেন এবং যা কিছু তাঁর এত প্রিয় ছিল সেই সবই ছিলেন লরেন্স—শোভন, মনোহর এবং অভিজাত। তিনি ছিলেন স্বভাবতই জননেতা এবং দুঃসাহসে বিচিত্র। এবং এই শ্রদ্ধাই ভার্জিনিয়ান জমিদারের ছিল পৃথিবীর সব মহৎ ও দীপ্যমান মানুষদের জন্যে, যাঁরা বিনা ভয়ে, বিনা দ্বিধায় এগিয়ে যেতেন। সেই সমস্ত কষ্টের দিনে তিনি লীকে অবিরাম চিঠি লিখতেন, এটা-সেটা বলতেন এবং তাঁর উত্তরগুলোকে প্রজ্ঞার মণিমাণিক্যের মতো আঁকড়ে থাকতেন। আর লীর প্রত্যেকটি চিঠিতে তাঁর এই প্রত্যয়ই দৃঢ় হত যে লী কত বড় এবং তিনি কত ছোট।

এইবার অবশেষে লী হার্লেমে আসছেন।

এতে অবশ্য কিছু যায় আসে না যে যারা ভার্জিনিয়ানের সঙ্গে নরকে

পর্যন্ত যেতে রাজী তারা চার্লস লী সম্পর্কে তার এই মতে সায় দিত না। নক্স তো লীর নাম শুনলেই বিরক্তিতে ফুটতেন, পাট্‌নাম খোলাখুলি ব্যঙ্গ করতেন, আর গ্রীন বলতেন যে যা কিছু কজা করা হয়েছে তার দায়িত্ব লীকে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু যা হাতের বাইরে তার সম্পর্কে নয়। চার্লসটাউনের ব্যাপারে কতকগুলো অন্য বিষয়ের উল্লেখ করতেন রীড যেগুলোর প্রভাব ব্রিটিশদের পরাজয় ঘটানোয় লীর থেকে বেশী। তবু তাঁরা ওয়াশিংটনের বিশ্বাস টলাতে পারলেন না; আরও বেশী করে এই জন্যে যে ওয়াশিংটন নিজেই বুঝতেন এঁদের তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে সামরিক ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই।

হার্লেম পাহাড়ের ওপরে ছাউনির মধ্যে লী যখন লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢুকলেন তখন, স্বাধীনতা সৈনিকদের মধ্যে এর আগে যারা তাঁকে দেখেনি তারা তাঁর চেহারা দেখে এবং তাঁর সঙ্গী এক ডজন কুকুরের চিৎকার শুনে খুব অবাক হয়ে গেল। এরা সকলেই কুকুরের মালিক, কেউ একটির, কেউ দুটির, আবার কারো কারো একটি শিকারী কুকুরের দলও আছে। কিন্তু যুদ্ধরত একজন সেনাপতির পেছনে এক ডজন চিৎকার করা কুকুর—এ অসহ্য। তাঁর কাছে গেলেই সে কুকুরগুলো এমন চিৎকার করছে যে তাঁর কথা প্রায় শোনাই যায় না।

চেহারাখানাও তাঁর অত্যন্ত অস্বাভাবিক—ঢ্যাঙা, অদ্ভুত রকম হাড়-চামড়াসার। জর্জ ওয়াশিংটন এরকম নন। তাঁর মস্ত মস্ত হাড়ের মাংসহীন দেহ ইউনিফর্মের কোটের তলায় বেশ ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু ইনি পাটকাঠির মতো শীর্ণকায়, ঝুলে পড়া সরু সরু কাঁধ, দাবনা বলে জিনিস নেই, লতানে সুতোর মতো হাত দুখানা, লম্বা নাক, মুখখানা ছোটখাটো—তাতে থুংনির বালাই নেই। কথা বলেন উচ্চগ্রামে, চোখ কুঁচকে কুঁচকে, বিলিতি বাবুদের মতো টেনে টেনে। তিনি ব্রিটিশদের আরেকটি অভ্যাসের অনুসরণ করতেন—যেটি দেখতে চাইতেন শুধু সেটিই দেখতেন, সে জিনিসটি একশো গজ দূরেই থাক আর নাকের ডগাতেই থাক।

তাঁর এই অস্বাভাবিক, প্রায় খাপছাড়া চেহারা সত্ত্বেও লী কিন্তু ভাল সৈনিক, আমেরিকান বাহিনীতে যে কোন সৈনিকের চেয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। তিনি সেই অদ্ভুত বস্তু যিনি যুদ্ধ করতেই জন্মেছেন এবং তাঁর এই পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে বাহিনীতে ছাড়া আর কোথাও জীবন কাটাননি। কেউ যেমন চিত্রকর হয়, আবার কেউ যেমন কশাই হয় তিনি সৈনিক সেইভাবেই। তিনি কখনও কোন বিশেষ যুক্তির জন্যে বা আবেগের

বশে বা আদর্শের জন্যে অথবা শাস্তি দেবার জন্যে অথবা অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্যে যুদ্ধ করেননি। তিনি যুদ্ধ করতেন কেননা যুদ্ধই তাঁর পেশা এবং সব সময় যে সবচেয়ে বেশী দামে নিজেকে বিকোতেন তা নয়; চোখ থাকত নাম আর উন্নতির দিকে। আদর্শগত কোন কারণ তাঁকে কখনও প্রভাবিত করেনি।

অহংকার করে তিনি বলতেন যে এগার বছর বয়েসে তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে সরকারী সনদে চাকরি পেয়েছিলেন। এ কথা সত্যিও হয়ত। একজন ইংরেজ অফিসারের ছেলে তিনি। সেনাবাহিনীতে জীবনের স্মৃতি ভিন্ন আর কোন স্মৃতিই তাঁর ছিল না। পৃথিবীর সব জায়গাতেই প্রায় লড়াই করেছেন—ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আমেরিকাতে, আবার পর্তুগালে, পোল্যাণ্ডে—যেখানেই তলোয়ার আর বন্দুকের বাজার ছিল আর কি। আবার যখন তিনি আমেরিকায় এসে সর্বাধিনায়কের নীচেই পদ পেলেন তখন সেই পদ গ্রহণ করার আগে তিনি তিরিশ হাজার ডলারের জামানত দাবি করলেন। দামটা বেশীই বটে কিন্তু যুদ্ধে শিক্ষণপ্রাপ্ত ইংরেজ ভদ্রলোক তো আর গাছে গাছে ফলে না। ফলে তাঁর শর্ত গৃহীত হল। বেশীর ভাগ লোকই ভাবল যে শেয়ালশিকারীর চেয়ে তিরিশ হাজার ডলারের এই লেনদেনটা অনেক ভালোই হল। শেয়ালশিকারী কোন মূল্যই চাননি এবং প্রায় বুঝেই এসেছিলেন যে কোন টাকাকড়ি পাওয়া যাবে না।

একজন বহিরাগত হিসেবে নয়, ভাগ্যান্বেষী সৈনিক হিসেবে, ও দেশ থেকে যেই আসুক না কেন তাকে মধ্যপ্রদেশের গ্রামীণ লোকেরা বা নিউ ইংল্যাণ্ডের নাকীগলা চাষারা যেমন মুগ্ধ চোখে দেখে এঁকেও তেমনি দেখত। কিন্তু তাদেরও তাঁকে ঠিক ভালো লাগত না। ভগবান জানেন, তাঁকে নিয়ে তারা গর্ব করত; নিজেদের মনে জোর পাবার জন্যে তারা জোর গলায় প্রচার করত; অবশ্য প্রায় শূন্যে দাঁড়িয়েই তারা কয়েকজন। কিন্তু চার্লস লী নিজেকে যে মূল্য দিতেন টেনে টেনে নিজের কথায় তার তুলনায় এদের গর্ব করাটা কিছুই নয়। তাঁর দাম তিরিশ হাজার ডলার এবং তিনি ঠিক করে নিতেন যে কেউ যেন তাঁর দাম কম না মনে করে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শেয়ালশিকারী মরিসদের যে বাড়িতে সদর দপ্তর বসিয়েছেন সেটা তাঁর ভালোই লাগল। খাপ থেকে বের-করা কালো চুরুটে তাঁর পকেট ভর্তি। ঠাণ্ডা মানুষ বিলির প্রতি তাঁর কি অবজ্ঞা। দক্ষিণ দেশে যখন ছিলেন তখন শিক্ষিত অশিক্ষিত সব নিগ্রোর প্রতিই তাঁর এই মনোভাব ছিল। যে সবুজ ঘাসের মাঠখানিকে তার কোমল সবুজ সৌন্দর্যে ভার্জিনিয়ান

সংরক্ষণ করতেন সযত্নে তার ওপর জুতোর লাথি মারতে মারতে এবং চিৎকার-মুখর কুকুরগুলোকে নিয়ে, তিনি হালকা আসবাবপত্রে ভরা পরিপাটি বাইরের ঘরে ঢুকলেন। স্নিগ্ধ সৌষ্ঠবে ভরা খাবার ঘরে একই টেবিলে তিনিও খেলেন, কুকুরেরাও খেল; আর এমন নোংরা রসিকতা করতে লাগলেন যে তাঁর সহকর্মী অফিসারদের কানেও সেগুলো খারাপ ঠেকল; তবু তাঁরাও, গল্পেসল্পে যা শোনা যায়, বেশ কড়া পাকের মাংস খেয়েই তৈরি হয়ে উঠেছেন। আর ভার্জিনিয়ান বেশ সয়েই গেলেন সব, এমন কি খুশীতেই।

সদর দপ্তরে পৌঁছবার পর ঘণ্টা দুয়েক যেতে না যেতেই লী মন্ত্রণা-পরিষদ বসাতে চাইলেন আর ওয়াশিংটনকে বলে দিলেন, তাঁর মতে ঠিক কোন্ কোন্ লোকগুলোর উপস্থিত থাকা উচিত। টেবিলের উপরের দিকে সর্বাধিনায়কের চেয়ারে লীকে হাত পা ছড়িয়ে বসে থাকতে দেখে অফিসারেরা অবাক হয়ে একে একে সেই ছায়াচ্ছন্ন খাবার ঘরে ঢুকলেন। তাঁদের তেমন কিছু আগ্রহ নেই। স্যাডীরা ঢালা হলে লী আনুষ্ঠানিক সম্মাননাদি প্রস্তাব করলেন। আলোচনা আরম্ভ হলে লী সেটির হাল ধরে রইলেন।

আলোচনা কখনও উচ্চগ্রামে কখনও নিম্নগ্রামে, কখনও উত্তপ্ত কখনও ধীর, স্মৃতিচারণায় কখনও শান্ত কখনও তিক্ত—এর মধ্যে ওয়াশিংটন প্রায় অনড় হয়ে বসে, মোমবাতির আলোর পাশেই ছায়ার মধ্যে, গভীরে, আরও গভীরে সরে যেতে লাগলেন—না নড়েচড়ে, তবু নিজেকে একেবারে মুছে দিয়ে।

লীর প্রথম মন্তব্যই হল তাঁদের পরিস্থিতিটা যে একটা পাগলামি তাই নিয়ে। অনেকেই যে কথা কয়েক মাস ধরেই ভাবছিলেন সেই কথাই লী খুব কড়া করে বললেন—শক্তিশালী নৌবহর ছাড়া নিউ ইয়র্ক রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের সেনাপতি যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন সেই পদ্ধতি যদি ব্রিটিশেরা অনুসরণ করত তাহলে এই ছোট্ট দীন-হীন সেনাবাহিনীর কি যে হত তা লী সোজা কথায় বললেন চূড়ান্ত বদ মেজাজে। এ বিষয়ে তিনি একেবারে নিশ্চিত। তাঁর পক্ষে যুদ্ধ একটি বিজ্ঞান। তাঁর নিজের ওপর আস্থা যেমন সুস্পষ্ট, ব্রিটিশদের এবং তাদের পদ্ধতির ওপর অবজ্ঞাও তেমনি। কিন্তু এইটাই অফিসারদের তাঁর বিরুদ্ধে নিয়ে গেল।

তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'উচ্ছন্নে যাক সব! এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে পড়তেই হবে। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। এটা একটা নোংরা, যাচ্ছেতাই ফাঁদ। ঐ বেখড়ক হাঁদা গলদাগুলোর মাথায় যদি নদীর

উজানে একখানা জাহাজ পাঠিয়ে দিয়ে কামানগুলোর মুখ কিংজব্রিজের দিকে ঘুরিয়ে দেবার বুদ্ধিটুকু থাকত তাহলে নরক জমে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের এইখানেই স্থিতি।'

এরা জানত যে লী ঠিকই বলছেন এবং সেইজন্যেই তারা খেঁকিয়ে উঠল।

পাট্‌নাম গরগর করে উঠলেন, 'আমরা ওদের হপ্তার পর হপ্তা ঠেকিয়ে রেখেছি।'

রীড জানতে চাইলেন, 'অতই যদি সোজা হবে তাহলে ওরা ফাঁপা রাস্তাটা ধরেনি কেন?'

গ্রীন উল্লেখ করলেন, 'ফোর্ট ওয়াশিংটনকে দখল করার কোন পথ জগতে নেই। আপনার ঐ নরক জমে যাওয়া পর্যন্ত দশটা লোক একটা কামান নিয়ে ওটাকে দখলে রাখতে পারে।'

লী টেনে টেনে বললেন, 'যত হাঁদার দল সব। এক ঘণ্টার মধ্যে দশজন সৈনিক তোমার ঐ নিউ ইংল্যাণ্ডার আবর্জনাদের দূর করে দিতে পারে।'

বিতণ্ডায় পৌঁছে গেলেন তাঁরা, প্রায় হাতাহাতির যোগাড় হল। ঘুষির চোটে পলকা টেবিল কেঁপে উঠল; ডুয়েল লড়বেন বললেন তাঁরা, গালাগালি ছুটল সবারই মুখে: আর এসব কিছুর মধ্যে প্রকাণ্ড চেহারার মানুষটি নির্বাক বসে রইলেন, কোন মতামত দিলেন না। লীর কাছে এরা অপরিচিত, তাঁর দেখা কোন সৈনিকের মতো এরা নয়, এমন কি দক্ষিণের ভদ্রলোকদের সঙ্গেও এদের কোন মিল নেই। গেঁয়ো ভাঁড়, বুদ্ধু আর মুদী বেনের দল, যত সব বালখিল্য। আর এরাই যে নির্ভীক সাহসে ভয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়া ছেলেদের নেতৃত্ব দিয়েছে, লী তা দেখেননি। এ সবের উত্তরে তাঁর কাছে শুধু শোনা যেত: 'যতো সব উচ্ছন্নে-যাওয়া হাঁদা।'

শেষমেষ হাঁপিয়ে উঠে এলিয়ে বসে পড়লেন সবাই। আর উত্তপ্ত কথা-কাটাকাটির পর ভার্জিনিয়ানের শান্ত সিদ্ধান্ত, তাঁর কথা ভেসে এল যেন ছায়ার মধ্যে থেকে। ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'জেনারেল লী ঠিকই বলেছেন, আমাদের পক্ষে লড়াই করা সম্ভব নয়—অন্ততঃ এখানে তো নয়ই। হয়ত কোন জায়গাতেই আমরা দাঁড়াতে পারব না। আমাদের নিউ ইয়র্ক ছেড়ে হটে যেতে হবে। যে দুর্গের আমার নামে নাম দেওয়া হয়েছে সেটা দখলে রাখার চেষ্টা হয়ত করব আমরা—হয়ত বা না; আমি এখনও বলতে পারি না। কিন্তু আপনাদের বলছি, আমাদের বাঁচার রাস্তা—একমাত্র

রাস্তা হল ক্রমাগত হটতে থাকা যতক্ষণ না নিজেদের সুসংহত বাহিনীতে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারছি। আমাদের সুবিধে একটাই—আমরা নিজেদের বল অতিরঞ্জিত করি না। জানেন, বাড়ি ছেড়ে আসার সময় প্রথমে ভেবেছিলাম অল্পদিন পরেই ফিরে যেতে পারব। কিন্তু এ ব্যাপার অল্পদিনে শেষ হবার নয়, অনেক দিন লাগবে। যদি হটতে হয় হটে যাব পাহাড় পার হয়ে—বনাঞ্চলে যার মধ্যে দু দুটো ইউরোপ ঢুকে যায়। কিন্তু তারপরে একদিন আমরা এক সুসংবদ্ধ বাহিনীতে পরিণত হব, যে ধরনের বাহিনীর অভিজ্ঞতা জেনারেল লীর আছে। তখন আমরা ফিরে রুখে দাঁড়াব—তখন আর হটে পালাব না।'

আপন মনেই ভার্জিনিয়ান অনেকক্ষণ ধরে বলে চললেন, 'আমরা পালাব না, পালাব না, আমরা সত্যিকারের সৈনিক হব, সত্যিকারের সৈনিক হব।'

সৈনিক তৈরির চেষ্টা তিনি করলেন। যা যা করার কথা মনে এল আড়ষ্ট, অনভ্যস্ত ভঙ্গীতে তাই করে যান—এটা ওটা ঠিক করতে যান, উপদেশ, নির্দেশ, বকুনি, অনুনয়-বিনয়—সবই চলে। আর কতকগুলো চেষ্টায় লী মাথা নেড়ে সায় দেন কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই কৃশকায় ইংরেজটি ছাউনির মধ্যে দিয়ে চলে বেড়ান যেন এক সম্মানিত অতিথি—ইউরোপের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার অসংখ্য গল্প বলে যান—সবগুলোরই মোদ্দা কথা হল জেনারেল লীর মতো চতুর আর কেউই নয়।

এবং ইয়াংকিদের এটা ভালো লাগত; তারা ভালোবাসত তাঁর চতুরতা, তাঁর স্পষ্ট ইঙ্গিতগুলো যে ভবিষ্যতে কে সর্বাধিনায়ক হতে যাচ্ছে। ভার্জিনিয়ানের গুণাবলীর সঙ্গে তুলনায় এঁর ছোটখাটো ত্রুটিগুলোও তাদের ভালো লাগে।

দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ করে যখন লোকগুলো পালাতে থাকে তখন লী এই অদ্ভুত বাহিনীর ব্যাপার-স্যাপারে ঘাড় ঝাঁকিয়ে ওঠেন; কিন্তু তাদের কাউকে কাউকে ধরে আনা হলে সর্বাধিনায়ক যখন কঠোর আদেশ দেন ওদের পিঠ দিয়ে রক্ত না বেরোনো পর্যন্ত বেত লাগাতে, তখন তারা পরস্পরে বলাবলি করে ভার্জিনিয়ান কি পাথুরে-প্রাণ অত্যাচারী। দিনটি, প্রতিটি দিন শুধু মারামারি, পালানো, চুরি আর অভিযোগের বিরক্তিকর উপদ্রব।

তবু মন্ত্রণাপরিষদ বসার একটু পরেই লীর প্রতি সর্বাধিনায়কের শ্রদ্ধার

সমর্থন পাওয়া গেল ; কেননা অবশেষে ব্রিটিশরা তাই করল যা লী আগে থেকেই আঁচ করেছিলেন তারা করবেই—একটু আগেই হোক কি পরেই হোক। ওয়েস্টচেস্টারে বাহিনীর পার্শ্বভাগ আক্রমণ করতে ইস্ট নদী দিয়ে সাউণ্ডে একদল সৈন্য পাঠালো তারা। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য হল আমেরিকান বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করা।

এই পার্শ্বভাগ আক্রমণে কাজ হত। কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ নৌকোগুলো নদীর উজানে গুটিগুটি এগিয়ে গেলো পেল্‌স্‌ পয়েন্টের চড়ার খোঁজে। কিন্তু ঐ অঞ্চল তাদের ভাল জানা ছিল না, উপরন্তু কুয়াশায় বিভ্রান্ত হয়ে তারা গিয়ে পড়ল থ্রগস নেকে। সে জায়গাটাও ওয়েস্টচেস্টার তটরেখা থেকে বেরিয়ে যাওয়া চড়া, কিন্তু চড়া না বলে দ্বীপ বলাই ভাল। কেননা একটি কাঠের পুল দিয়ে মূল ভূখণ্ডে যাতায়াত করা যায়।

বছর চোদ্দ বয়সের এক ডাচ ছোকরা নদীর ধারে ঘুরে ঘুরে মাটি খুঁড়ে গেঁড়ি গুগুলি ধরায় ব্যস্ত ছিল। নাম পিটার রাউচ। তার কানে পৌঁছল ইংরেজদের কথাবার্তার আওয়াজ। ছোকরার মাথা এতই সাফ যে শোনার সঙ্গে সঙ্গে খালি পায়ে পুরো এক মাইল রাত্তিরে দৌড়ে লালমুখো আইরিশ কর্নেল হ্যাণ্ডের ছাউনিতে গিয়ে উঠল। হ্যাণ্ড ব্রিটিশদের অপছন্দ করতেন ; আর টোরীদের ওপর ছিল তীব্র, অপরিসীম ঘৃণা। নিজের রেজিমেণ্টকে টেনে এনেছিলেন ওয়েস্টচেস্টারে—এই আশায় যে দুঃসাহসী রেঞ্জার্স আর তাঁর সবুজ উর্দী-পরা রেঞ্জারদের সঙ্গে মোলাকাত হতে পারে।

এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সৈনিকদের মধ্যে দিয়ে বেগে বেরিয়ে পিটার রাউচ সটান গিয়ে হাজির হ্যাণ্ডের কাছে। তার মুখে অনর্গল ডাচ বেরুচ্ছে, হাত ছুঁড়ছে পাগলের মতো। হ্যাণ্ড তার বেল্ট ধরে তাকে কুকুরছানার মতো শূন্যে তুলে কয়েকবার ঝাঁকালে সে ঠাণ্ডা হল।

'এখন ইংরেজীতে বল্‌ কি হয়েছে ?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যাণ্ড।

'গলদার দল।'

'কোথায় ?'

'ঐখানে নদীতে, তাদের নৌকোয়—আমার মনে হয় শহর থেকে উজানে এসেছে, এই এরকম করে,' বলে ছেলেটা হাত দিয়ে জোরে জোরে দাঁড় বাওয়ার ভঙ্গি করে।

'নৌকো করে, দাঁড় বেয়ে ?'

'হ্যাঁ।'

'কজন হবে দলে ?'

'আমি শুধু গলা শুনেছি, দেখতে পাইনি।'

'নৌকো ভিড়িয়ে নামবে কোথায় ? কি মনে হয় তোর ?'

'যেভাবে যাচ্ছে, মনে হয় চড়ার দিকে নামবে।'

'আমাদের সেখানে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবি খোকা ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—' তার গলায় প্রতিশোধের উল্লাস। নিউ আমস্টার্ডামে ডাচদের পরাজয়ের প্রতিশোধ।

এর ঘন্টাখানেক পরে হ্যাণ্ডের দল কাঠের পুল টুকরো টুকরো করে ভাঙতে থাকে, ভাঙে আর চিৎকার করে গাল পাড়ে ইংরেজদের নিজেদের বিচিত্র পেনসিলভ্যানিয়ার আঞ্চলিক ভাষায়।

প্রকাণ্ড মানুষটির চোখ মানচিত্রের ওপর। যেখানটা থ্রগস্ নেক দেখানো হয়েছে সেখানে তাঁর আঙুল। ভেবে আঁচ করতে চেষ্টা করেন ব্রিটিশদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে। তিনি ফাঁদে পড়েছেন। আবার ব্রিটিশরাও একরকম ফাঁদে পড়েছে বলা চলে। যদিও ফাঁদ বলতে এক্ষেত্রে যা বোঝায় তা হল এই যে তাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভেঙে দেওয়া পুল আর কিছু বন্দুকধারী সৈনিক। প্রশ্ন হলঃ ব্রিটিশরা ফের গিয়ে নৌকোয় চড়ে ওয়েস্টচেস্টার তটরেখার অন্য কোথাও সদলবলে নামার আগেই তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে তাঁর বাহিনী সরিয়ে নিতে পারবেন কিনা।

তা সম্ভব বলে তাঁর মনে হল না। নিজের বাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে তাঁর কোন অতিরঞ্জিত আশা ছিল না। আর এতদিনে তিনি বুঝেছেন যে স্রেফ পালিয়ে যাওয়া আর হটে যাওয়ার মধ্যে খুব স্পষ্ট একটা পার্থক্য আছে। নিজের সৈন্যদের একবার পালাতে দেখেছেন তিনি, তিক্ত তার স্মৃতি। সেবারে তাঁরা ছিলেন একটা দ্বীপে আর বেশীর ভাগ সৈনিকই সাঁতার জানত না। শুধু সেইজন্যেই পুরো বাহিনীটা হাওয়ায় বাষ্পের মতো উবে যায়নি। এখন কি ঘটতে পারত ভাবলে রক্ত হিম হয়ে যায়—যদি তিনি বাহিনী তুলে নিয়ে মানহাট্টান থেকে দৌড় দিতেন, পেছনে ব্রিটিশ বাহিনীর একাংশ আর সামনে আর এক অংশ তাঁর পথ একেবারে বন্ধ করার জন্যে। না না, তাঁর বাহিনী ধীরেসুস্থে, বুঝেসুঝে চলবে, চলবে এক দলে, যাতে মানুষগুলো ভিড় করে পরস্পরের উষ্ণতা অনুভব করতে পারে, আর তাদের মনে থাকে যে পেছনে রয়েছে ঠাসা রক্ষীবাহিনী।

থ্রগস নেকে ব্রিটিশ বাহিনীটির চেয়ে পেছনের রক্ষীবাহিনীটির সমস্যা অল্প। ডেলাওয়ার এবং মেরীল্যাণ্ডের সৈনিকেরা একবার সেটি সামলেছে, আর একবারও পারে, কিন্তু ওদের সংখ্যা অল্প। আর থ্রগস নেক—

ফের ম্যাপে আঙুল দিয়ে তিনি জোর করে পরিকল্পনা করবার চেষ্টা করেন ; নৈরাশ্যে অপন মনেই বলেন, 'আর শ' পাঁচেক বেশী থাকলে কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করত।' সাউণ্ডের তীর ধরে, ওয়েস্টচেস্টারের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় যেতে যেতে তিনি ও তাঁর অফিসারেরা একমত হয়েছিলেন যে পেল্‌স্‌ পয়েন্টই হল ব্রিটিশদের অবতরণের চেষ্টার সম্ভাব্য জায়গা। লীরও মত তাই। খানিকক্ষণের জন্যে ব্রিটিশেরা অবশ্য থ্রগস নেকে ব্যর্থ হয়ে বসে আছে কিন্তু তারা সেখান থেকে সরে পরের চড়াটা পেলেই কি ঘটবে ? একটা কাঠের পুলও উড়িয়ে দেওয়া হয়নি ওদের আটকাবার জন্যে।

ভাবতে ভাবতে, পরিকল্পনা করতে করতে, মতলব আঁটতে আঁটতে তাঁর চোখের সামনে একটি ছবি ভেসে উঠল কয়েকশো মানুষের—তাদের গায়ে সবুজ জ্যাকেট, মাথায় জেলেদের টুপি ; তিনি ফিরে গেছেন ব্রুকলিনের জনহীন অন্ধ গলিতে, নজর করছেন মার্বেলহেডের লোকগুলোর তাড়াহুড়ো না করে গড়িয়ে চলার ভঙ্গি। তারা নাকীগলা ইয়াংকি, অহঙ্কারী, নিজেদের খোলসে নিজেরা আবৃত ; তবু কেমন আলাদা তারা—হাজারো দিনের নোনা বাতাস আর শিলাবৃষ্টি, মৃত্যু আসছে জানে কিন্তু বোঝে না সীসের বুলেটের আর সমুদ্রের বরফজলের পার্থক্য। তিনি দেখেছেন তাদের, দাঁড় হাতে, আর এখন ভাবতে অবাক লাগে ওদের বন্দুক-হাতে কেমন দেখতে লাগবে।

কর্নেল গ্লোভারকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় বয়েস কত—আঁটসাঁট গড়ন, হালকা চোখ, মুখে সেই মৃদু হাসি যা তাঁদের মতো লোকেরা জোর করেই হাসেন দক্ষিণের অদ্ভুত লোকেদের দেখে।

'আপনার লোকেরা যুদ্ধ করতে পারে ?' ভার্জিনিয়ান শুধোন।

'পারে হয়ত।'

ম্যাপে পেল্‌স্‌ পয়েন্টটি দেখিয়ে বলেন, 'মনে হয় ব্রিটিশেরা এইখানে অবতরণ করবে। আমাদের বাহিনী দ্বীপ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত, আমি চাই না ওরা নামুক।'

'হুঁ হুঁ।'

'পারবেন করতে ?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'একদিনও লাগতে পারে, দুদিনও লাগতে পারে কিন্তু অবরোধের সব ঝুঁকি না কাটা পর্যন্ত আমি চাই ওদের আটকে রাখা হোক।'

'হুঁ হুঁ,' মাথা নাড়েন গ্লোভার।

তারপর তাঁরা করমর্দন করেন, ওয়াশিংটনের মুখে একটু হাসি আর গ্লোভারের সেই জোর-করা হাসি।

সেই রাতেই জেলেরা জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। তাদের ঘোড়া ছিল না। তাই বিরক্তিতে দিব্যি গালতে গালতে, স্রেফ গায়ের জোরে, তাদের যে তিনটি ছোট্ট কামান ছিল সেই তিনটিকে, ঝোপ-ঝাড় কাঁটাগাছের মধ্যে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে, টানতে টানতে, শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসা হল সুবিধামত একটা পাথরের দেওয়ালের ধারে। সাউণ্ড নদীর কাছাকাছি থাকায়, তাদের ছোট ছোট নৌকোর বাহিনীটিকে ছেড়ে আসতে হল বলে তারা একটু গোমরা হয়ে আছে। এই নৌকোগুলো যোগাড় হয়েছিল ব্রুকলিন থেকে পশ্চাদপসরণের সময়। তাদের একটা অস্পষ্ট ধারণা হচ্ছিল যে এই যুদ্ধটি ঘটবে জলেও যতখানি স্থলেও ততখানি।

পাথরের দেওয়ালের পেছনে ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে গিয়ে ওরা যখন বন্দুক ঠিক করছে তখন গ্লোভার পাইপ ধরিয়ে অফিসারদের ডাকলেন আদেশ দেবার জন্যে। যে লোকজন তার চারদিকে এসে দাঁড়ালেন তাঁদের মধ্যে ন'জন তাঁদের নিজেদের নৌকোরই ক্যাপ্টেন। আর তিনজন স্কুলের শিক্ষক—ক্লাস না থাকায় কড মাছ ধরতে বেরিয়েছেন, একজন পল্লীযাজক, একজন মুচি, একজন ছুতোর আর শেষজন হলেন হিরাম খ্রিমার্ফি প্লাওম্যান—ইনি গ্লস্টারের সমগ্র তীরবর্তী অঞ্চলে সবচেয়ে দক্ষ এবং খ্যাতিমান ভাস্কর। পাকাপোক্ত, তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন লোক এরা—লম্বা মুখ, লম্বা নাক, রক্তে এঁদের জেদ আছে এবং এঁরা যে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন তার কারণ স্বাধীনতা এঁদের কাছে আদর্শ নয়, স্বাধীনতা এঁদের পেয়ে বসেছে।

গ্লোভার পাইপে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এবং সাউণ্ড নদীর ওপরে প্রভাতের ধূসর কুয়াশার দিকে ইঙ্গিত করে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ওরা ঐদিক থেকে আসবে।'

এরা অপেক্ষা করতে লাগল।

গ্লোভার বলে চললেন, 'এইখানেই আমরা থানা দিয়ে বসব।'

এঁরা বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়েন।

গ্লোভার বলেন, 'আমরা থানা দিয়ে বসেই থাকব।'

অন্ধকারে যাজক গমগম করে বলে উঠলেন, 'হে আর্তের পীড়িতের প্রভু, সর্বশক্তিমান জিহোভা, তুমি অন্যায়কারীদের প্রতি তোমার ক্রোধ প্রজ্বলিত কর, তোমার পবিত্র নামকে যারা কলুষিত করছে তাদের আঘাত করে পাতিত কর, পুণ্যবানদের, ধার্মিক ব্যক্তিদের শক্তি দাও আর ইংল্যাণ্ডের চার্চকে ধ্বংস কর।'

অন্যেরা বললেন, 'তথাস্তু।'

নিজেদের অদ্ভুত উপায়ে তারা কামানগুলোকে ঠেসে ভর্তি করল, গোলা দিয়ে নয়—কামারশালার লোহার টুকরোটাকরা, মরচে-পড়া পেরেক, খণ্ড খণ্ড তার, পুরনো লোহার বল্টু, ঘোড়ার ভাঙা নাল, কাঁচের টুকরো আর খুব ভালো করে গুঁড়ো করে মিশোনো টিন আর দস্তার বাসনপত্র—এই সব দিয়ে। যুদ্ধ নিয়ে তাদের কোন আদর্শবাদ বা ভ্রান্ত ধারণা ছিল না, বরং ছিল পিউরিটানসুলভ কঠিন নির্মমতা। এরা গোলন্দাজ সৈনিক নয়। মস্ত মস্ত নলওয়ালা তাদের বন্দুকগুলো—কতকগুলো ঘণ্টামুখো প্রাচীন গাদা-বন্দুক। সবগুলোতেই তারা ঐ একরকম জিনিসই ভরল। গোলন্দাজ না হলেও তারা দক্ষ ইয়াংকি বলে তারা তাদের গাদাবন্দুকগুলোকে শর্ট-গানে রূপান্তরিত করল। তারপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

সকাল হতেই ব্রিটিশেরা নেমে এল এদের সাফ করে দেবার জন্যে।

জেলেরা ধীরভাবে অপেক্ষারত। সাউণ্ড থেকে সূর্য মাথা তোলে, প্রভাত ফেটে পড়ে রক্তিমার ঐশ্বর্যে, ব্রিটিশদের লালকুর্তায় তাতে মাঝে মাঝে ছাপ পড়ে। ওরা থ্রগস নেকে চেষ্টা করে দেখে পুলটা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখানে পা ফেলবার মতো মাটি আছে এবং পা দেবার মতো মাটি যেখানে আছে সেখানে এ পর্যন্ত লালকুর্তাদের কেউ ঠেকাতে পারেনি। বাঁশী এবং ঢাকের শব্দে তারা এগিয়ে চলে, শক্ত পালক-দেওয়া টুপি দোলাতে দোলাতে। ওদের চকচকে বেয়নেটগুলো সকালের বাতাসকে কেটে কেটে চলেছে। যখন তারা ত্রিশ গজ দূরে জেলেরা কামারশালার সব বস্তুপুঞ্জ ছুঁড়ল ওদের ওপর।

এরা জেলে। এরা দেখেছে বঁড়শী খুলে নিলে কড মাছগুলো কেমন মোচড়ায় আর রক্ত ঝরায় কিন্তু কড মাছের মতো পিছল, এক ডেক-ভর্তি, এক মাঠ-ভরা মানুষ কখনও এরা দেখেনি। এরা কঠিন মানুষ, এদের বাপ-পিতামহদের মতো, কিন্তু এই পরিস্থিতি সামলাবার মতো যথেষ্ট কঠিন নয়—যথেষ্ট কঠিন নয় উত্তেজনা চেপে রাখতে, গা বমি দেওয়া সামলাতে।

তবু তারা আবার বন্দুক গাদল।

ব্রিটিশেরা আবার এল, সোজা তাক করে, যেন সারা মাঠটা মৃত্যুতে মৃত্যুতে ইতিমধ্যেই চষে ফেলা হয়নি। আবার কামারশালার সেই বস্তুপুঞ্জ প্রাণ ওদের ছিঁড়ে বের করে দিল।

বারে বারে এল ব্রিটিশেরা।

ছুটে এল তারা, মৃতে ভরা মাঠের মধ্যে দিয়ে পাথরের দেওয়ালের কাছে। জেলেরা বন্দুক ফেলে দিয়ে, তাদের কাজে-লাগা লম্বা লম্বা ছুঁচোল শিকগুলো এবং সেগুলো তারা ব্যবহার করল বর্শার মতো।

নির্বোধ সাহস দেখিয়ে সারা সকাল ব্রিটিশেরা আক্রমণ করল। সেটা বোকামিও বটে, গৌরবেরও বটে। সারা সকালই মার্বেলহেডের জেলেরা মরচে-পড়া শিকগুলো দিয়ে নির্মম দক্ষতায় তাদের হটিয়ে দিল।

লালকুর্তা হালকা পদাতিকদের দুপুরের দিকে সরিয়ে নিলেন হো, নিয়োগ করলেন সবুজ সবুজ ইউনিফর্মের জার্মানদের। তারা এল কর্কশ শব্দ করতে করতে 'ইয়ংকি, ইয়ংকি!' লণ্ডন শহরের যে ছেলেরা ঠাণ্ডা মাথায় নির্ভুল তাক করে ঐ জ্বলন্ত নরকে এগিয়ে এসেছিল এই জার্মানদের সে সব কিছু ছিল না। তারা এল রুখে, মারমুখী হয়ে এবং তারাও ঐ একই ভাবে মরল— বেগে এগিয়ে গেল তারা পাথরের দেওয়ালের দিকে, ছিটকে পড়ল পেছন দিকে। তাদের সবুজ কোটের চিহ্ন পড়ে রইল মাঠের এখানে-ওখানে আর পড়ে রইল তাদের ভারী ব্যাগ আর প্রকাণ্ড শক্ত, পালক-লাগানো টুপিগুলো।

সারা বিকেল ধরে আক্রমণ চলে আর সারা বিকেল ধরেই জেলেরা ঘর্মাক্ত, দম ফুরিয়ে-যাওয়া জার্মানদের পিছু হটিয়ে দিল। জন তিন-চার জেলে মারা পড়েছিল, আর জনা বার আহত হয়েছিল, কিন্তু মাঠে তাদের সামনে পড়ে ছিল পাঁচশোর বেশী ব্রিটিশ আর জার্মান সৈনিক। অস্থির-চিত্ত যে জেনারেল হোর মনে, এই পৃথিবীতে ভয় বলে কিছু ছিল না, তিনিও আর এই জিনিস সহ্য করতে পারলেন না। সব সৈনিক ফিরিয়ে নিলেন এবং পেল্‌স্ পয়েন্টে শান্ত সন্ধ্যা বিভীষিকাকে ঢেকে দিল।

মার্বেলহেডের জেলেরা পেল্‌স্ পয়েন্টে পাথরের দেয়ালের পেছন থেকে যখন লড়াই করছে তখন সর্বাধিনায়ক প্রাণপণে চেষ্টা করছেন হার্লেম থেকে বাহিনী সরিয়ে নেবার—শুরু করা সেই পশ্চাদপসরণের যা দীর্ঘদিন ধরে চলবে। এতদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন এক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, যার কাজ ছিল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে ধ্বংস করা; কিন্তু শুধু ভগবানের দয়ায়, বৃষ্টি পড়ায়, আর ছ-সাতশো ইয়াংকি জেলের স্থির সহনশীলতায় শত্রুরা তাঁর বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি। পরাজয়ই তাঁর বাহিনীর এমন

অপরিবর্তনীয় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বিজয়ের কথা একেবারে ভাবাই যায় না। এখন শুধু ভাবতে হয় সুশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণের এ পথ সে পথ। এই সব কিছুর মধ্যে থেকে একটি অদ্ভুত বিচিত্র উপলব্ধি আসছে দীর্ঘকায় ভার্জিনিয়ান জমিদারের : যুদ্ধ আর স্বাধীনতার মতো বস্তু মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জন করে না।

এই উপলব্ধিটি তিনি এখনও সম্পূর্ণ অনুধাবন করে উঠতে পারেননি, কিন্তু তাঁর পরিবর্তনটি বুঝতে পারা যায় তাঁর প্রায় দেবী ধৈর্য লাভ করায়। সূর্যালোকিত মাউন্ট ভার্ননকে বহু দূরে, অস্পষ্ট স্বপ্নের আবেশ বলে মনে হয় এবং যদিও তিনি সেখানে ফিরবার আশা এখনও রাখেন তবু সেটা এখনকার ব্যাপার নয়, এখন হিসাবেরও ব্যাপার নয়। মাউন্ট ভার্নন এখন আর সেই চিরকালীন আবাস, গোলাবাড়ি, ধোঁয়া বেরোবার চিমনির ঘর, ভাঁড়ার ঘর, মদ রাখার ঘর, ফলের বাগান, মাঠ, তৃণক্ষেত্র, ছায়াতরুর সমষ্টি নয়। এই সবই ছিল—এই ছিল তাঁর জীবন। আত্মগত জীবন যাপন করবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তিনি বাঁচতেন জীবনের সুস্থ স্থূল বাস্তবে। এ সবই এখন বাতিল। মাউন্ট ভার্নন তাঁরই ছিল, এখন আর নেই। এখন শুধু আশা মাত্র।

অবিশ্বাস্য ধৈর্য তাঁর। নিজের জন্যে এই সহজ বিশ্বাস এখন তাঁর : 'বন্ধুদের বিশ্বাস করব আর শত্রুদের করব ধ্বংস করার চেষ্টা।' আর তিনি কাউকে দোষ দেন না, বকেন না, রাগারাগি করেন না ; ভুল হলে, যেমন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয়, তিনি তথ্যাদি দিয়ে এইটেই বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে এই রকম পরিস্থিতিতে জগতের সেরা বাহিনীও এইভাবেই কাজ করে। এই হাস্যকর যুদ্ধনাট্যে অধিনায়কত্ব তিনি এমন সহজভাবেই করে চলেছেন যে চার্লস লীরও তাঁর প্রতি একরকমের শ্রদ্ধা জন্মায়।

লী ভাবেন, 'লোকটা যদি এত বোকা না হত!'

কিন্তু যখন মাথাগরম তরুণেরা—নক্স, মিফলিন, মার্সার, ম্যাকডুনাল এবং অন্যান্যেরা রেগে ভার্জিনিয়ানের কাছে এসে খবর দিতেন যে লী এই বলেছেন, লী তাই বলেছেন, তিনি কান বন্ধ করে এই সোজা কথাটি বলে তাদের সরিয়ে দিতেন, 'জেনারেল লী হচ্ছেন একজন সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ সৈনিক, ভদ্রলোক। আমার যে কোন সেনাপতির কাছ থেকে আমি এইটুকু শুধু চাই।'

এক বছর আগে, এক মাস আগেও লী এবং আর কেউ কেউ তাঁর সম্বন্ধে যা বলতেন তা শুনে তিনি ক্রোধে ক্ষেপে উঠতেন ; কিন্তু এক বছর আগে, এক মাস আগেও তিনি যা ছিলেন এখন আর তিনি সে মানুষ নেই।

ব্রিগেডের পর বিগ্রেড ইয়াংকিরা ক্লান্তিতে পা টেনে টেনে চলল উত্তর দিকে—কারও হাতে অস্ত্র, বেশীর ভাগই অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মানহাট্টানের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে, কিংজব্রীজের উপর দিয়ে তারা চলেছে উত্তর দিকে ওয়েস্টচেস্টারে, জেনারেল হোর ফাঁদ থেকে পালিয়ে। হো তখন তাঁর অদ্ভুতকর্মা সৈনিকদের নিক্ষেপ করেছেন মার্বেলহেডের জেলেদের ওপর। যেটা ছিল মহাদেশীয় প্রতিরক্ষার সীমারেখা সেখান থেকে হোয়াইট প্লেনস পর্যন্ত আঠারো মাইলের দূরত্ব। তাঁর ভগ্ন পরাজিত বাহিনীর পক্ষে এই পথ মার্চ করে যেতে বার ঘন্টার কিছু কম লাগবে। এইখানেই ভার্জিনিয়ান তাঁর প্রতীক্ষিত পশ্চাদপসরণের জন্যে সামরিক রসদ সংগ্রহ করে রাখছিলেন।

ভার্জিনিয়ান আশা করেছিলেন যে হোয়াইট প্লেনসেই ছাউনি ফেলে শত্রুকে রুখবার আর একটা চেষ্টা করবেন, কিন্তু এখন বুঝলেন যে সেটা হবে সোজা ব্রিটিশের হাতে গিয়ে পড়া। যুদ্ধ শেষ করবার জন্যে তাদের দরকার শুধু তাঁর বাহিনীকে ঘিরে ফেলা। আগে হোক পরে হোক তারা সেটা বুঝবেই এবং সেই মতন কাজ করবে। অতএব পরিকল্পনা পরিবর্তন করলেন তিনি : ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছিলেন যে গ্লোভার এবং তাঁর জেলেরা কিছুক্ষণের জন্যে ব্রিটিশদের আটকে রেখেছে। বাহিনীর প্রধান অংশটি মানহাট্টান থেকে বেরিয়ে গেলে তিনি হোয়াইট প্লেনসে পশ্চাদরক্ষীবাহিনী রেখে যাবেন। সেই সময়ে রসদ সব সরিয়ে নেওয়া হবে। তারপর তিনি পশ্চাদপসরণ করবেন।

কিন্তু লীকে এমন তীব্র ঘৃণা করতেন গ্রীন যে তিনি সর্বাধিনায়ককে বোঝালেন নিউ ইয়র্ক সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হবে না—তিন হাজারের একটি বাহিনী ফোর্ট ওয়াশিংটনকে রেখে যেতে হবে। গ্রীন আর নক্স মনে করতেন এই স্থানটিকে চিরকাল রক্ষা করা যাবে

লীর মত ছিল : 'ঐটা, স্যর, পাগলামির চূড়ান্ত হবে।'

বিশাল আহত সিংহের মতো নিজের ক্ষত চাটতে চাটতে ব্রিটিশ বাহিনী উত্তরে, আরও ভেতরে ঢুকে গেল। যে ভীতিপ্রদ মরচে-পড়া জঞ্জাল দিয়ে তারা বন্দুক গেদেছিল তা ছোঁড়া শেষ করে রাতের অন্ধকারে ইয়াংকি জেলেরা সরে পড়ে; তবে এর মধ্যেই তারা, সময় এবং সেনাসংখ্যার কথা ভেবে দেখল, যুদ্ধের স্বল্প ইতিহাসে, ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর সবচেয়ে ভয়াবহ পরাজয় এনে দিয়েছে; তবু তারা যা করেছে তা একটি পার্শ্বদৃশ্য মাত্র—অবতরণের চেষ্টা ঠেকিয়ে রাখার ক্ষণেকের চেষ্টা। পরাজয়ের ঘন কালিমায় এটি প্রায় অলক্ষিতই রয়ে গেল।

দক্ষিণ ওয়েস্টচেস্টারের নীচু পাহাড়গুলোর মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে, কিংজব্রীজ পার হয়ে একবার মুক্তিবাহিনী মানহাট্টান ছাড়তেই ভার্জিনিয়ান মনে গভীর স্বস্তি পেলেন। একটি জিনিস তিনি সমাধা করেছেন এবং সেইটি বারে বারে তাঁর স্বপ্নে চরম দুরবস্থা বলে মনে হয়েছে—সেটি হল মানহাট্টান দ্বীপ থেকে তাঁর বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে আসা। কিন্তু স্বস্তিটা ক্ষণস্থায়ী কেন না যে জলাশয়টা ছিল তাঁর লোকেদের সকলের একসঙ্গে পালাবার পথে বাধাস্বরূপ সেটি এখন দূর হল। আকস্মিক এই ছত্রভঙ্গ হবার সম্ভাবনায় তিনি বাস্তবজ্ঞান হারাতে বসলেন। ঘোড়ার ওপর নিজেকে মনে হল একজন প্রকাণ্ড, বেমানান চাষী: ওপরে-তোলা দুখানি প্রকাণ্ড হাতের মুঠিতে গুঁড়ো গুঁড়ো বালি—ধরে রাখতে পারছেন না, ঝুরঝুর করে পড়ে যাচ্ছে, দমকা হাওয়ায় উড়ে চলে যাচ্ছে। এইগুলো কেমন নিষ্ঠুর সংক্ষিপ্ত সংবাদের আকার নিচ্ছে।

'স্যর, সখেদে জানাচ্ছি আমার দলের চোদ্দজন পালিয়েছে।'

'আমার কোন দোষ নেই, মান্যবর। ভার্মন্ট রাইফেল রেজিমেণ্ট বাড়ি চলে গিয়েছে।'

ছ'জন পলাতককে ধরেছি কিন্তু শ'খানেকের ওপর পালিয়েছে।'

'দুটো ছ' পাউণ্ডার কামান নিয়ে ক্যারোলিনা রিপাবলিকের বিশ্বস্ত, 'অনুগত গোলন্দাজ বাহিনী' সরে পড়েছে।'

'গ্যাডবি রেঞ্জার্সেরা চলে গিয়েছে, স্যর। কখন যে ছাউনি ছেড়ে পালাল তা বুঝতে পারিনি।'

'তাঁর সমস্ত লোকেদের নিয়ে ক্যাপ্টেন অ্যাটারসন সটান চলে গেলেন।'

'লেফটেনাণ্ট জোন্স আর তাঁর ছ'জন সৈনিক।'

'কর্নেল আর্লেন—'

'গ্রীন বর্ডারারদের বাষট্টিজন।'

'পেনসিলভ্যানিয়া রাইফেল বাহিনীর এগারজন।'

'ক্যাপ্টেন বিক্সবি—'

'দুই পিপে মদ, সমস্ত বারুদ নিয়ে রেজিমেণ্টের ছ'জন পালিয়েছে। এখন গোলাবারুদের ব্যাপারে কি করব?'

'তৃতীয় নিউ ইয়র্ক রেজিমেণ্টের বারজন।'

কথা কানে ঢুকে মাথার মধ্যে হাতুড়ি ঠুকতে থাকে। ভীতিপ্রদ নাছোড়

পুনরাবৃত্তি, কিছুতেই থামে না। দশজন, ছ'জন, ন'জন, একশোজন, দুশোজন—যদি এই রকম চলতেই থাকে তাঁর হাত তো খালি হয়ে যাবে। অফিসারদের কাছে মিনতি করতে থাকেন: 'লোকগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে রাত্রে পাহারা বসিয়ে দিন।'

কিন্তু একটি ছেলে বললে, 'কিন্তু, স্যর, পাহারাদারেরাও পালাচ্ছে।'

শুধু গতি তাঁর বাহিনীকে একত্রিত করে রাখবে এই আশায় তিনি উত্তরে ছুটলেন।

ওয়েস্টচেস্টারের ঘন বনে আচ্ছন্ন পাহাড়গুলো এক হিসেবে কারও অধিকারেই নেই। মেজর রবার্ট রোজার্স এবং তাঁর সন্ধানী সৈনিকেরা এক রকমের গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। এইটি এ পর্যন্ত প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল বিপ্লবীদের সমর্থকদের বাড়িগুলো পুড়িয়ে দেওয়ায় এবং অন্যান্য ছোটখাটো অনিষ্ট করায়—যেমন একে-তাকে ধর্ষণ, ডাকাতি, কষ্ট দিয়ে হত্যা করা এবং পাটাতনের ওপর চাপিয়ে গড়গড়িয়ে দেওয়া এ রকম বেশ কিছু চলেছিল। এই দ্বিতীয়টি প্রথমগুলোর চেয়েও কদর্য এবং বেশী ভীতিপ্রদ, কেননা একটি লোককে একটি পাটাতনের তীক্ষ্ণ প্রান্তে বসিয়ে, দুই পায়ে পঞ্চাশ পাউণ্ডের ভার ঝুলিয়ে দিয়ে ততক্ষণ তাকে রেখে দেওয়া যতক্ষণে সে অচৈতন্য হয়ে যায় বা মরে যায়, অথবা চিৎকার করতে করতে, কাঁদতে কাঁদতে সে মিনতি করত দয়ার জন্যে। ওয়েস্টচেস্টারে অবশ্য বিপ্লবীদের চেয়ে অন্যদের সংখ্যা অনেক বেশী তবু তারা এমন এক পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে যে পরিস্থিতিতে তাদের যথেষ্ট বিপ্লবী মনোভাব তৈরি হয়েছে—তাদের আর হারাবার কিছু ছিল না। পোকান্টিকো পাহাড়গুলোর জটিল বনাঞ্চলে আর ম্যাহোপ্যাক অঞ্চলের গভীর জলাভূমি এবং জনহীন হ্রদের ধারে তারা পশ্চাদপসরণ করে এবং সেইখান থেকে তারা দল বেঁধে তেড়ে বেরোত লুঠতরাজ এবং প্রতিশোধাত্মক অনিষ্ট করার জন্যে। ঘর পোড়াচ্ছে, বলাৎকার করছে, চুরি করছে। এই ঘটতে ঘটতে সমস্ত মনোরম বনাঞ্চলটিই সারা দেশে বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতার লীলাভূমি বলে পরিচিত হয়ে উঠল।

বিপ্লবীই হোক আর টোরীই হোক, ওয়েস্টচেস্টারের মধ্যে দিয়ে একা যাওয়া, হোয়াইট প্লেন্‌সে, ট্যারিটাউনে, ডব্‌স্ ফেরীতে অথবা হাডসন নদীর তীরবর্তী উপত্যকাগুলোতে যে ওলন্দাজ গ্রামগুলো গুচ্ছ বেঁধে ছিল সেগুলোতে, কিংবা সাউণ্ড নদীর তীর ধরে যাওয়া মানেই ছিল জীবন

হাতে করে যাওয়া।

মাঠে মাঠে ফসল হেজে গিয়েছে ; ফলের গাছের কোন যত্ন নেই আর জনহীন বাড়িগুলো হয় কালো ধ্বংসস্তূপ কিংবা দুর্গের মতো অস্ত্রশস্ত্রে ভরা এবং কাঁটাতারে ঘেরা। সমস্ত প্রদেশগুলোর মধ্যে এই স্থানটির মতো গৃহযুদ্ধের প্রতি এত তীব্র তিক্ততা এবং অসহ্য ঘৃণা আর কোন জায়গায় ছিল না।

এই অঞ্চলে এক নতুন ঘটনা ঘটল প্রায় তের হাজার সৈনিকের এক একটি বাহিনীর দুটির আবির্ভাব। একটি বাহিনী পরাজিত ভীত দেশীয় মানুষের দল, মানহাট্টান থেকে এসে উপস্থিত। আর একটি হল সুশৃঙ্খল, অপূর্ব শিক্ষণপ্রাপ্ত, ব্রিটিশ ও জার্মানদের যুদ্ধের যন্ত্রবিশেষ। নিউ রসেলের কাছাকাছি অঞ্চলে নৌকোয় এসে নেমেছে। উত্তর-দক্ষিণ কোণ বরাবর গিয়ে, এরা ঠিক করেছে, আমেরিকানদের ফাঁদে ফেলে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তাদের গতি অবশ্য মন্থর হচ্ছে ভুল করার ভয়ে, চোরাগোপ্তা আক্রমণের আশঙ্কায় এবং ওয়েস্টচেস্টারের ভূগোলটা জানা না থাকায়। এর ফলে লণ্ডন থেকে নৌবাহিনীর কর্তারা আদেশ জারি করেছেন যে তিন ডেক-ওয়ালা শক্তিশালী ব্রিটিশ নৌবহরের জাহাজগুলো ব্রংক্স নদী ধরে এগিয়ে গিয়ে তীর বরাবর যেন আমেরিকানদের বিধ্বস্ত করতে থাকে। হো সেইজন্যে সব রকমের বিস্তারিত আয়োজন করেছেন জোর করে ব্রংক্স নদী পার হবার কিন্তু সবিস্ময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে এটি একটি ছোট্ট মনোরম কয়েক ফুট মাত্র গভীর এবং কয়েক গজ চওড়া জলধারা। সেনা-বাহিনীর মতো মার্চ করতে অক্ষম বলেই আমেরিকানেরা এটিতে বাধা পেয়েছে।

আর দুটি বাহিনীরই চারদিক ঘিরে রয়েছে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঐ বিশৃঙ্খল বিপ্লবীদের দল। তারা পলাতকদের গুলি করে মারছে, দল ভেঙে যারা চলেছে তাদের খুন করছে আর সান্ত্রীদের ছুরি মারছে। তারা তাদের ভয়াবহ যুদ্ধ চালিয়েই যাচ্ছে আর এদিকে দুই বাহিনী ঠিক স্থানটি দখল করার জন্যে এদিক ওদিক করছে।

ভার্জিনিয়ানের পদমর্যাদার আশাটাই আর কিছুতেই মেটে না। রাত্রে স্বপ্নে অথবা দিবাস্বপ্নে তিনি যুদ্ধ জিতছেন কেবল নিজের রণকৌশল সঠিক বলে, এমন কি অনুপ্রেরণার জোরে ; আর তাঁর সৈনিকেরা নির্ভীক। তাই তিনি মনে মনে বলেন, পরের বার যদি ঠিকমতো চলি, সৈনিকের মতো সঠিক পরিচালনা করি সব কিছু, তাহলে ফল অন্যরকম হবে। আমি জিতব।

তাঁর কাছে এটা একেবারে স্পষ্ট, আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত। তাঁর নিজের এখন ভয় বলে কিছু নেই—যা ছিল তা এইটি জানার পর বোঝা গেছে যে ফিরবার কোন পথ নেই, এখান থেকে তিনি কেবল একটি দিকেই যেতে পারেন; আর তাঁর যা সেনাবল আছে তাতে অন্য রকম হবার তো কোন কারণ নেই। সেই আশার ওকালতির জোরে অভিজ্ঞতাও মুছে গেল। তাই হোয়াইট প্লেন্স্-এ এসে যখন তিনি দেখলেন যে এই জায়গাটি নারকীয় আক্রমণ থেকেও বাঁচানো যাবে, তখন লীকে বললেন, 'সেনাপতি, ওদের যদি এইখানে ঠেকাতে পারি, তাহলে সবকিছু আমরা বদলে দিতে পারি। তবু এটা কেবল আশা, কোন বক্তব্য নয়। ব্রংক্স নদীর আঁকাবাঁকা তীর ধরে হ্রদ অঞ্চলের জলাভূমি পর্যন্ত তাঁর বাহিনী পরিখা খুঁড়ে ব্যূহ রচনা করছে। টিলা রয়েছে অনেক এবং সেইগুলোর দিকে ভূমি ক্রমান্বয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে এবং লীর কাছে মনে হল এটা কোন সামরিক বিধিসংক্রান্ত গ্রন্থের কৌশল-গত একখানি ছবি। মুহূর্তের জন্যে তাঁর মনে সহানুভূতি জাগল এই নির্বোধ চাষীটির জন্যে—কেবলই ভুল করে, নেতা বা সৈনিক কখনই হতে পারবে না। মন তার চলে শ্লথ গতিতে; তাই অংশটুকুই দেখতে পায়, সবটা এক-সঙ্গে দেখতে পায় না।

কিন্তু ফোর্ট ওয়াশিংটনে এক গ্যারিসন সৈনিক রেখে তাঁর কথা যে শোনা হয়নি সেই অপমানে লী এখনও জ্বলছেন। তিনি রূঢ়ভাবে কোন দিকেই মত দিলেন না।

শেয়ালশিকারী স্বপ্ন দেখছিলেন, 'আমরা তো ওদের সাউণ্ড নদী পর্যন্ত হটিয়ে দিতে পারি।'

লী উত্তর দিলেন, 'ওরা ঘুরে গিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলে এক কদর্য ফাঁদে ফেলতে পারে।'

শেয়ালশিকারী মৃদু গলায় বললেন, 'না, তা ওরা করবে না।' এ সম্বন্ধে তিনি একেবারে নিশ্চিত। তাঁকে এবং তাঁর বাহিনীকে ব্রিটিশেরা যে কত ঘৃণা করে তা তিনি জানেন। সেই ঘৃণার জন্যেই তারা তাঁর বাহিনীকে ঘিরে ফেলবে না—তারা তো সম্মুখ যুদ্ধেই হারিয়ে দিতে পারে।

যেটি হোয়াইট প্লেন্স্-এর যুদ্ধ বলে খ্যাত হয়েছিল সেটি পরবর্তীকালে তাঁর মনে ছিল একটি বিশ্রী এলোমেলো ঘটনা হিসেবে—বিশেষ গুরুতর ঘটনা কিছু নয়—কিন্তু তাঁর বৃহত্তম বিপর্যয়ের সূচনা হিসেবে—সেই কালো বিভীষিকা যা তাঁকে স্বপ্নে যন্ত্রণা দিয়েছে, মনে রয়ে গিয়েছে এক অস্বস্তিকর ভূতের মতো।

যুদ্ধ হিসেবে অন্য যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে এমন ভিন্ন রকমের কিছু নয়, কিছু সৈনিক যুদ্ধ করল কিন্তু বেশীর ভাগই পালিয়ে গেল। তফাত শুধু এই যে, পেছনে যেন শয়তান আসছে এই ভয়ে এবার আর ইয়াংকিরা পালাল না, পালাল ডিলাওয়ার এবং মেরীল্যাণ্ড ব্রিগেডেরা, তাঁর নিজের দক্ষিণাঞ্চলের লোক এরা, যাদের ওপর তাঁর কিছু আস্থা ছিল। তবু তারা ইয়াংকিদের মতোই প্রাণপণে পালাল, ততই বেগে, এবং একই ভাবে নিজেদের বন্দুক-গুলোও ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বেশ সুরক্ষিত স্থান চ্যাটার্টন হিলে তিনি রেজিমেণ্টগুলোকে সাজিয়েছিলেন। দেখলেন তারা পাথরের দেওয়ালের পেছনে আস্তানা গেড়েছে—দুই পাশে দুটি কামান বালক হ্যামিলটনের হেফাজতে। কামান বেশী ব্যবহার করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। ব্রুকলিন আর নিউ ইয়র্কের ক্ষতির পরে আর কটাই বা অবশিষ্ট আছে। ফোর্ট ওয়াশিংটন আর ফোর্ট লী বাঁচাবার জন্যে যে কয়েকটি আবার আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মনে হল যে প্রতিবারই তাঁর বাহিনী যখন এক জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়েছে ততবারই এত গোলাবারুদ এবং অস্ত্রশস্ত্র ফেলে আসতে হয়েছে যে তাদের স্থান আর পূরণ হবে না। তারপর খোঁজাখুঁজি করে এখানে একটা লোহার গোলা, ওখানে কয়েক পিপে বারুদ, কয়েকটা পুরোনো বন্দুক, গাদা বন্দুক, শড়কি আর মরচে-পড়া বেয়নেট। প্রতিবারই যেন নতুন করে বাহিনী গড়ে দিতে হচ্ছে।

যেমন করেই হোক, গোলন্দাজদের উত্তেজিত করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, কামান গাদিয়ে, হ্যামিলটন সেগুলোকে ছুঁড়িয়েছে। কিন্তু উরুতে আহত একজন মাত্র সৈনিকের শুধু প্রয়োজন হয়েছিল মেরীল্যাণ্ডের লোকেদের ব্যূহ ভেঙে ছুট দেওয়াতে। তারপর সেই পুরনো হৃদয়বিদারক কাহিনী—অফিসারেরা চিৎকার করে মিনতি করছে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার জন্যে আর স্থানিক বাহিনীগুলো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে দৌড়চ্ছে সঙ্ঘবদ্ধ স্থিরলক্ষ্য আক্রমণকারী ব্রিটিশদের হাত থেকে। আবার শয়ে শয়ে আমেরিকানেরা খরগোসের মতো পালাতে আরম্ভ করে, যে কোন আশ্রয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ঢোকে, কাঁটাঝোপে গিয়ে ঢোকে, লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে, ঝরে-পড়া হেমন্তের পাতার স্তূপের মধ্যে, গাছের ওপর, জন্তু-জানোয়ারের গুহার মধ্যে পর্যন্ত।

নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা ম্যাকডুগাল নিউ ইয়র্কের একদল নীলচোখ শান্তশিষ্ট ডাচ ছেলেদের নিয়ে পশ্চাদপসরণটা কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখেন।

একটা পাথরের দেওয়ালের গায়ে লোকগুলোকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশেরা তাদের হঠাতে এক কোম্পানী হালকা অস্ত্রধারী সৈনিক পাঠাতেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে অন্যদের মতোই পালিয়ে গেল।

আবার অন্ধকার নেমে এল তার রক্ষাকবচ নিয়ে।

ভার্জিনিয়ান জমিদারটি কঠিন হয়ে উঠছিলেন। তিনি জিনের ওপর এলিয়েও পড়লেন না, সারা জগৎটাও চারপাশে ভেঙেচুরে খসে খসে পড়ল না। পরিবর্তনটা অবশ্য এসেছে ধীরে ধীরে, যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে; তবু এসেছে। তিনি সৈনিকদের পালিয়ে যেতে দেখেছেন তবে চারদিকের লোকেরা তাঁর ওপর যে আবেগটুকু দেখেছেন সেটি হল চোয়াল ছুটো আর একটু চেপে বসা। চোখের চারদিকে রেখা পড়ছে, মুখের চারদিকে এবং ভেতরে একটা কিছু বিস্ফোরণ ঘটছে। তরুণ হ্যামিলটনের রাগের চোখের জলের প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি নেই, সহানুভূতি নেই মোটামাথা পাট্‌নামের গরগরিয়ে ওঠা উচ্চৈঃস্বরের শাপমন্যির প্রতি।

নিজের বাহিনীর হয়ে বলে উঠলেন, 'আমরা এখনও এখানেই আছি।' এটা করতে তাঁরা যেন ব্রিটিশদের চেয়ে বেশী কিছু করেছেন।

লী মনে করিয়ে দিলেন, 'ঐ আজকেই শ' পাঁচেক যারা পালিয়েছে তারা ছাড়া।'

কঠিন স্বরে তিনি বললেন, 'ওরা ফিরে আসবে। অন্ধকার ঘন হলে, আরও চুপচাপ হলে ওরা ফিরে আসবে।'

ম্যাকডুগালের শুধু গোঙানি বার হল, 'নোংরা, ভীতু, বেজন্মাগুলো—'

ভার্জিনিয়ান শান্ত কণ্ঠে, ভেবেচিন্তে বললেন, 'ঘোড়ার ব্যাপারে আমি ওদের দোষ দিই না। ঘোড়সওয়ারের আক্রমণে ওরা অভ্যস্ত নয়। ঘোড়-সওয়ারের যুদ্ধটা ওরা শিখবে—শিখবে যে পদাতিকও যেমন মরে ঘোড়-সওয়ারও তেমনি মরে। অন্যান্য জিনিসও শিখবে।'

তাঁর আস্থা এখন আর তেমন উচ্ছল নয়—কঠিন, একটু ভীতিপ্রদ হয়ে উঠছে। তাঁর ধূসর চোখে জমে-ওঠা কাঠিন্যে পাট্‌নামও ভয় পাচ্ছেন। দিনের পর দিন, তাঁর সহকারীরা, বন্ধুরা, শত্রুরা লক্ষ্য করতে পারছে না পোটোম্যাক থেকে আসা এই বিশালদেহ, লাজুক, জমিদারের হচ্ছেটা কি। একদিন ইনি নিজেকে ভাবতেন প্রধানত শেয়ালশিকারী হিসেবে এবং চারদিকে যারা রয়েছে তাদের ভালোবাসা ভিন্ন আর কিছু তিনি চাননি। কিন্তু এর ফলাফলটা দেখল এবং বুঝল—মাঝে মাঝে তারা ভয়ও পেল। আবার মাঝে মাঝে তারা বেপরোয়া আনন্দও পেয়েছে নিজেরা নিজেরা।

যেমন চ্যাটার্টন হিলের পরাজয়ের তুদিন পরে যখন রোজার্স রেঞ্জার্সদের টেনে হিঁচড়ে কনেকটিকাট ক্যাম্পে নিয়ে আসা হল।

এঁরা ওয়েস্টচেস্টারের ভদ্রলোক। মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন নিজেদেরই একজনের সঙ্গে, ভার্জিনিয়ার অগ্রগণ্য ভদ্রলোকের সঙ্গে, পোটোম্যাকের অভিজাত ব্যক্তি, এই শেয়ালশিকারী। এঁরাও অবশ্য শেয়ালশিকারী। লালকুর্তায় তিনজনকে এমন শৃঙ্খলে বেঁধেছে যা নির্মিত হয়েছে তিন শতাব্দী আগে, ছোট ছোট ভীত মানুষদের জগতের ওপরে তারা স্থাপিত; তাই এঁরা একটু হম্বিতম্বি করার পর বুঝতে পারলেন তাঁর স্থির কঠিন মুখভঙ্গীর অর্থ কি। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি করেন?'

এঁদের মধ্যে একজন লম্বা, সুদর্শন, ফর্সা, মুখখানি লালচে—বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। ইনি অপরজনের হয়ে উত্তর দিলেন। একজন ছেলে-মানুষ, পাতলা মুখ। সুন্দর করে তৈরী-করা সবুজ বাক্‌স্কিনের স্যুট পরেছে।

'মেজর রোজার্সের রেঞ্জার্স দলের ক্যাপ্টেন লেসী, স্যর, আর এইজন লেফটেনান্ট অ্যালবার্ট।'

শেয়ালশিকারী নীরস গলায় বললেন, 'আমি কোন মেজর রোজার্সকে জানি না।'

এঁরা ওঁর দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

'আমি অবশ্য একজন রোজার্সকে জানি,' বললেন শেয়ালশিকারী।

তাঁরা অপেক্ষা করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোক কথা বলবার একটি সুযোগ সতর্কভাবে খুঁজতে থাকেন।

শেয়ালশিকারী বলে চলেন, 'শুনতে পাই তিনি একজন নিকৃষ্ট ইংরেজ ভদ্রলোক। কিন্তু আপনি কি?'

বয়স্ক জন প্রমাদবশে আরম্ভ করলেন, 'আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস করি, স্যর, যে একজন ভদ্রলোক হিসাবে আপনি আমাদের ভদ্রলোকের যে বিবেচনা প্রাপ্য তাই দেবেন। ওদের বদলে আপনাকে যে আমরা সম্বোধন করার সৌভাগ্য পেয়েছি—' ভুল বুঝে চুপ করলেন।

'কি বলতে যাচ্ছিলেন আপনি?'

'কিছু নয়।'

'কি বলতে যাচ্ছিলেন? আমার লোকেদের আপনি কি ঠাউরেছিলেন?'

'ইউরোপের লোক, স্যর।'

'আমরা নিজেদের আমেরিকান বলি,' শান্তস্বরে শেয়ালশিকারী বললেন। 'আপনি তো ইংরেজ নন এবং আপনাকে কি বলব তা জানি না।

আপনারা, ভদ্রলোকেরা যে বাক্‌স্কিন পরে রয়েছেন তা অতি কদর্য। আমি ওটাকে ইউনিফর্মই মনে করি না আর আপনারা আমাদের ব্যূহের মধ্যে ধরা পড়েছেন। ন্যায়তঃ আপনাদের ফাঁসি দেবার আমার অধিকার আছে। কিন্তু আমাকে আপনারা ভদ্রলোক বলে ভদ্রলোকের বিবেচনা আশা করেছেন। সার্জেন্ট, এঁদের নিয়ে গিয়ে দুশো ঘা করে বেত লাগাও।'

এই সময়টায়, হোয়াইট প্লেন্‌সের যুদ্ধের পরে পরেই, আমেরিকানেরা দাঁড়িয়েছিল যেন এক গহ্বরের প্রান্তে—পেছনে হাডসন নদী, বাহিনীর সম্মুখভাগ ভেঙে পড়ছে—জেনারেল হোর শেষ আঘাতের অপেক্ষায় আছে। ভার্জিনিয়ান বহু বছর ধরেই জানতে পারেননি কেন জেনারেল হো সেই আঘাত হানলেন না এবং তারপরেও স্থির করতে পারেননি যে তিনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পেরেছেন। হয়ত জেনারেল হো বিশ্বাস করতে পারেননি যে সামনের দিকটায় খোঁচা দিলেই তের হাজারের একটি বাহিনী ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

ভার্জিনিয়ান কিন্তু জানতেন যে, যত অল্প খোঁচাই হোক বাহিনী ভেঙে পড়বেই। মনেপ্রাণে তিনি জানতেন যে দড়ির শেষ প্রান্তে তিনি এসে গিয়েছেন, শেষ এবং একটিমাত্র প্রান্তেই, ব্রুকলিনে বা হার্লেমে যেমন এসেছিলেন সেরকম নয়। কারণ সেখানে পশ্চাদপসরণের বিকল্প ছিল। সেই ভীষণ রবিবারের সকালের মতোও নয় যখন তাঁর এক ডিভিজন বাহিনীর সৈনিকেরা, সংখ্যায় হাজার হাজার, নিউ ইয়র্কের মধ্যে দিয়ে পালিয়েছিল। এটা এমন শেষ প্রান্ত যেখান থেকে আর পালাবার পথ নেই।

পশ্চাদপসরণ সম্ভব নয় এবং এই শেষ। আর তিনি যদি ভীত ইয়াংকি-দের নড়াবার চেষ্টা করেন তাহলে ব্রিটিশেরা তাদের ওপর লাফিয়ে পড়ে একেবারে শেষ করে দেবে। বিকল্প অবশ্য ছিল কিন্তু সেগুলো হল ফাঁদটি চেপে বসবার আগে হতভাগ্য মানুষটির এটা ওটা ভাববার মতো। বাহিনী এখন তিন ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে—এক ভাগ নিউ ইয়র্কে ফোর্ট ওয়াশিংটনে, আর একদল হাডসনের ওপারে ফোর্ট লীতে আর এই তৃতীয় ভাগটি এইখানে ওয়েস্টচেস্টারে। প্রতি ভাগের প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষমতানুসারে চেষ্টা করেছে দলে দলে সরে পড়বার।

এবং তিনি যা করলেন সেটি তার মধ্যে যে পরিবর্তনটি ঘটছিল তার চাবিকাঠি—এমনভাবে কাজ শুরু করলেন যেন তিনি বিজয়ীদের মধ্যেও বিজয়ী। তিনি রেজিমেন্ট পরিদর্শন শুরু করলেন; পলাতকদের শাস্তি দিলেন, কংগ্রেসকে চিঠি লিখলেন আর সন্ধ্যায় নিজের লোকজনদের মধ্যে

বসে ম্যাডীরা খেয়ে শুভেচ্ছা প্রকাশ করলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, কংগ্রেস এবং ক্ষিপ্র ও আনন্দের বিজয়লাভের জন্যে।'

যে পথে যেতে হবে সেই পথটি সম্বন্ধে এত নিশ্চিত হতে পারায় মনে একটা শান্তি আসে—পথের দৈর্ঘ্য ভেবে নয়, কিন্তু যাবার একটি দিকই আছে বলে।

চতুর্থ পর্ব ঃ জার্সি

দুর্গের নাম 'ওয়াশিংটন'

১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই নভেম্বর। উজ্জ্বল হিমেল সকাল। ভার্জিনিয়ার শেয়ালশিকারী হাডসনের তীরে দাঁড়িয়ে, তামাটে চামড়ার মার্বেলহেডের জেলেদের লক্ষ্য করছিলেন কি রকম নিপুণভাবে এক ব্রিগেড সৈনিককে জার্সিতে পার করে দিচ্ছে। বেশ ভালো লাগছে, মুখে হাওয়া লাগছে; তাঁর বেল্টে বাঁধা গরম দুই ফা মদের পানীয়। সঙ্গে ছিল কেক, মধু, এক পাত্র চা। আরামে স্ফীত হবার মতো যথেষ্ট। ভালো খাওয়াদাওয়া হওয়ায় সকাল-বেলায় মনটা বেশ খুশী আছে। স্ত্রীর একখানি চিঠি পড়েছেন এবং উত্তরও দিয়েছেন, এবং গত রাত্রে তিন বোতল ম্যাডীরা পেটে পুরে টানা তিন ঘণ্টা নেচেছেন। সবগুলো এখন মিলন্ত—সকালবেলার রোদ্দুর আর বাতাস, সুড়সুড়ে পাতা পায়ের তলায় আর নদীর ঠাণ্ডা চকচকে ফুলে-ওঠা জল।

যদি তাঁর লোকেদের মধ্যে কারও প্রতি তাঁর সম্ভ্রম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা থাকে তা আছে এই মার্বেলহেডের জেলেদের জন্যে, তাঁর এবং তাঁদের প্রতি তাদের প্রকট ঘৃণা এবং তাদের নিরাগ্রহ নিউ-ইংলণ্ডীয় দক্ষতা সত্ত্বেও। তাদের কাছে তিনি যেমন বিদেশী, তারাও তাঁর কাছে তেমনি। তিনি বেশ কল্পনা করতে পারেন যে তারা মাউন্ট ভার্ননের জর্জীয় সৌন্দর্যের প্রতি বোকার মতো তাকিয়ে আছে আর মাঠে তাঁর নিগ্রো ক্রীতদাসদের দেখে তাদের ইয়াংকি ক্রোধ জেগে উঠছে। তাদের গতিবিধি নিজেদের মতো, তাদের ধ্যানধারণা ঠিক করা। তাঁর নিজের ধ্যানধারণা এমন ঠিকঠাক ছিল না কোনদিন। এমন স্থির উদ্দেশ্য নিয়ে যারা কাজে নামতে পারে তাদের দেখে তাঁর হিংসা হয়। আবার, এদের এক রকমের ভয়ও করেন তিনি;

বিশ্বাস করেন যে এদের মতো হাজার পাঁচেক সৈনিক পেলে তিনি ব্রিটিশদের ঠেলে সমুদ্রে ফিরিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু জানেন না যে, কল্পনাও করতে পারেন না যে, ব্রিটিশদের শেষ করে এই পাঁচ হাজার তারপরে কি করবে।

আজ সকালে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার মনের অবস্থা ছিল না। তাঁর বাহিনী জার্সিতে হ্যাকেনস্যাকের দিকে চলেছে। ঐখানে তাঁর নতুন ছাউনি। আশা করেছিলেন যে প্যালিসেড পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে দ্রুত অশ্বারোহণে ফোর্ট লী পর্যন্ত যাবেন। তাঁর পেছনে সৈনিকদের অবস্থান চমৎকার নির্ধারিত করা হয়েছে এবং মনে হচ্ছে আগে কখনও তাঁর বাহিনীর অবস্থা এত ভালো ছিল না। হাডসনের উজানের দিকের টিলাগুলো দু হাজার সৈনিক নিয়ে জেনারেল হীথ রক্ষা করছেন আর জেনারেল চার্লস লীর অধীনে ওয়েস্ট-চেস্টারে রয়েছে আরও পাঁচ হাজার। এ কথা সত্যি যে অনেকেই পালিয়েছে কিন্তু সব মিলিয়ে তিনি আশ্চর্যরকম সৌভাগ্যবান, কেননা হোয়াইট প্লেন্‌সের যুদ্ধের পর ওয়াশিংটনকে সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয় পেয়ে হো আক্রমণ করতে দ্বিধা করলেন। ঘটনার এই ধারার কোন ব্যাখ্যা ভার্জিনিয়ান করে উঠতে পারলেন না কারণ তাঁর কাছে এটা এতই স্পষ্ট যে হো যদি একবার সামনা-সামনি আক্রমণ করেন তাহলে সমগ্র আমেরিকান বাহিনী ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। দণ্ডাদেশ পাওয়া ব্যক্তির মতো ভার্জিনিয়ান অপেক্ষাই করে চলেছেন, যে সমাপ্তি এসে উপস্থিত হল না তার জন্যে নিজেকে একেবারে তৈরী করে। হো যখন তাঁর সুযোগগুলো নষ্ট করছিলেন তখন কতকগুলো খবর ব্রিটিশ ছাউনি থেকে তাঁর কাছে এসে পৌছয়ঃ কেউ কেউ বললে পেল্‌স্‌ পয়েন্টের ভীষণ রক্তাক্ত স্মৃতি তিনি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি; অন্যেরা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন যে বিদ্রোহটিকে সমূলে নাশ করার সাহস তাঁর নেই, কেন না ইংলণ্ডে বিদ্রোহীদের জন্যে সহানুভূতি বেড়েই চলেছে এবং এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আটলান্টিক পার হয়ে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেও আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এ সবই হল জল্পনা-কল্পনা এবং হো যখন শেষে মুখ ঘুরিয়ে বাহিনীকে নিউ ইয়র্কে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন তখন ভার্জিনিয়ার জমিদারের মনে হল তিনি বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি বুঝলেন না এবং কখনও স্পষ্ট করে ধারণাও করতে পারবেন না কেন সর্বনাশ তাঁকে এড়িয়ে গেল।

কিন্তু এখন তাঁর জার্সিতেই চার হাজারের বেশী সৈনিক। ফোর্ট লীতে জেঁকে বসতে পারলে এবং জেলেদের দিয়ে ফোর্ট ওয়াশিংটনের গ্যারি-সনটাকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারলে, নদীর দুই পারে তাঁর অধীনে থাকবে

প্রায় আট হাজার সৈনিক। তখন তিনি সেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন যারা তাঁকে এত বেশী জ্বালাচ্ছিল।

সব কিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছে ঘটনাস্রোত মোড় নিয়েছে।

নদী পার হয়ে সর্বাধিনায়ক সৈনিকদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন এবং বেশ প্রাণচঞ্চলভাবে তারা মার্চ করে চলে গেল। দেখলেন তিনি। ব্রিটিশ আর তাদের মাঝখানে হাডসন নদী থাকায় তারাও অনেক বেশী আশ্বস্ত হল, খুশি হল। দুজন মাত্র অফিসারের সঙ্গে তিনি নিজে পাহাড়ে পথের উৎরাই ভেঙে শ্লথ গতিতে চললেন ফোর্ট লীর দিকে।

সেইদিন এবং সন্ধ্যাতেও ছুটির মেজাজই রইল তাঁর। যে বাড়িটাতে রাত কাটাবার জন্যে থামলেন, সেটা একটা ছড়ানো ডাচ গোলাবাড়ি। বাড়িতে দুটি ছোট মেয়ে, ছ বছরের আর আট বছরের। তাদের লাজুকতা আর ভার্জিনিয়ানের মর্যাদার চাপ কাটতেই প্রায় তাদের শোবার সময় হয়ে গেল; তবে খাবার ঘরে উনুনের সামনে ঘন্টাখানেক বসে তাদের গল্প বলার সময় তিনি পেয়েছিলেন। হাবাগোবা লোকগুলো তখন আগুন পুইয়ে নিচ্ছে। ভালো করে গল্প তিনি বলতে পারতেন না। নিজের মধ্যে নয়, বহির্জগতেই তিনি বাস করতেন; সারা জগতের হাওয়ার স্পর্শে তাঁর ঠোঁট সিক্ত; তবু তিনি কোন বর্ণনাকে সজীব করতে পারতেন না, পারতেন না একটা ঘটনাকে উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলতে। শুধু পরিশ্রম করে বলে যেতেন:

'ছজন ইণ্ডিয়ান বনের মধ্যে লুকিয়েছিল। বনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে বলে তাদের আমাদের গুলি করতে হল; তারপর পাহাড়ের ওপর আরও জনদশেক। তাদেরও আমরা গুলি করলাম—'

ছোট্ট মেয়ে দুটি কাঁপতে শুরু করল আর তার কোলে যে সবচেয়ে ছোটটি ছিল সে আরও গা ঘেঁষে এল। তবে তিনি যা বলছিলেন তাতে কিছু আসে যায় না—কিন্তু তিনি কত মস্ত মানুষ, দৈত্যের চেয়েও লম্বা; পরনে অপূর্ব নীল কোট আর ঘিয়ে রঙের ফুলপ্যান্ট। তাঁর মুখের ওপর বসন্তের অদ্ভুত দাগগুলোতে আগুন থেকে ছায়া পড়ছে। গল্প শেষ হলে আট বছরের মেয়েটি শুধু বললে, 'ভালো গল্প। বাবা বলে তুমি ভালো যুদ্ধ কর, কিন্তু তুমি বড্ড মদ খাও—' সবটুকু সে বলে তার বিচিত্র ডাচ উচ্চারণে।

'কি?'

মেয়েটি বিষণ্ণ কণ্ঠে জোর দিয়েই বলে, 'তুমি অত মদ খাও কেন?'

'খুব বেশী খাই না—অন্যান্যদের চেয়ে বেশী নয়।'

মেয়েটি বিষণ্ণ কণ্ঠেই বলে চলে, 'বাবা বলেছিল তুমি আজ রাতে এ বাড়িতে এলে, মদ খেয়ে খেয়ে তাকে ঘরবাড়ি ছাড়াবে।'

পরের দিন দুপুর নাগাদ তিনি ফোর্ট লীতে পৌছে অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন যে মানহাট্টান দ্বীপ থেকে সৈন্য অপসারণের পরিবর্তে গ্রীন আরও সৈনিক আমদানি করেছেন। তরুণ কোয়েকারটিকে তাঁবুতে একা পাবার আগে তাঁকে তিনি কিছু বললেন না। তারপর ঃ

'আশ্চর্য ন্যাথানিয়েল, এ কোন্ ধরনের বদখদ পাগলামি?'

'পাগলামি, স্যর?'

'হ্যাঁ, পাগলামি। দুর্গ খালি করার বন্দোবস্ত করনি কেন? নিউ ইয়র্কে আরও লোক পাঠালে কেন?'

'দুর্গ টাকে রক্ষা করবার জন্যে, স্যর।'

'রক্ষা? ওটা রাখা যায় না!'

'তাজ্জব কথা, স্যর, কেন রাখা যাবে না? ঐ হতচ্ছাড়া দলত্যাগী ইংরেজ লীটা বলেছিল বলে—'

'গ্রীন!'

'মাফ করবেন, স্যর।'

মস্ত মানুষটি শান্ত স্বরে বললেন, 'শুধু আমার কাছে মাফ চাওয়াই যথেষ্ট নয়, জেনারেল গ্রীন। আমি চাই তুমি এখন এবং ভবিষ্যতের জন্যেও বুঝে নাও যে, বাহিনীতে আমার নীচেই জেনারেল লীর স্থান এবং একজন ইয়াংকির পক্ষে যতখানি সম্ভব ততখানিই তাঁর আদেশকে মান্য করা দরকার।'

গ্রীন তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, নির্বাক হয়ে মাথা নাড়ে, ফিস-ফিস করে বলে, 'ঈশ্বরের দোহাই, স্যর, এর বেশী আমি আর কি বলতে পারি? আপনার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসি, এই আপনি চান? যদি চান, তাই করব।' তাঁর কণ্ঠে কোন বিদ্রূপ ছিল না।

তারপর, দু-এক মিনিটের স্তব্ধতার পর, ভার্জিনিয়ান শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি মনে কর, ন্যাথানিয়েল, দুর্গ টাকে রাখা যাবে?'

'চিরকালের জন্যে!'

'চিরদিনের জন্যে নয়। এক সপ্তাহ কি এক মাসের জন্যে?'

'এক মাস। স্যর, একবার আমাদের সুযোগ দিন। ওরা নিউ ইয়র্ক

নিয়েছে, যেমন খুশি তেমনি করে নিয়েছে। এইবার আমাদের একবার সুযোগ দিন।'

তিনি রাজী হয়ে বললেন, 'বেশ, আমি সুযোগ দেব তোমাকে।'

নিজের কোন কথায় আর আস্থা না থাকায় গ্রীন শুধু মাথা নাড়লেন।

সেই সন্ধ্যাতেই মস্ত লোকটি ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেন পশ্চিমে। ঐ দিকে হ্যাকেনস্যাকে তাঁর বাহিনী ছাউনি ফেলেছে—প্যালিসেড পর্বতমালার ওপরে, ফোর্ট লী থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। হ্যাকেনস্যাকে চমৎকার আবহাওয়া তখনও চলছে। আর ব্রিটিশ বাহিনী বেশ দূরেই রয়েছে। তাই লোকেদের মেজাজ ভালো, বিশেষ করে এই জন্যে যে, এরা অনেকেই জার্সির লোক—পালিয়ে বাড়ি চলে যাবার ইচ্ছা হলে আর এক মাইল চওড়া নদী পার হতে হবে না। বেশীর ভাগ ইয়াংকি সৈনিকই জেনারেল লীর সঙ্গে রয়ে গিয়েছে এবং একটু ভালো অবস্থায় থাকা জার্সির লোকেরা কোনমতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে তারা বিজয়ী বাহিনী। অনেক সপ্তাহের পরে তারা একটু ভালো খেতে পেয়েছে, সামনেই কোন যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। এই বিশ্বাসটি তাদের জোর পেয়েছে পাসাইক এবং প্যাটারসন মেয়েরা অনেকেই কাছে আসায়। তারা এই ছাউনির সৈনিকদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছে।

'দেখে আমার বেশ লাগছে। এত বিশ্রী ছিল এর আগে! এরা এখন আগের চেয়ে ভালোই আছে। আমি আগে একটু বিব্রত বোধ করেছিলাম ন্যাথানিয়েল ফোর্ট ওয়াশিংটন রক্ষা করার কথা বলেছিল বলে।' এই নামটা থেমে থেমে তিনি কেবলই উচ্চারণ করতেন। জায়গাটা সম্পর্কে তাঁর একটা ছেলেমানুষি অহঙ্কারের ভাব ছিল—রিপাবলিকের দুর্গ, তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে, একজন খ্যাতিহীন ভার্জিনিয়ার চাষীর নামে।

নক্স সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মত দেবেন?'

'হ্যাঁ—কিন্তু লী—'

'ওঃ, লীর কথা ছাড়ুন, স্যর। মাফ করবেন, মনে কিছু করবেন না, আপনাকে কিন্তু আমাদের যুদ্ধ করতে দিতে হবে, সে দিতেই হবে।'

'হ্যাঁ, যদি সে রাখতে পারে তাহলে হোর গায়ে একটা কাঁটা বিঁধে থাকবেই। কংগ্রেস চান যে ওটা রক্ষা করা হোক।'

'বিশ্বাস করুন, স্যর, নরক জমে যাওয়া পর্যন্ত। আমরা তো হারিনি, আমরা পেছিয়ে এসেছি—হারিনি আমরা। এই আমার দিকে চেয়ে দেখুন, স্যর। আমি গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার কিন্তু আমার কামানগুলো কোথায়? ব্রুকলিনে, নিউ ইয়র্কে, ফোর্ট ওয়াশিংটনে আর ফোর্ট লীতে।

কিন্তু ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে বলছি, ওগুলো সব যদি খোওয়াও যায়, তাতেও কিছু যায় আসে না। আমরা হেরে যাব না। উনি যখন শুরু করলেন তখন আমাদের একটাও কামান ছিল না—' তরুণ গ্রন্থ বিক্রেতা প্রায় নাচতে শুরু করেছিলেন।

'নক্স!'

'কি বলুন, স্যর?'

মস্ত লোকটি একটু বিষণ্ন স্বরে বললেন, 'শুতে যান।'

'স্যর?'

মস্ত লোকটি আবার বললেন, 'বলেছি, শুতে যান।'

হতভম্ব হয়ে নক্স তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে, ধীর পদক্ষেপে চুপ করে চলে গেলেন। ছড়ানো, কোলাহলে ভরা ছাউনির মধ্যে দিয়ে সর্বাধিনায়ক হাঁটতে শুরু করলেন। লম্বা লম্বা মাপা মাপা পা ফেলে, মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে, ধীরে ধীরেই তিনি হাঁটছেন—ধূসর পাণ্ডুর চোখ একটু খোলা, অনেকগুলো আগুনের শিখা তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে কি হচ্ছে না। লম্বা হাত ত্বখানা পাশে ঝুলছে এবং যদিও তিনি সোজা সামনের দিকে তাকিয়েই হাঁটছেন, চারপাশের হাজারো কাজকর্মের সম্পর্কে তিনি সচেতন—তিনি কাছে আসতেই যে কথার গুঞ্জন ফিসফিসানিতে পর্যবসিত হল. হাস্যমুখর মানুষের দলগুলো আবার যারা হাসছে না তারাও, অভিযোগ অনুযোগ, বিষণ্ন নির্জনতায় ভরা ডাচ, স্কচ এবং ওয়েল্‌স্ গানের সুর, জার্সির প্রত্যন্ত প্রদেশে যেগুলো শতাব্দী ব্যেপেই বেঁচে রয়েছে, পাঁচ শতাব্দী ধরে যে মূল ভূখণ্ডে সেগুলো পাওয়া হয়েছে ঠিক তেমনই; চোখে পড়ল বিশৃঙ্খলা, ছেঁড়াখোঁড়া তাঁবু, গাঁয়ের মোটাসোটা স্ত্রীলোকেরা—এরা হি হি করে হেসে তাঁর কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করছে, শুয়োরগুলো আবর্জনার স্তূপে নাক গুঁজে রয়েছে। সৈনিকেরা অবশ্য আবর্জনার স্তূপ যেখানে-সেখানেই জমিয়েছে—সেগুলোর ব্যবস্থা করার কোন চেষ্টাই করেনি; গাদা-করা বন্দুক এবং এমন মরচে-ধরা বেয়নেট যে সেগুলোকে গলিয়েই নল থেকে বের করা যাবে; হাড়সার কয়েকটি ঘোড়া ক্যাঁচকোঁচ করে খাবারের গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে; খাবার এবং গোলাবারুদের অরক্ষিত স্তূপ।

হাঁটতে হাঁটতেই গত কয়েকদিনের মনের খুশি তাঁর উবে গেল, কেমন যেন তুর্ঘটনার আশঙ্কায় ভরে গেল মন। অবিরাম সংস্পর্শে থাকলেই তিনি শুধু ভুলতে পারতেন কি ধরনের বাহিনীর তিনি নায়ক। তু-এক দিন সরে গেলেই নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পান, এই এখন যেমন দেখছেন। তাঁকে তখন

চেপে ধরে সেই পুরনো ভয়াবহ হতাশা। নিজেকেই নিজে বলেন যে নক্স বা অন্য কাউকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। তাঁরা তো প্রাণপণে করেছেন। তাঁরা বীর, তাঁরা সাহসী—হ্যাঁ, বীর তাঁরা, যদিও সে বীরত্ব ভার্জিনিয়ার ভদ্রলোকের নয়, দোকানদার এবং কারিগরদের হাস্যকর ভাঁড়ামি।

তাঁবুতে ফিরে গিয়ে, দুটো দপদপে বাতির আলোয়, স্ত্রীকে চিঠি লিখতে বসলেন। কিন্তু কাগজ খুলে বসে, কালিতে কলম ডুবিয়েই হঠাৎ-আসা জ্বরের মতো গৃহকাতরতার ঢেউ এসে লাগল বুকে। এমন হঠাৎ এল, এমন করে সব মন ব্যেপে, এমন তীব্র যে, কলম ছেড়ে দিয়ে হাতে মুখ ঢেকে তিনি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। আঙুলের ফাঁক দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে। সারা আন্তর সত্তা তীব্র কাতরতায় মাউন্ট ভার্ননের ওপর নিবদ্ধ। আগে কখনও কিছু না চাইলেও, সেই মুহূর্তে মন চাইল বাড়ি যেতে। যে রকম জীবনের জন্যে তিনি তৈরি হয়েছিলেন, চাষীর আর শেয়ালশিকারীর তারই জন্যে। সকালে উঠে, রান্নাঘরে একা প্রাতরাশ খেয়ে, সঙ্গে দু-তিন কাপ কড়া চা, রাতের পড়া শিশিরে তখনও ভিজে মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতেন। অবজ্ঞায় আবার প্রীত মনে গুটিচিহ্নিত কুকুরগুলোকে, কারও দেখাশোনার বাইরে, গাল দিতে দিতে, হয়ত একটা শেয়াল খুঁজে পেয়ে তাকে এক-দু মাইল তাড়া করলেন। সেটা পালাল। কুকুরগুলোর জিব ঝুলতে থাকে, তাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কিছুই আসে না। তিনি বাড়ি ফিরে আসেন প্রাণচঞ্চলতায় ভরপুর হয়ে। মার্থার সঙ্গে দ্বিতীয়বার প্রাতরাশ খান। মার্থা আবার সকালবেলায় একটু খিটখিটে থাকেন, তার মতো সজীব, চঞ্চল থাকেন না। হিসাবপত্রগুলো দেখেন; পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজটি গোপনে গোপনে ভালোবাসেন। গত দু সপ্তাহের জুয়াতে জেতা টাকাগুলোর ওপর লোভে মুগ্ধ হন; শুয়োর বেচা-কেনায় এক প্রতিবেশী তাকে ঠকানোতে মুহূর্তের জন্যে চটেন; অতিথিদের দুপুরের খাওয়ায় নিমন্ত্রণ করেন, মনের মতন কথাবার্তা শোনেন। তারপর ভালো খেয়ে, ভালো ম্যাডীরা পান করে, ভালো ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিতে দিতে, বারান্দায় ঘুরে বেড়িয়ে ঘন্টাখানেক রাজনীতি করে আবার মাঠে বেরিয়ে যান এবং সন্ধ্যার খাবারের জন্যে জামাজোড়া ছাড়বার আগে ঘন্টা দুই তাস চলে। সাধারণ মানুষ যেমন বাঁচে, বেশ সহজেও নয় আবার খুব কষ্টেও নয়—সেটা তাঁর একটি সগৌরব অভিযানের কামনার সঙ্গে এবং সন্তোষের সঙ্গে খাপ খায় না।

হাতে মুখ রেখে অনেকক্ষণ তিনি বসে রইলেন।

হ্যাকেনস্যাকে পৌঁছবার পর তৃতীয় দিন বিকেলবেলায়, মুখে ফেনা-ওঠা হাঁপাতে-থাকা একটি ঘোড়ায় চড়ে ফোর্ট লী থেকে এক বার্তাবহ ছাউনিতে এসে উপস্থিত। সে খবর এনেছে যে ব্রিটিশেরা ফোর্ট ওয়াশিংটন আক্রমণ করেছে এবং জেনারেল গ্রীন মনে করেন যে পরিস্থিতিটা জেনারেল ওয়াশিংটনকে জানানো দরকার।

মস্ত লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, 'পরিস্থিতিটি কি?'

'বেশ ভালোই বলতে হবে, স্যর। বাহিনীর মধ্যে উৎসাহ খুব। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ইতিমধ্যেই তারা ব্রিটিশদের বেশ মার দিয়েছে।'

হি হি করে হাসতে-থাকা, ঘর্মাক্ত লোকটির দিকে এক মুহূর্ত একদৃষ্টে চেয়ে মস্ত লোকটি আচমকা লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘোড়ার কাছে গিয়ে, চড়ে, ধীর গতিতে প্যালিসেড পাহাড়ের শ্রেণীর দিকে চলে গেলেন। মানহাট্টান দ্বীপ আর হাডসন নদী যেখান থেকে দেখা যায় চূড়ার সেই কিনারায় যখন তিনি পৌঁছলেন তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। ফোর্ট ওয়াশিংটনের দিক থেকে মাঝে মাঝে কামানের গর্জন শোনা যাচ্ছে আর অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে আলোকের ছোট ছোট শিখা। সাধারণ আক্রমণের মতো নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে না। বন্দুকের আওয়াজও কিছু কানে আসে না।

ফোর্ট লীর ভারপ্রাপ্ত মেজর গ্যালোওয়েকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'জেনারেল গ্রীন কোথায়?'

'নদীর ওপারে, স্যর।'

'আর জেনারেল পাট্‌নাম?'

'তিনিও ফোর্ট ওয়াশিংটনে, স্যর।'

প্রায় মিনিট পনের মস্ত লোকটি পায়চারি করতে থাকেন, উদ্বেগে অস্বস্তিতে বারে বারে পকেট ঘড়ির দিকে চেয়ে, হাডসনের ওপার থেকে কোন শব্দ শোনবার আশায় কান খাড়া করে, আর দেখবার চেষ্টাতেও যে ওখানে যুদ্ধ হচ্ছে, না, যুদ্ধ হচ্ছে না। আর তাঁর ধৈর্যের বাঁধ রইল না। মেজরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘাটে কোন নৌকো আছে?'

'মনে হয় আছে, স্যর।'

'তাহলে একজনকে কাউকে দিন আমাকে আলো নিয়ে পথ দেখাবে। আমি ওপারে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা স্যর, যদি উচিত মনে করেন।'

'নিকুচি করেছে, মেজর! আমার কাজের ঔচিত্য নিয়ে সন্দেহ করার

আপনার কোন দরকার আছে বলে মনে করি না।'

নম্রভাবে, আস্তে আস্তে গিয়ে, স্থানীয় বাহিনীর একজনকে নিয়ে এলেন। তার হাতে জ্বলন্ত মশাল। সেই লাল কম্পমান আলোয় মস্ত লোকটি চড়াই ভেঙে হোঁচোট খেতে খেতে, আঁকাবাঁকা পথেঘাটে উপস্থিত হয়ে, একজন ঘুমন্ত মাঝিকে ডেকে তুলে, নৌকোর পেছনে এসে উঠে, নিজেই তীর থেকে সেখানাকে ঠেলে দিলেন। বসলেন এবং দাঁড় যখন জলে পড়ল মাঝির প্রতি গর্জন করে উঠলেন, 'উচ্ছন্নে যাও। জোরে বাও।'

নদীর মাঝামাঝি গিয়ে ভার্জিনিয়ান দাঁড়ের তলার কিচকিচ শব্দ আর জলের ছপছপানি শুনে হেঁকে উঠলেন, 'কে ওখানে?'

'আমেরিকান।'

তাঁর নিজের মাঝি প্রত্যুত্তরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমেরিকান।'

'এই, কে ওখানে?'

ভার্জিনিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন, 'ন্যাথানিয়েল না কি?'

দুখানা নৌকো একসঙ্গে ভেসে চলে। দাঁড়িরা বাণ মাছ ধরে। মস্ত লোকটি জেনারেল গ্রীন আর জেনারেল পাট্‌নামকে এইবারে ভালো করে দেখতে পান। ঈষৎ তিক্ত, বলিচিহ্নিত মুখে পাট্‌নাম মাথা নেড়ে অভিবাদন করেন আর গ্রীন বেশ আনন্দেই হিহি করে হেসে, নৌকোর ওপর দিয়ে অধিনায়কের করমর্দন করবার জন্যে হাত বাড়ান। বলেন, 'আপনাকে দেখে আনন্দ হল, স্যর, ভীষণ আনন্দ হল।'

অধৈর্যে ভার্জিনিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওখানে কি ঘটেছে? ব্রিটিশেরা আক্রমণ করেছে?'

'এখনও করেনি, স্যর, এখনও করেনি। এই একটা দুটো গোলা দাগছে আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে আর আমরাও তাই করতে এক-আধবার গোলা ছুঁড়ছি। না, আক্রমণ করেনি, স্যর। একটু শুনুন স্যর, ব্যাপারটা গৌরবের বিষয়, সত্যিই গৌরবের। হো ম্যাগর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন আত্মসমর্পণ করবেন কি না জিজ্ঞাসা করতে। জানেন তো ওরা কেমন টেনে টেনে কথা বলে আর নাকের দিকে তাকায়। বললে কিঃ 'স্যর, কর্নেল ম্যাগ, জেনারেল হো আত্মসমর্পণের জন্য সদয় এবং ভদ্র সর্তই পাঠিয়েছেন। কিন্তু যদি তাঁকে জোর করে জায়গাটা দখল করতে হয়, আক্রমণ করতে হয়, আপনাদের দুর্গ যদি আক্রমণ করতে হয়—''

'বলে যাও, ন্যাথানিয়েল।'

''যদি তাঁকে জোর করে জায়গাটা দখল করতে হয় তাহলে তিনি তাঁর

লোকেদের বাড়াবাড়ি করা থেকে সামলাতে পারবেন না। 'আক্রমণ ?' ঠিক অমনি করে নাকের নীচে তাকিয়ে ম্যাগ উত্তর দিলেন। সত্যিই স্যর, ম্যাগ বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি না যে মহামান্য তিনি এমন কাজ করবেন যা তাঁর নিজের পক্ষেই অনুপযুক্ত, ব্রিটিশ জাতির পক্ষেও।' তারপর স্যর, ম্যাগ বললেন, 'কিন্তু মহামান্য তাঁকে দয়া করে বলবেন যে, এ পর্যন্ত যে সব কারণে মানুষ যুদ্ধ করেছে সেগুলোর মধ্যে মহত্তম কারণেই আমি, আমাদের শেষ সৈনিকটি থাকা পর্যন্ত এই জায়গা রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প—শেষ সৈনিকটি থাকা পর্যন্ত। মহামান্যবরকে এই কথা জানিয়ে দেবেন।"

ভার্জিনিয়ান নিম্নস্বরে বললেন, 'ম্যাগ যে এমন অলংকার দিয়ে কথা বলতে পারে তা তো আমার কখনও মনে হয়নি।'

'কিন্তু গৌরবের নয় কি, স্যর ? যে ইতিহাস আমরা তৈরি করছি তা যখন সমাপ্ত হবে তখন আমি নক্সের কাছে এই কথাগুলো লিখে পাঠিয়ে দেব।'

পাট্‌নাম একটু কেশে উঠলেন ; শেয়ালশিকারী বললেন, 'ও অলংকার-টার কিছুক্ষণ ছেড়ে দিয়ে দুর্গটা সম্পর্কে আমাকে বল। আমি—আমি অস্বস্তিতে—'

'না স্যর, দয়া করে অস্বস্তি বোধ করবেন না ; সব ঠিক আছে। এইবার আমরা ওদের হাতে পেয়েছি। ওদের এবার মাথা ঠুকে ঠুকে মাথা ভেঙে চুরমার করতে হবে। আমি বলছি স্যর, যে মোড় ঘোরবার আশা আমরা করছিলাম সেটি এসেছে।'

ভার্জিনিয়ান ক্লান্তভাবে মাথা নাড়লেন কিন্তু পাট্‌নাম বললেন, 'আমার মনে হয় ন্যাথানিয়েল ঠিকই বলেছে, স্যর।'

শেয়ালশিকারী বিড়বিড় করে বললেন, 'আগে পশ্চাদপসরণ করেছি কিন্তু এখান থেকে পশ্চাদপসরণের পথ নেই। ফোর্টের বাহিনীতে কতজন লোক আছে ?'

'এর মধ্যে হাজার তিনেক জমে গিয়েছে। এবারে ওরাই পশ্চাদপসরণ করবে, আমরা নয়। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, স্যর।'

ঘাড় ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, 'দেখা যাবে, ন্যাথানিয়েল। আমি আজ রাতেই পার হয়ে যাব মনে করেছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে—। মাঝিরা, জার্সিতে ফিরে চল।' চুপ করে জড়োসড়ো হয়ে নৌকোতে বসলেন। নৌকো গিয়ে প্যালিসেড পাহাড়গুলোর নীচে ঘাটে এসে লাগল।

উত্তর মানহাট্টান দ্বীপের যে ছোট্ট ফালি স্থানটুকু তার ভূগোল জটিলও

নয়, বোঝাও শক্ত নয়। ফালিটা এক মাইলের চেয়েও কম চওড়া এবং যেখানে আরও বিস্তৃত হয়ে প্রধান অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেই উত্তরের বিন্দু থেকে এই পর্যন্ত চার মাইলের বেশী নয়। আমেরিকার অদ্ভুত নামকরণে এটাকে বলা হয় 'প্যানহ্যাণ্ড্‌ল্‌' বা প্যানের হাতল।

এই প্যানহ্যাণ্ড্‌ল্‌টি রক্ষার ব্যাপারটা শেয়ালশিকারীর কাছে স্পষ্ট, গ্রীনের কাছে, নক্সের কাছে, ম্যাগর কাছে—এমন কি যে কোন সখের সৈনিকদের কাছেও যারা এমন বেপরোয়াভাবে মানহাট্টানের একটু টুকরোও ধরে রাখতে চেয়েছে। শুধু স্পষ্ট নয়, লোভনীয়ও। স্থানটি যেন রক্ষা করার জন্যেই তৈরী; শেষ রক্ষার জন্যে দাঁড়াবার স্থান হিসেবেই যেন পূর্বনির্দিষ্ট। এটা যেন টলে-পড়া পরাজিত বিপ্লবীদের চেঁচিয়ে বলছেঃ

'আমার বুকে এসে নিশান উড়িয়ে দাও; যতক্ষণ একটা লোকও বেঁচে থাকবে আমি তোমাদের পাশে আছি।'

কিন্তু মনের গভীরে তারা জানত তাদের এই যুদ্ধ করার চেষ্টা ব্যর্থ। অফিসারেরা এবং তাদের অধস্তনেরা আর পালাতে চাইছিল না; তারা এমন একটা জায়গা খুঁজছিল যেখানে দাঁড়িয়ে তারা এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে যুদ্ধ করতে পারে সে আশা ব্যর্থ জেনেও সেইটিই ছিল তাদের একমাত্র ভরসা। তারা বদলা নিতে চায়; তারা ফিরে আঘাত করতে চায়; তাদের মন বলেঃ

'উচ্ছন্নে যা তোরা, এসে আমাকে ধর্‌ না! এই তো আমি! ইচ্ছে করলেও আমি ছুটে পালাতে পারি না, কিন্তু তোদের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্যে দাম দিতে হবে! যে পাহাড়ে উঠবি সেই পাহাড়ই তোদের রক্তে পিছল হবে। ব্যাপারটা সহজ হবে না। দ্বিতীয়বার ব্রুকলিন বা নিউ ইয়র্ক বা হোয়াইট প্লেন্‌স্‌ হবে না। নেকড়েকে যদি ধরতে চাস গুহার মধ্যে থেকে তাকে খুঁড়ে বার কর্‌! এক দিনেও পারবি না, এক সপ্তাহেও পারবি না, এক মাসেও পারবি না।'

তাদের চিন্তা এই খাতেই চলতে থাকে, তাদের সঙ্কল্পও। পালানো তো অনেক হয়েছে। তাদের মধ্যে হাজার তিনেক বন্দুক গেছে, নরক জমে যাওয়া পর্যন্ত প্যানহ্যাণ্ড্‌ল্‌কে রক্ষে করার জন্য প্রস্তুত হল।

যে ফাঁপা পথটা মানহাট্টানে আমেরিকান বাহিনীর ব্যূহ রচনার স্থান ছিল এবং যেটা দ্বীপের উত্তর বিন্দু থেকে মাইল পাঁচেক দূরে সেইখান থেকেই শুরু হয়ে চড়াই চলেছে মাইল তিনেক এবং তারপর দুটি শৈল-শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গিয়ে, একটি চলেছে হাডসনের তীর ধরে আর একটি চলেছে হার্লেম নদীর তীর ধরে। এই শৈলশ্রেণী দুটির উচ্চতা প্রায় একই, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক শো ফুট উঁচু। আর প্রত্যেকটারই এবড়োখেবড়ো

পাথুরে খাড়া উতরাই, এবং তাদের মাঝখান দিয়ে জমি সোজা নেমে গিয়েছে স্পিউটেন ডোয়াইভিল ক্রীক পর্যন্ত—ক্ষীণ জলধারা হার্লেম আর হাডসন নদীকে যুক্ত করেছে। দুটি শৈলশ্রেণী প্যানহ্যাণ্ড্‌লের শেষ পর্যন্ত এগোয়নি, জলধারার ঠিক এক মাইল দক্ষিণে হঠাৎ থেমে গিয়েছে। এই জায়গাতে প্যানহ্যাণ্ড্‌লের ওপর দিয়ে একটা গভীর খাত বয়ে গিয়েছে। উত্তরে তৃতীয় আর একটা পাহাড়, উচ্চতায় প্রায় অন্য দুটিরই মতো।

প্রতিরক্ষার দিক থেকে পাহাড় তিনটি অতি চমৎকার, তবু প্রত্যেকটিরই একটা ভীষণ ত্রুটি—একটি যদি যায় অন্য দুটিকেও আর রাখা যাবে না। দুর্গটি শেয়ালশিকারীর নামে চিহ্নিত। একটি অখ্যাত প্রাদেশিক রাজনৈতিক সঙ্ঘের এক অখ্যাত চাষীকে দেওয়া একক অপূর্ব সম্মান এই নামকরণ। দুর্গটি হাডসন নদীর সেতুর ওপরে অবস্থিত, পাথরের তৈরী একটি ছোট্ট কাঠামো; তাতে বড়জোর দুশো কি তিনশো লোক মোটামুটি আরামে থাকতে পারে। নদীর ওপারে ফোর্ট লী থেকে যেমন একটি খাড়া পাথুরে উতরাই নেমে গিয়েছে এখানেও তেমনি ঐরকম একটি পথ নেমে গিয়েছে নীচের ঘাট পর্যন্ত। কর্নেল ম্যাগর ওপর ভার ছিল এই দুর্গটি রক্ষা করবার। তিনি বুঝেছিলেন যে ফোর্ট ওয়াশিংটনকে বাঁচানো, এবং শুধু সেই দুর্গটিকেই বাঁচানো কি কঠিন কাজ হয়ে উঠবে। এই পাথরের দুর্গের ভিতর থেকে দুশো কি তিনশো দৃঢ়চিত্ত লোক দু-এক সপ্তাহের জন্যে এটিকে বাঁচাতে পারে, কিন্তু অবরুদ্ধ এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা আজই হোক কালই হোক অনাহারে পর্যুদস্ত হবে। এবং সর্বক্ষণই অন্য দুটি পাহাড়ের ওপরে বসানো কামানের গোলায় নিষ্পিষ্ট হবে। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত ভার্জিনিয়ান যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে নিউ ইয়র্ক থেকে ব্রিটিশদের সমুদ্র পর্যন্ত তাড়িয়ে না দিতে পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত ম্যাগ এই সমগ্র প্যানহ্যাণ্ড্‌ল্ অঞ্চলটিকে রক্ষা করবার একটি মস্ত পরিকল্পনা করেছেন। এটা করেছেন অবশ্য সব জেনে এবং বিশেষ করে দুর্গের ত্রুটিগুলোর কথা জেনেই। তিনি গ্রীন এবং পাট্‌নামের সঙ্গে কথা বলে তাঁদেরও নিজের মতে এনেছেন এবং উত্তর মানহাট্টানে আরও বেশী বেশী সৈনিক তাঁদের দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।

যে রাত্রে গ্রীন এবং পাট্‌নাম হাডসন নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই রাত্রে ম্যাগর অধীন তিন হাজার সৈনিক ছিল এবং সৈনিকদের রক্ষাব্যূহের ঠিক ঠিক জায়গায় ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছিল। দুই সেনাপতির সামনে একখানি মানচিত্র মেলে ধরে তিনি সোল্লাসে একটির পর একটি অবস্থান চিহ্নিত করছিলেন এবং এতটুকু কোথাও ফাঁক আছে কি না তাঁদের ধরতে

বলছিলেন।

প্যানহ্যাণ্ড্‌লের ওপর আঙুল টেনে, প্রায় দু মাইল দক্ষিণে একটি স্থান দেখিয়ে বললেন, 'এইখানে পেনসিলভ্যানিয়ানেরা, শ আষ্টেক। গলদা-চিংড়িরা দক্ষিণ থেকে আসুক না। তাদের খুশীতে স্বাগত জানাব।'

ম্যাগ মানুষটি দেখতে ছোট; চোখ দুটি বেরিয়ে আসছে। গাল দুটি গোল। ভাগ্যে কি আছে যেন তিনিই জানেন, এই ধারণা। স্পিউটেন ডোয়াইভিলকে দেখা যায় যে পাহাড়টা থেকে সেইদিকে নির্দেশ করে বলে চললেন, 'আর এইখানে আছে মেরীল্যাণ্ডের লোকেরা—রাইফেলধারী,' ব্যাখ্যা করলেন, 'যেন এঁরা সেটা জানতেন না। হার্লেমের ওপরে ব্যাক্সটার, স্থানীয় বাহিনী নিয়ে। তবে ওরা কোনমতেই ওপথে আসবে না। মনে হয় সব দিকই রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।'

'কেউ সব দিক বাঁচাতে পারে না,' তিক্ততায় বললেন পাট্‌নাম।

আর গ্রীন মন্তব্য করলেন, 'যদি আমরা না পালাই তবেই তো রক্ষে।'

শেয়ালশিকারীর মনে হচ্ছে তিনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। হিমেল সকালে উঠেছেন, সারা অঙ্গে অস্বস্তি, এখানে-ওখানে ব্যথা আর যন্ত্রণা নিয়ে; বাঁ হাত তুলতে গিয়ে দেখেন জোড়ের কাছে মড়মড় করছে, ভীষণ জ্বালাকর যন্ত্রণা। বাড়িতে থাকলে মার্থা তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ঘাড় ডলতে আরম্ভ করত ভালুকের চর্বি দিয়ে, কিন্তু এখানে এই যন্ত্রণাকে অস্বীকার করার ভান করতে হল। বিলি উপস্থিত থাকলে সেই নিগ্রোটার কাছেও দুঃখের কথা বলতে পারতেন; কিন্তু বিলি হ্যাকেনস্যাকে। এই সমগ্র বাহিনীর সামনে দিয়ে তাঁর পক্ষে উলঙ্গ হয়ে হেঁটে যাওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি অসম্ভব একজন আর্দালীকে ডেকে ঘাড় ডলে দিতে বলা।

যেমন-তেমন করে পোশাক-আশাক পরে নিয়ে, লম্বা উলসি অন্তর্বাস পরে খালি পায়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে, জামাজোড়া টেনে-টুনে ঠিক করতে করতে, কালো লংবুটের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে, হাতে শার্ট আর কোট ঢোকাতে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। দাড়ি কামানোটা যাচ্ছেতাই রকমের হল। যাই করুন-না কেন মনে হল দাড়ি কামানো হয়নি। তাঁবু থেকে বেরোবার সময় সোজা দাঁড়াতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল।

আলো তখনও তেমন ফোটেনি তবু গ্রীন, পাট্‌নাম এবং মাস'ার সজ্জিত হয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন; এবং এই ভেবে তাঁর মনে একটু সন্তোষ এল যে, তাঁরাও তাঁর চেয়ে ভালো করে ঘুমোতে পারেননি। এই ভেবে তাঁর বিবেক এত ক্লিষ্ট হচ্ছে যে তাঁর মনে এত রকমের ভয় অথচ তাঁর লোক-

জন এত সাহসী, এমন বীর, কখনও মৃত্যুর বা বিকলাঙ্গ হবার ভয়ে বিব্রত নয়। এঁদের সঙ্গে প্রাতরাশে বসলেন কিন্তু সারাক্ষণ কিছু বললেন না। প্লেট থেকে প্রায় চোখই তুললেন না। জানতেন যে কিছু বলতে হলেই সেটা হবে হাডসনের ওপারে ঐ তিন হাজার লোকের বিষয়েই দুশ্চিন্তা আর নানা অনুমান। তাই মানহাট্টানের দিকে পেছন ফিরে তিনি ছাউনিতে টেবিলেই বসে রইলেন এবং সারাক্ষণই পেছন ফিরে তাকাবার ইচ্ছা দমন করে রাখলেন; অবশ্য ভালোই জানতেন যে, মানহাট্টানের তীর এখন কুয়াশায় ঢাকা। তাঁর স্তব্ধতা কেমন যেন অন্যদের কথাবার্তাতেও বাধা ঘটাল। মার্সার অবশ্য বেশী কথা কখনও বলেন না। তিনি বিশেষ কিছুই বললেন না। পাট্‌নামের হলদেটে ফুলো ফুলো মুখ। লিভারে যন্ত্রণা হচ্ছে বলে বিষণ্ণ অভিযোগ করলেন। খাওয়া প্রায় শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে মার্সার মন্তব্য করলেন, 'দেখুন স্যর, কুয়াশা কেটে যাচ্ছে।'

মস্ত মানুষটি স্বীকার করলেন, 'সাধারণতঃ তাই হয়। পেছন দিকে ফিরে তাকাবার লোভ আবার তিনি সংবরণ করলেন।

গ্রীন সদর্পে জোর দিয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'পতাকা উড়ছে।' পতাকাটি পুরনো ছিন্নভিন্ন, র‍্যাট্‌লস্নেক রঙের নিশান; নীলচে লাল রং করা হয়েছে। কিন্তু ম্যাগর এটি নিয়ে বিশেষ গর্ব। দিব্যি করে তিনি বললেন যে ওর কাপড়টা পচে যাওয়া পর্যন্ত তিনি ওটি মাস্তুলে ওড়াবেন।

ম্যাগ সসম্মানে চুপ করে রইলেন। সেই অদ্ভুত বাহিনীতে তিনি একটি অদ্ভুততম চরিত্র। শীর্ণ স্কচম্যান, সৈনিকের কাজই তাঁর বৃত্তি। তিনি কথা বলেন না। বেশীর ভাগ সময়ই বিষণ্ণ কিন্তু তাঁর অন্তরে অন্তরে বিপ্লবের আগুন জ্বলছে। তিনি কখনও স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি চলতি বুলি ব্যবহার করতেন না। তাঁর উদ্দেশ্য কখনও কথায় প্রকাশ পেত না। তাঁর চিন্তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় শুধু তাঁর ধূসর চোখের এক রকম দীপ্তিতে।

প্রাতরাশের পর সর্বাধিনায়ক ইচ্ছা করেই তাঁবুর মধ্যে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পর্যবেক্ষণ করতে করতে এটা-সেটায় দোষ ধরতে ধরতে চললেন। এটা কিছুই শক্ত কাজ নয়। দুজন ক্যাপ্টেন এবং একজন লেফটেনান্টকে তিক্ত ভাষায় গালাগালি করলেন—তারা তিনদিন দাড়ি কামায়নি বলে। এইভাবে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে এসে হাডসন নদীর অপর তীরে দৃষ্টিপাত করলেন। গ্রীন অপেক্ষা করছিলেন, একটি ছোট দূরবীন তাঁর হাতে তুলে দিলেন। সেটাকে নিশানা করবার জন্যে মস্ত লোকটিকে হাত স্থির রাখবার জন্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে হল। কাঁচের

মধ্যে দিয়ে একটি পুতুলের জগৎ জীবন্ত হয়ে উঠল—ছোট্ট তারার মতো দুর্গটি, রোদ্দুরে পতাকাটি পতপত করছে, মানুষগুলো ছোট্ট ছোট্ট। সব-কিছু এমন নিরাপদ আর সুশৃঙ্খল মনে হচ্ছে যে এই তিনদিনের মধ্যে প্রথম মনে একটু স্বস্তি পেলেন তিনি।

'দুর্গটি বেশ, স্যর, বিশ্বাস করুন,' গ্রীন বললেন।

মস্ত লোকটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে দূরবীনের মধ্যে দিয়ে দেখতেই থাকলেন।

বেলা এগারোটা বাজলো তবু ব্রিটিশদের আক্রমণের কোন চিহ্ন নেই। ভার্জিনিয়ানের মনে হল যে জলের মাইলখানেক এদিকে কেবল শুধু দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা আর পর্যবেক্ষণ করলে তিনি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারবেন না।

জানতেন যে দুর্গে তাঁর উপস্থিতি কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ করবে না, তবু তাঁকে কোনরকম কাজ তো করতে হবেই। না ভেবেচিন্তেই গ্রীনকে বললেন, 'মনে হয় ন্যাথানিয়েল, আমাদের ওখানে গিয়ে দেখা উচিত কি রকম ঘটনা ঘটছে।'

'বেশ তো স্যর। আপনি খুশি হবেন। জেনারেল পাট্‌নামকে চাই?'

'ওঁর ইচ্ছে হলে আসুন।'

ঘাটে যাবার পথে তাঁদের সঙ্গে মার্সার যোগ দিলেন। বিষাদে বললেন যে তিনি একাই কি এপার থেকে 'ছোট্ট' ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করবেন।'

'জেনারেল, আপনি আসতে পারেন। এখানে কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না।'

প্যালিসেড শ্রেণীর পাদদেশে এসে তাঁরা নৌকোয় উঠলেন। দাঁড়ে দুজন মার্বেলহেডের লোক, চারজন সেনাপতিকে পার করতে বেশ অভিভূত হয়ে পড়ল, দাঁড় বাইল জোরে, কান খাড়া করে রইল দু-চারটে কথার জন্যে যা পরে গল্প করা যাবে। কিন্তু তারা পেল শুধু পাট্‌নামের চাপা ক্লান্ত অভিযোগ নিজের লিভার সম্পর্কে আর মার্সারের কাছে স্কটল্যাণ্ডের এক পুরনো মুষ্টিযোগের কথা। সেটি হল: এক কাপ বার্লি, ভেড়ার খুরের রস আর চার আঙুল প্রমাণ হুইস্কি—এই কটিকে তিন ভাগে ভাগ করে তিনবার খেতে হবে। লিভারের জন্যে নাকি খুব ভালো। গ্রীন কিছুই বললেন না আর সর্বাধিনায়কের চোখ স্থির হয়ে আছে মানহাট্টানের তীররেখায়।

যখন নদীটি তাঁরা অর্ধেক পার হয়েছেন তখন কামানের গোলার প্রচণ্ড শব্দ বাতাস মথিত করে দিল—যেন নদীর সারা তীর ধরে একটাই বিশাল বিস্তৃত বাজ পড়ছে।

গ্রীন চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এই শুরু করল এরা!' মস্ত লোকটি মাঝিদের বকে ওঠেন, 'উচ্ছন্নে যা সব! দাঁড় বাইতে পারছিস না?'

ওরা অবিচলিত স্বরে উত্তর দিল, 'দাঁড় তো আমরা বাইছি।'

নৌকো চড়ায় ঠেকতেই ভার্জিনিয়ান জলে লাফিয়ে পড়ে, সকলকে নিয়ে চড়াই ভেঙে চললেন দুর্গের পথে। অর্ধেক পথ উঠতেই তাঁর বুক ধড়ফড় করে ওঠে, হাঁপাতে থাকেন; জোর করে ধীরে চলেন; বোঝেন যে দুর্গে যখন উপস্থিত হবেন তখন তাঁর বাহ্যিক আকৃতি শান্ত, অবিচলিত থাকা দরকার। দুর্গের কাছাকাছি আসতেই, ম্যাগ হাসতে হাসতে, অভিবাদন করতে করতে লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন তাঁকে এগিয়ে এসে নিয়ে যেতে। গুম গুম কামানের আওয়াজের ওপর দিয়ে যাতে শোনা যায় এমন জোর গলায় বললেন, 'ঐ তো স্যর, ওরা আরম্ভ করেছে!'

'আমি দেখতে পাচ্ছি, কর্নেল। তোমার লোকেরা ঠিক সামলাচ্ছে তো?'

'ঈশ্বরের দোহাই, স্যর, ওরা শেষের দিন পর্যন্ত রুখবে। অবশ্য দুর্গের ওপর এখনও গোলাবর্ষণ শুরু হয়নি, যদি বলতে দেন তো বলি 'আপনার দুর্গ', স্বাস্থ্যপানের মতো আর কি। বাইরের রক্ষাব্যূহের ওপর এখন আঘাত করছে কিন্তু ঐ দুটো পাহাড়কে উড়িয়ে দিতে অনেক সময় লাগবে। বেশী দামে জীবন দিতে আমরা রাজী, আমাদের প্রত্যেকে—শেষ লোকটি পর্যন্ত।'

ওয়াশিংটন ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'আমি জীবন বেচতে চাই না—চাই দুর্গটা বাঁচানো হোক।'

'বাঁচানো হবে, স্যর।'

'আমি চাই, ঐ ঘাটটায় নামবার উৎরাইটা বেশ ভালো করে রক্ষা করা হোক—ফোর্ট লীর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও বটে, আবার প্রয়োজন হলে পশ্চাদপসরণের রাস্তা হিসেবেও বটে।'

'তার দরকার হবে না, স্যর!'

'তবু, কর্নেল ম্যাগ, ঐ পথটি মুক্ত রাখবার প্রয়োজনীয়তাটা আপনি বুঝুন। আজ রাত্রে, অন্ধকার নামলে, যদি দেখা যায় যুদ্ধ আমাদের বিশেষ অনুকূলে যাচ্ছে না তাহলে আরও লোকবলের জন্যে আপনি আমাকে বলে পাঠাতে পারেন।'

ম্যাগ বড় বড় কথা না বলে পারলেন না: 'বিশ্বাস করুন স্যর, আমার একটিমাত্র বাসনাই হল ওদের এমন একটা ধাক্কা দেওয়া যে ওরা টলতে

টলতে নিউ ইয়র্ক থেকে বেরিয়ে যাবে, মুক্ত হবে আমাদের প্রাণের দেশ ওদের উপস্থিতি থেকে।'

পাট্‌নাম বললেন, 'হায় ঈশ্বর, এ যে নক্সের চেয়েও খারাপ কথা বলে!'

ভার্জিনিয়ান ঘাড় ঝাঁকিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকে গেলেন, লোকেরা তাঁকে খুশিতে অভিনন্দন জানাল। এরা বেশীর ভাগই দক্ষিণের লোক—চিৎকার করে বলতে থাকে যে ঐ হতচ্ছাড়া ইয়াংকিদের বদলে তাদের একটা সুযোগ দেবার সময় এসেছে। বন্দুক আর টুপি দোলাতে দোলাতে তারা চিৎকার করতে করতে দুর্গপ্রাকারের ওপর নাচতে থাকে।

'এগিয়ে আয় না, শালা গলদারা! এগিয়ে এসে ঠেলাটা নে। এগিয়ে আয় শালার হতচ্ছাড়া গলদারা!'

এ ধরনের ব্যাপার শেয়ালশিকারী ঠিক পছন্দ করছেন না, বিশেষ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যখন নিষ্ঠুর, তিক্ত কাজকর্ম হতে চলেছে। দুর্গটি যে অপরাজেয় এ কথা তাদের নিশ্চিত করে ভাবার কোন কারণ নেই, মনে করার কারণ নেই এটা রক্ষা করা একটা মজার ব্যাপার হবে। ভাবলেন যে এই লোকগুলো অনেকদিন ধরে তাঁর অধিনায়কত্বের বাইরে ছিল কিন্তু বুঝলেন যে এটা নিয়মানুবর্তিতা চালু করবার সময় নয়।

নিজেই উঠে গেলেন দুর্গপ্রাকারে এবং যে দুটি পাহাড়ের ওপর আক্রমণ চলছিল সেই দুটিকে দুরবীন দিয়ে দেখতে লাগলেন। একেবারে তাঁর সোজাসুজি যে পাহাড়টির সম্মুখটি হার্লেম নদীর দিকে, সেইটিতে, বনের মধ্যে দিয়ে লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করলেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ লালকুর্তা বা জার্মানদের সবুজ দেখা যাচ্ছে না। আর উত্তর দিকের পাহাড়টা এত বনাকীর্ণ যে সেখানে কোন যুদ্ধ চলছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। প্যানহ্যাণ্ডলের সমস্ত ঘাড়টা আটশো পেনসিলভ্যানিয়ান দুর্গের যে দক্ষিণ দিক থেকে রক্ষা কররার চেষ্টা করছে, সেইখান থেকে বন্দুকের গুলির বিপুল শব্দ আসছে কিন্তু সেখানেও গাছের আড়ালে সব যুদ্ধটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

মিনিট দশেকও হয়নি তিনি দুর্গপ্রাকারে রয়েছেন এমন সময় গ্রীন উঠে এলেন তাঁর পাশে এবং ভয়ে ভয়ে বললেন, 'স্যর, আমার মনে হয় এখান ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো।'

'কেন?'

'আমার চেয়ে বেশী বিশ্বাস আর কারও নেই এই জায়গাটি রক্ষা করা যায় কিন্তু ওরা যদি নদীতে নামবার ঐ পথটি বিচ্ছিন্ন করে তাহলে এইখানেই

আপনাকে এক সপ্তাহ কি মাসখানেকও থেকে যেতে হতে পারে।'

'যুদ্ধের কিছুটা দেখব বলেই আমি স্থির করেছিলাম, ন্যাথানিয়েল।'

'আপনি যা ভালো বোঝেন, স্যর। আপনি চান তো আমি এখানে থাকব।'

মস্ত লোকটি ঘাড় ঝাঁকালেন। গ্রীন যা বলছেন তা বুদ্ধির কথা। উনি রাজী হয়ে বললেন, 'আমরা সকলে একসঙ্গেই গিয়ে, নদীর ওপারে কিছু খেয়ে নেব। যদি ইচ্ছে হয় রাত্রে আবার ফিরে আসব।'

যাবার আগে ম্যাগের সঙ্গে করমর্দন করলেন। ম্যাগ তাঁর মস্ত হাতখানা আবেগভরে চেপে ধরলেন এবং আবার প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, প্রয়োজন হলে, তিনি ছ'মাস ধরে দুর্গটিকে রক্ষা করবেন।

নৌকোয় উঠতে উঠতে অধিনায়ক ঘাড় ঘুরিয়ে দুর্গের দিকে আবার চাইলেন।

'কি হল, স্যর?' গ্রীন জিজ্ঞাসা করলেন।

'কিছু না।'

আর পাট্নাম বললেন, 'ওরা একেবারে সুনিশ্চিত, একেবারে সুনিশ্চিত।'

দুজন মাঝি ছাড়া আর সকলেই জার্সির দিকে মুখ করে বসে; মাঝিরা জোরে বাইবার কোন হুকুম এবারে না পাওয়ায় আস্তেই নৌকো বাইতে থাকে, লম্বা লম্বা জোর টানে—এখন, এখন, এখন—এই তালে যেন। হঠাৎ তাল ভাঙে। দাঁড় শূন্যে রেখে, অধিনায়কের কাছাকাছি বসা মাঝিটি যে তীর ছেড়ে এসেছে সেই তীরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ফলে, ধীরে ধীরে, শেয়ালশিকারী, গ্রীন, পাট্নাম এবং মার্সারও মুখ ঘোরান। স্রোতে ছেড়ে দেওয়া নৌকো ধারের দিকে ঘুরে যায়। এঁরা কেউ কথা বলেন না। যা দেখেন তা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য। যে জায়গাটা তাঁরা এখনই ছেড়ে এসেছেন সেই ঘাটিটি একদল লালকুর্তার দখলে আর লম্বা এক সারি লাল-কুর্তা চড়াই ভেঙে দুর্গে উঠছে—যে চড়াইয়ের পথটি খোলা রাখতে হবে, খোলা রাখা ছাড়া উপায় নেই—সে যাই ঘটুক না কেন।

হাডসনের মাঝামাঝি আসার একটু আগে নৌকো দুলে উঠল কিন্তু তাঁদের পক্ষে নৌকোটি যথেষ্ট দূরে থাকায় প্যানহ্যাণ্ডলের তটের সমস্তটাই এঁদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে—দক্ষিণ দিক থেকে যে তৃণভূমিগুলো ফোর্ট ওয়াশিং-টনের দিকে চলে গিয়েছে এবং উত্তরে প্রশস্ত পার্বত্য বনাঞ্চল। দামামা বাজাতে বাজাতে আর পতাকা উড়িয়ে যে লালকুর্তার ডিভিজনটা প্রকাণ্ড

খাতটার মধ্যে দিয়ে উঠে আসছে তারা পথটি বিচ্ছিন্ন করার আগেই, উত্তর দিক থেকে লোকেরা গড়িয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড় থেকে সোজা নেমে এসে দুর্গে ঢুকে পড়বার উদ্‌ভ্রান্ত চেষ্টা করছে। মহাদেশীয় সেনারা এখনও জানে না যে ব্রিটিশেরা তাদের ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্ন করেছে—পথটি দখল করেছে, ঘাটটিও।

মস্ত লোকটি হাত বাড়ালেন এবং একজন—কে পরে জানা যায়নি—তাঁর হাতে দুরবীন ধরিয়ে দেয়।

দক্ষিণ দিকে ব্যাপার আরও ভয়ঙ্কর। সেদিকে জার্মানেরা আটশো পেনসিলভ্যানিয়ানকে আক্রমণ করেছে আর তারা ছুটে পালাচ্ছে, তাদের পেছনে জার্মানেরাও ছুটছে। সবুজ পোশাক-পরা মস্ত মস্ত জার্মানগুলো খোলা মাঠ পেয়েছে যেন। যুদ্ধের সব শব্দ ছাপিয়ে তাদের উদ্দণ্ড যুদ্ধহুঙ্কার ভেসে আসছে: 'ইয়ংকি! ইয়ংকি!'

নরকের সব দুরাত্মারা তাদের পেছনে তাড়া করে আসছে এমনি ভাবে ছুটছে পেনসিলভ্যানিয়ানেরা। এদের মধ্যে অনেকেই জার্মান, সাধারণ চাষী গৃহস্থ, অনেক বছর আগে আমেরিকা চলে এসেছে, প্রাশিয়ান প্রেতকে পিছনে ফেলে আসার আশায়। কিন্তু এখানে আবার যে সবুজ-কুর্তা-পরা জার্মানেরা, হাতে লম্বা লম্বা চওড়া বেয়নেট, তিন হাজার মাইল পার হয়ে এসেছে প্রতিশোধ নিতে, চিৎকার করতে করতে পেনসিলভ্যানিয়ানদের পেছনে করছে আঘাত। শুয়োরের মতো শিকে গাঁথছে। নৌকোর ওপর চারজন সেনাপতির পক্ষে এ দৃশ্য এত কাছে, এত সত্য এবং মর্মন্তুদ। ফুট-লাইটে রঙ্গমঞ্চ যেমন আলোকিত হয়ে ওঠে সূর্যালোকে এ দৃশ্য তেমনি আলোকিত। এই নরহত্যা বসে বসে দেখা ছাড়া তাঁরা তো আর কিছুই করতে পারেন না।

আর জার্মানরা যেন জানত যে মহাদেশীয় চারজন সেনাপতি ব্যাপারটা নিরীক্ষণ করছেন। তাদের কাণ্ডটা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পেনসিল-ভ্যানিয়ানদের পাশ থেকে আক্রমণ করা হয়েছে, কেটে কুচি কুচি করা হচ্ছে; গাছে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে। চিৎকার করতে কবতে তারা নদীতে গিয়ে পড়ছে আর জার্মানেরা তীর থেকে ঝুঁকে তাদের কাছ থেকেই গুলি করে মারছে।

পাট্‌নাম শাপমন্যি দিতে আরম্ভ করলেন। তিনি নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে উঠে গর্জন করে ওঠেন, 'বেজন্মা শালারা! ঘৃণ্য বেজন্মা সব! কদর্য খুনে সব! ঈশ্বর তোদের নরকস্থ করুন, নরকে পাঠান, একেবারে নরকে পাঠান!'

হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে গ্রীন কাঁদতে থাকেন ফুঁপিয়ে।

ফিসফিস করে মার্সার বলেন, 'বেচারা খাসা খাসা ছেলেগুলো।'

একজন মার্বেলহেডের জেলে বলে, 'ঈশ্বর আমার আলোর শিখা, ঈশ্বরই আমার রক্ষক, আমি কাকে ভয় করব? ঈশ্বরই আমার জীবনের বল; কাকে আমি ভয় করব? বজ্জাতেরা, এমন কি শত্রুরা আমার ওপর এসে পড়ল খেয়ে ফেলবার জন্যে, তারা হোঁচোট খেয়ে পড়ল—'

শেয়ালশিকারী কিছু বললেন না। তাঁর মুখ এত সাদা হয়ে গিয়েছে যে বসন্তের দাগগুলো যেন অভিশপ্তদের মুখে শাস্তির চিহ্নের মতো ফুটে উঠেছে।

স্রোতের টানে নৌকো ঘুরে গেল, দুলে উঠে কাত হয়ে যায়। সাদা সাদা ঢেউয়ের ওপরের ফেনাগুলো নৌকোয় এসে লাগতে লাগে।

প্যালিসেড পাহাড়ের শ্রেণী, হেমন্তের রঙে রঙীন হয়ে, জ্বলজ্বলে একটা প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিস্তৃত সুন্দর হাডসন নদী সূর্যের আলোয় একেবারে ঝকঝক করছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক এইবার শুরু হল। ম্যাগর সযত্নে পরিকল্পিত বাইরের রক্ষাব্যূহগুলো সব ভেঙে পড়তে শুরু করল এবং মহাদেশীয় সৈনিকেরা ঐ ছোট্ট দুর্গটির দিকে পালাতে লাগল। ওটিতে দুশো কি তিনশোর বেশী লোক ধরে না। উত্তর দিকের খাদের পাথুরে গা আঁকড়ে আঁকড়ে উঠতে থাকে তারা; তৃণভূমিতে ছড়ানো লোকগুলো দক্ষিণ দিকে ছোটে এবং হার্লেম নদীর ধারের পাহাড় ছেড়ে লাইন ভেঙে তারা পালাতে লাগল। নৌকোর আরোহীরা এর কিছুটা দেখতে পেলেন আর কিছুটা চোখের অন্তরালেই রইল; কিন্তু যা ঘটছে তার সমগ্র মর্মঘাতী উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। আরও বেশী বেশী লোক দুর্গে এসে ঢুকতে থাকে, পাঁচশো, হাজার, পনের শো, দু' হাজার। গোরু-ভেড়ার মতো বোঝাই হল তারা—না পারে নড়তে-চড়তে, না পারে বন্দুক তাক করতে, নিজেদের দলের লোকেদের মেরে ফেলতে পারে এই ভয়ে একটা কামানের গোলাও ছুঁড়তে ভয় পাচ্ছে। আরও মহাদেশীয় সৈনিকেরা ঢুকতে থাকে, পাথরের দেয়াল আঁকড়ে আঁকড়ে উঠে।

শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে দুর্গে আর লোক ধরে না। ভীতত্রস্ত বিলম্বিত লোকেরা অন্যদের দেহের চাপে দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছতেই পারছে না—ফলে পড়ে গিয়ে মনুষ্যদেহের আর একটি দ্বিতীয় প্রাচীর তৈরী করছে।

এ হেন অবস্থায় প্রতিরক্ষার প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমেরিকান বাহিনীর

প্রায় তিন হাজার লোক, একটি পাকা কুলের মতো, ব্রিটিশদের হাতে এসে পড়ল। জাল গোটাল। বিজয়ে হাসতে হাসতে জার্মানেরা দক্ষিণ থেকে দল বেঁধে ঢুকল। হালকা পদাতিকেরা পূবদিকের পাহাড়ের চূড়া আক্রমণ করল আর ঘন সারিতে লালকুর্তারা অচঞ্চলভাবে নদীর দিক থেকে মার্চ করে এল। উত্তর থেকে পাহাড়ের বনাঞ্চল পার হয়ে ঘোড়সওয়ারেরা এল—তাদের ঘোড়াগুলো হাঁপাচ্ছে।

আর একটি ঘণ্টায় সব শেষ হয়ে গেল; লালচে-নীল র‍্যাটল্‌স্নেক রঙের পতাকা নামিয়ে ফেলে তার জায়গায় ওড়ানো হল ইউনিয়ন জ্যাক।

মস্ত লোকটি দুরবীন নামিয়ে পাট করে, কর্কশ গলায় ফিসফিস করে মাঝিদের বললেন, 'নৌকো বেয়ে ওপারে—'

গ্রীন তাঁর দিকে তাকাতে পারেন না। সুদর্শন তরুণ কোয়েকারটি জবুথবু হয়ে বলে, দুদিকে হাত দুখানা জ্বলছে—সারা দেহ কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

পাট্‌নাম যেন কত বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। হাতখানা তুললেন, থরথর করে কেঁপে উঠল। কথা বলতে চেষ্টা করলেন, গলা ভেঙে গেল। তিনি শেয়ালশিকারীর দিকে ফিরে তাকাতেই দেখলেন তাঁর মুখে গভীর বেদনায় রেখার পর রেখা পড়েছে।

'আমার দোষ—' তিনি বলবার চেষ্টা করছিলেন।

মুখ তুলে তাকান গ্রীন।

মর্মন্তুদ জোর দিয়ে পাট্‌নাম পুনরুক্তি করেন, 'আমার দোষ।'

গ্রীন ভাঙা ভাঙা গলায় বলেন, 'না না, আমি চেয়েছিলাম—আমি চেয়েছিলাম দুর্গটাকে রক্ষা করতে—সব সময় আমিই চেয়েছিলাম।'

ভার্জিনিয়ার শেয়ালশিকারী বললেন, 'আপনি, সেনাপতি গ্রীন, আপনি, সেনাপতি পাট্‌নাম এবং আপনি, সেনাপতি মার্সার—আপনারা ফোর্ট লীতে গিয়ে তীরে নামবেন তখন মনে রাখবেন যে আপনারা আমার সেনা-বাহিনীতে অফিসার, মনে রাখবেন যে, আপনাদের নিজেদের প্রতি এবং নিজেদের লোকেদের প্রতিও কর্তব্য আছে। চেষ্টা করবেন আপনাদের পদ-মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করবার।'

হেসীয় জার্মান ক্লাইপহসেন রাইফেলধারী জার্মান সৈনিক পেছনে আর সামনে নিয়ে, পথ করতে করতে, দুর্গে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তোমাদের কর্তা?'

বেয়নেটের সামনে, পেছিয়ে গিয়ে, গোমড়া মুখে, একদৃষ্টে চেয়ে রইল

আমেরিকান সৈনিকেরা।

'কোথায় কত্তা?' গর্জে ওঠে জার্মান।

পেনসিলভ্যানিয়ার গ্রামাঞ্চলের একজন জার্মান কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দেয়, ম্যাগর দিকে আঙুল দেখিয়েঃ 'ঐখানে।' ম্যাগ দাঁড়িয়েছিলেন চোখ চেয়ে, কিছুই দেখছিলেন না। তাঁর দেহ মন প্রাণ সবই যেন শেষ হয়ে গিয়েছে।

'জার্মান বলে যে,' হেসে বলেন ক্লাইপহসেন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যেন তাঁর সামনে—এমনিভাবে যোগ করেনঃ 'বদমায়েস!'

ক্লান্তভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে ম্যাগ এগিয়ে আসেন।

'এ কে?'

ধীরে ধীরে ম্যাগ চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পান জার্মান সৈনিক, হাতে বেয়নেট, আর দেখতে পান তাঁরই পরাজিত বাহিনীকে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে।

ক্লাইপহসেন আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'এ কে?'

ঐ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও ম্যাগ, কথাগুলোর মানে না বুঝলেও, উদ্দেশ্য বুঝে ফিসফিস করে বলেন, 'কর্নেল ম্যাগ।'

'পদ কি?'

অসহায়ভাবে মাথা নাড়েন ম্যাগ আর তাঁর তলোয়ারখানার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ক্লাইপহসেন খেঁকিয়ে ওঠেন, 'তলোয়ারখানা খুলে দে কুত্তা!'

ম্যাগ ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন আর জার্মান সৈনিকেরা হাসিতে ফেটে পড়ে।

'তলোয়ারখানা,' আবার বলেন ক্লাইপহসেন।

এতক্ষণে ম্যাগ বুঝতে পারলেন, রিপাবলিকের একজন অফিসারের মর্যাদায় নিজেকে খাড়া রাখবার চেষ্টা করে তলোয়ারখানি খুললেন। বন্ধুদের দেওয়া শিলিং দিয়ে আর তাদের ছেলেমেয়েদের দেওয়া পেনি দিয়ে কেনা এই তলোয়ারখানা, ছোট্ট সাদা গির্জার পুরুত তাঁকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন ঈশ্বরের কর্তব্য আর বিবেকের আজ্ঞা পালন করে যেতে। চোখের জলে লজ্জা পেলেও তলোয়ারখানি তিনি দিয়ে দিলেন এবং ক্লাইপহসেন সেখানি নিয়ে, একটু মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে।'

জার্মানেরাও কিন্তু এবারে আর হাসল না।

গ্রীন অন্ধকারে নিমজ্জিত, নরকের শেষ তলটুকু আঁচড়াচ্ছেন। তাঁবুর

মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করেছেন। এখানে অন্ততঃ তাঁকে পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে বাইরের ঠাট বজায় রাখতে হবে না। তিনি উপুড় হয়ে, বিছানায় শুয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছেন যে একটা লোক শেষ পর্যন্ত কি করে যখন সে শুধু নিজের সর্বনাশই করেনি, প্রিয়তম বন্ধুরও করেছে, বলতে গেলে, সে একাই, আর কারও সাহায্য না নিয়েই, নিজের দেশকে ধ্বংস করেছে। কেন না গ্রীন আর কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন না, দেখতে পাচ্ছেন না যে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতভাগাদের ছোট্ট বাহিনীটি এই বিধ্বংসী আঘাতের পরেও দাঁড়িয়ে উঠতে পারে।

অন্যদের দোষ থাকুক আর নাই থাকুক তিনি কিন্তু নিজেকেই দোষ দিচ্ছেন। কারণ তিনি জানতেন যে, ভার্জিনিয়ান তাঁর নিজের এবং সেনাপতি লীর সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেছেন শুধু তাঁরই অনুরোধ-উপরোধে। এখন তো সব গেল—আশা, ভবিষ্যৎ। সমগ্র বিপ্লবটাই। মনে মনে ভাবতে থাকেন—যদি মৃত্যুটা হত, যদি তিনি দুর্গের মধ্যেই থাকতেন, যদি পেনসিলভ্যানিয়ানদের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে নিজেকে গেঁথে দিতেন ঐ জার্মানদের বেয়নেটে! তাঁর চেয়েও অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি যে অন্ধকারে প্রয়াণের পুরস্কার পেয়েছেন সেই অন্ধকারের মধ্যে যদি তিনি চলে যেতে পারতেন—

কার যেন তাঁবুতে ঢোকার শব্দ কানে এল; গড়িয়ে গিয়ে ফিরে দেখতে পেলেন শেয়ালশিকারীর দীর্ঘ, নোয়ানো দেহখানা তাঁবুর পর্দায় ছায়া ফেলেছে। শুধু একটা কালো ছায়া, কোন ভাব বা ইচ্ছার প্রকাশ তাতে নেই। বিছানা ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

'বস, ন্যাথানিয়েল।'

অবশ্যম্ভাবী আঘাতটির জন্যে নিজেকে শক্ত করতে করতে গ্রীন বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'খুব আঘাত পেয়েছ? তাই না ন্যাথানিয়েল?'

'স্যর?'

'আরও আঘাত পেতে হবে।'

দীর্ঘ মানুষটির দিকে চেয়ে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মনোভাব বোঝবার চেষ্টা করলেন গ্রীন—তাঁর মনে কি হচ্ছে তার কিছু হদিস পাবার চেষ্টা করলেন। ভার্জিনিয়ান শান্তভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'এই তো মোটে শুরু। ঈশ্বরই শুধু জানেন আমরা কোথায় চলেছি, কি করে চলেছি, শেষই বা কি হবে। কিন্তু আমরা চলেছি।'

'স্যর?'

'ন্যাথানিয়েল, বুঝতে পারছ যে, আমরা এইভাবেই চলব?'

গ্রীন দাঁড়িয়ে উঠে, অন্যজনের হাতখানি খুঁজে পেয়ে, সেখানি ধরেই রইলেন।

এই উদ্ভব দুঃস্বপ্নের জগতে এইটিই যেন একমাত্র সত্য বস্তু।

'স্যর—' গ্রীন খুশি যে শেয়ালশিকারী তাঁর চোখের জল দেখতে পাচ্ছেন না।

'সব সময়ের জন্যে, ন্যাথানিয়েল।'

'সব সময়ের জন্যে, স্যর।'

আমেরিকান বাহিনীর ২৮১৮ জন সৈনিক মার্চ করে চলেছে ধুলোয় ভরা রাস্তা দিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরের দিকে, মাইলখানেক পথ ব্যেপে, পা টেনে টেনে। হাতগুলো পাশে ঝুলছে। মুখ এত সাদা যে দেখলে দয়া হয়। সেই সব মুখের ওপর ময়লা মাটি আর রক্ত লেগে। কোন রকমে তৈরী খাটুলিতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আহত ও মৃতদের। সৈনিকদের মনের মধ্যে একটি জাতির সকল আশার শেষ। তাদের পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানদের জয়ঢাক আর ব্রিটিশদের বাঁশী বাজছে। বাতাসে গাছ থেকে উড়িয়ে আনছে হেমন্তের বাদামী রঙের পাতা, পতপত করছে র‍্যাটল্‌স্নেক রঙের নিশান। সেই নিশানটি বয়ে নিয়ে চলেছে একদল বিজয়ী জার্মান সেনা।

যত তারা শহরের কাছাকাছি আসে তত বেশী করে কৌতূহলী সব নাগরিকেরা হাসতে হাসতে এসে রাস্তায় গাদা হয়ে যায় আর শ'য়ে শ'য়ে বেশ্যারা আমেরিকান বাহিনীর সঙ্গে ছুটে চলে, এই পরাজিত লোকগুলো সম্পর্কে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করে। এরা শাপমন্যি করে, তাদের গায়ে থুথু দেয়। লালকুর্তারা তাদের সরিয়ে দেবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা এদিক ওদিক ছুটে চলে। ছোট ছোট ছেলেরা আমেরিকান সৈনিকদের গায়ে ছোঁড়ে কাদা আর পাথর, আর যে রবটি তোলে সেটি অল্পক্ষণের মধ্যেই বয়স্ক নাগরিকেরাও তুলতে শুরু করে:

'কোথায় ওয়াশিংটন? কোথায় ওয়াশিংটন? কোথায় ওয়াশিংটন? ওয়াশিংটনকে দেখাও আমাদের! সেই মহান জর্জ ওয়াশিংটনটি কে? কোন্‌টি? কোথায় তিনি? তাঁকে দেখাও আমাদের। বড়লোকটিকে দেখাও! আমেরিকার সবচেয়ে ধনী লোকটিকে দেখাও আমাদের!'

একসঙ্গে তারা বলে ওঠে: 'শিকারে যাব আমরা, শিকারে যাব। একটা শেয়াল ধরব, তাকে বাক্সে ভরব, তারপর দেব ছেড়ে।'

সবাই চেঁচিয়ে ওঠে: 'ওয়াশিংটন!'

'ওয়াশিংটনকে দেখাও !'

তারা গেয়ে ওঠে : 'কে ধরল শেয়াল ? কে ধরল শেয়াল ? কে ধরল শেয়াল ?'

অধিনায়কের নীল-বাদামী তকমা-পরা যে অফিসারকেই দেখে তাকেই ঘিরে তারা ঘুরপাক খেতে থাকে, হাসে, চেঁচায়।

'ওয়াশিংটন। ওয়াশিংটন !'

বারে বারেই লালকুর্তারা তাদের মেরে সরিয়ে দেয় আর বারে বারেই তারা বলতে বলতে ছুটে আসে : 'ওয়াশিংটনকে দাও—তাঁর মহান জয়ে আমরা উৎসব করব !'

জার্মানদের বাঁশী আর ঢাকে 'ইয়াংকি হাঁদা'র সুর বেজে ওঠে। বেশ্যারাও গাইতে থাকে

ইয়াংকি হাঁদা লণ্ডন গেল
টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে
টুপিতে গুঁজল এক পালক
তাকে বলল ম্যাকারোনি···

এত কলরবের ওপর দিয়ে একজন ব্রিটিশ কোয়ার্টারমাস্টার সার্জেন্ট তার কর্নেলের কাছে যুদ্ধে পাওয়া জিনিসগুলোর ফর্দ দেবার চেষ্টা করছিল, একঘেয়ে গলায় :

১৪৬টি কামান
১২০০০ গুলি, খাপ এবং শেল
২৮০০ বন্দুক
৯০০ সড়কি
১৪০০ বেয়নেট (বাঁকা, মরচে-পড়া, দেখলে লজ্জা লাগে, স্যর)
৪০০,০০০ কার্ট্রিজ
২৭০ তলোয়ার।

তবে, মন্তব্য করল, 'দুঃখিত স্যর, এই যাচ্ছেতাই গণ্ডগোল—'

সেদিন রাত্রে প্যালিসেড পর্বতমালার উচ্চ চূড়ায় পায়চারি করতে করতে তিনি এই সবকিছু নিজের মধ্যে ধরে রেখেছিলেন—তিনি শোকার্ত, নিঃসঙ্গ, ত্রস্ত। সেই তিনি যিনি সব কিছুতে অকৃতকার্য হয়েছেন এবং হবেনও—ভার্জিনিয়ার একজন নির্বোধ চাষী জমিদার, যার আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল আর বালি গলে গিয়েছে কিন্তু সারবান শক্ত কিছু কখনও নয়। এই লোকটা তার নিকটতম বন্ধুর স্ত্রীকে ভালোবেসে ভেতরে ভেতরেই ধরে রেখেছে,

বারুদের স্তূপের মতো, তারপর তাকে চলে যেতে দেখে নিজের যন্ত্রণার সঙ্গে তার নৈরাশ্য যুক্ত হয়েছে। সেই লোকটি যে নির্বোধ মতো সৎ মেয়েকে ভালোবেসেছে, তার বিছানার পাশে নতজানু হয়ে বসে, না মরে ফাবার জন্যে তাকে কেঁদে কেঁদে অনুনয় করেছে। একটা ভাঁড়—না আছে বুদ্ধি, না জানে হাসতে, একটা ভাঁড় যার না আছে কোন সৌষ্ঠব, না মুক্তির আশা।

১৩. কি করে তারা জার্সিতে ঢুকল

ব্রিটিশদের ফোর্ট ওয়াশিংটন অধিকারের কয়েকদিন পরে, হ্যাকেনস্যাক থেকে ফোর্ট লী পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে, পাশের দীর্ঘ মানুষটিকে বলবার জন্যে কথা হাতড়াচ্ছিলেন হেনরি নক্স। ফোর্ট ওয়াশিংটনে চূড়ান্ত ব্যর্থতার সময়ে নক্স ছিলেন হ্যাকেনস্যাকে। প্রথম স্পষ্ট খবর পেলেন গ্রীনের একটি ছোট্ট চিঠি থেকে—নিরাশ, এলোমেলো এক স্বীকারোক্তি। মানুষ হিসেবে এবং বন্ধু হিসেবে নক্স গ্রীনকে পছন্দ করতেন। তা ছাড়া সর্বাধিনায়কের সমর্থক বলতে এখন তো এই কজনাই—নক্স, গ্রীন, মিফলিন, পাটনাম আর মার্সার। গ্রীনের স্বপক্ষে এখন নক্স কিছু বলতে চান। আরম্ভ করেন: 'একটা মানুষ ভুল করেছে। সে যে কোন মানুষই করতে পারে।'

ভার্জিনিয়ান তাঁর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিপাত করে শুধোন, 'স্যর?'

'যে কোন মানুষ, মানে—স্যর, যে কেউ। ন্যাথানিয়েলের কাছ থেকে আমি চিঠি পেয়েছি একখানা। কি বলব, স্যর, ও যে আত্মহত্যা করেনি এই খুব—'

'হ্যারি, স্রেফ গাধার মতো কথা বোলো না!'

সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘকায় মানুষটি ঘোড়া ছুটিয়ে চলেন এবং নক্স, ইতিমধ্যেই বড় বেশী বলে ফেলেছেন বুঝে, পরিস্থিতির উন্নতির জন্যে আর কথা খুঁজে পেলেন না। একটা কিছু কল্পনা করে বলবার শক্তি তাঁর নেই। তাঁকে তথ্যের সম্মুখীন হতে হয় এবং বর্তমানে তথ্য হল এই যে, সব দিক থেকে বিচারেই, বিপ্লবের শেষ হয়ে গিয়েছে। এই আয়তনের একটি সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত বাহিনীও গোলাবারুদ কামান সমেত তিন হাজার লোকের ক্ষতির ধাক্কা সামলাতে পারত না। এ বাহিনী তো সুশিক্ষিতও নয়, সুসজ্জিতও নয়।

তিন সপ্তাহ না তিন মাস—কত দিন লাগবে তাই জল্পনা-কল্পনা করতে

করতে বইয়ের দোকানী মনে মনেই ঠিক করলেন, 'আমি থেকে যাব।'

অন্যদের মতো কম বয়েস পাট্‌নামের নয়। তিনি ইয়াংকি চাষী, বয়েস আটান্ন। স্বাস্থ্যও তেমন ভালো নয়; শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই—এখন নিরাপত্তারই সবচেয়ে বেশী দরকার। তাঁর মধ্যে উৎসাহের আগুন কিছু নেই। তিনি বুড়ো, নীরস ব্যক্তি। মাথার ওপর তাঁর ছাদ চাই।

তিনি যতদূর বুঝেছেন এই বিপ্লবের কারণ বিশেষ তেমন কিছু নয়, প্রচণ্ড তো নয়ই। ভাড়াটে মজুর দিয়ে তিনি তাঁর গোলাবাড়িতে একটা পাথরের দেয়াল তৈরি করাচ্ছিলেন। পাথর ভেঙে ভেঙে বসাতে তাঁর পিঠ ব্যথা করছিল। তাঁর মন তখন যদি কোন কিছুর ওপর নিবদ্ধ থেকে থাকত তা হল নিউ ইংল্যাণ্ডের সেই প্রবাদ বাক্যটি: ভালো দেয়াল তুললে ভালো প্রতিবেশী হওয়া যায়। এমন সময় একজন ঘোড়সওয়ার হড়বড় করতে করতে এসে লেক্সিংটন এবং কন্কর্ডে কি ঘটেছে তার খবর দিল।

মাথা নেড়ে পাট্‌নাম বললেন, 'খবরটা ভালো নয়।'

'মনে আছে বুড়ো শেপ ফেদারলীকে? সে নেই। তাকে ওরা গুলি করে মেরেছিল।'

পাট্‌নাম বললেন, 'ওদের এ কাজ করা উচিত হয়নি।' তিনি জানতেন যে তিনি যখন বৃদ্ধ তাঁর শান্তি নিরাপত্তা সবই গিয়েছে—ব্যথা-করা হাড় কখানা টেনে টেনে তাঁকে যেতে কোথাও হবেই, কিছু করতে হবেই। তিনি বিপ্লবী নন, গণতন্ত্রের সেবকও নন; শুধু এই নীতি মেনে চলেন যে ভালো বেড়া দিলে ভালো প্রতিবেশী হওয়া যায়। আজ দেড় বছর পরে যখন তিনি এইখানে দাঁড়িয়ে সেই চিন্তা মুছে দিল মন থেকে বিপ্লবকে, এই পাগলামির যুদ্ধ-নাটককে, নোংরা ভীত ইয়াংকিদের। তিনি ভেবে ঠিক করতে পারেন না যে তাঁর সেই গোলাবাড়িতে ফিরে গিয়ে, ভেতরে ভেতরে পচতে পচতে বুড়ো হওয়া ছাড়া গত্যন্তর আছে কি না।

অনেকদিন আগে, কয়েক মাসে বা বছরে নয়, কালক্রমে, বহু কিছুর পরিবর্তনের মতোই, ওরা রোড দ্বীপে একটি স্থানীয় বাহিনী গড়ে তুলছিল. আর তরুণ ন্যাথানিয়েল গ্রীন কি না সেনাপতি হয়ে গেলেন—যে বইখানা তিনি সব সময় পড়তেন সেইখানার জোরে। বইখানি হল: "মহাদেশীয় অঞ্চলগুলোতে প্রচলিত রণকৌশল—যে সকল গুণ থাকিলে উপযুক্ত অফিসার হওয়া যায় সেগুলির সারসংক্ষেপ সমেত।" বগলের নীচে বইখানি রেখে তিনি বাহিনীকে শিক্ষা দিতেন। তাই দেখে একদল সহাস্য মুগ্ধ মেয়ের

কি পরিতৃপ্তি! তরুণ দেখতে যাচ্ছেতাই রকম সুন্দর। বয়েস মোটে তেত্রিশ। নিজের সাহায্যেই নিজে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

তাঁর বাবার এক বুড়ো কোয়েকার বন্ধু ছিলেন। একদিন বিকেলে, ড্রিল হয়ে যাবার পর, তাঁকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'তোর সঙ্গে দুটো-একটা কথা আছে ন্যাথানিয়েল।'

'কি কথা?' গ্রীনের মন থেকে তখনও সেই দুঃখ যায়নি যে তাকে স্বপক্ষে একটি কথা বলারও অনুমতি না দিয়ে কোয়েকারেরা তাকে পরিত্যাগ করেছেন। এখন তিনি নতুন ইউনিফর্ম পরে, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে; অধীর

'ন্যাথানিয়েল, তুই যুদ্ধে যাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।'

'বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে পারবি?'

'কি করতে হবে তা আমি জানি।'

'তুই জানিস, ন্যাথানিয়েল; কিন্তু এই কথাটি কি ভেবে দেখেছিস যে পৃথিবীর আদি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কু থেকে সু কখনও জন্মায়নি?'

অন্য অনেক কিছু ভাববার চেষ্টা করে ন্যাথানিয়েল বললেন, 'কু-সু নিয়ে আমি ভাবছি না; মানুষের অধিকার, স্বাতন্ত্র্য, মুক্তি ইত্যাদির কথা নয়; তিনি বৃদ্ধকে বলতে পারলেন না সেই গৌরবময় অভিযানের কথা যা ইঙ্গিত দেয় ভবিষ্যতের সীমাহীন সম্ভাবনার।'

সেই বৃদ্ধ কোয়েকার যা বলেছিলেন সেই কথা আজ কতদিন পরে ভেবে এবং বুঝে যে সীমাহীন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বদলে আছে শুধু একটিই তীক্ষ্ণ, সীমিত, বিয়োগান্ত ঘটনা, তিনি নিজের মতো করে কয়েকটি পরিকল্পনা, কয়েকটি পথ ভাববার চেষ্টা করলেন; আবার একবার নিজেকে ভার্জিনিয়ানের সঙ্গে এবং মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করবার চেষ্টা করলেন।

নক্সের সঙ্গে সেনাপতি চলে যাবার পরে তাঁর সহকারী রীড, হ্যাকেনস্যাকে আগুনের সামনে বসে, অতীত আর বর্তমান নিয়ে ভাবতে ভাবতে, ঐ দীর্ঘকায় বেঢপ, ভার্জিনিয়ার চাষী জমিদার যিনি কেবলই ভুল করেন, তাঁর মধ্যে আশা করার মতো কিছু পেলেন না। তাঁর মনে হল তিনি মোটামুটি এমন একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে চলেছেন যখন একটি প্রকাণ্ড আন্দোলন ভেঙে পড়ছে। তাঁর সুকুমার আঙুলগুলো ঘাড়ের শিরা ও পেশীর চারদিকে উদ্বেগে চলে চলে বেড়াচ্ছে। ফাঁসি যাওয়াটা সুখের নয়। আগুনের প্রতিটি শিখা-উপশিখা তাঁর চোখে ফাঁসিকাঠের রূপ নিচ্ছে।

একটু আগেই তিনি দেখতে পেলেন পাঁচশো ভারমণ্টের চাষী শান্তভাবে

তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেল, পলাতকের মতো নয়, ঠাণ্ডা মাথায়, জেনেশুনেই যে খেলা শেষ। মাথাটি এখনও ঘাড়ের ওপর আছে জেনেই তারা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। হাডসনের পশ্চিম তীরের ইয়াংকিদের এরাই শেষ দল; পেছনে ফেলে যাচ্ছে গোমড়ামুখো, অসন্তুষ্ট মিডল্যাণ্ডারদের, পেনসিলভ্যানিয়া এবং জার্সির লোকেদের।

রীড দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁবুতে ফিরে গেলেন; কালি কলম কাগজ নিয়ে সেনাপতি চার্লস লীকে লিখতে শুরু করলেন:

"...অন্যদের ছোট করে আপনাকে আমি প্রশংসা কি খোশামোদ করতে চাই না, কিন্তু আমি মনে করি যে শুধু আপনার জন্যেই এই বাহিনী এবং এর ওপর নির্ভরশীল আমেরিকার যতটুকু স্বাধীনতা তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়নি; আপনার স্থির সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে। অন্যান্য গুণ থাকা সত্ত্বেও অনেকের এই গুণটি থাকে না। আপনার এই ক্ষমতার জন্যেই আমরা ইয়র্ক দ্বীপ, কিংসব্রীজ এবং প্লেন্‌স্‌ থেকে পালাতে পেরেছি; এবং আমার কোন সন্দেহ নেই যে আপনি এখানে থাকলে ওয়াশিংটন দুর্গের বাহিনীও এই বাহিনীর সঙ্গে মিশে যেতে পারত। এই সব পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আমি স্বীকার করছি যে আমি একান্ত মনে আশা করি যে এমন একটি জায়গা থেকে আপনি সরে যাবেন যেখানে আপনার বিচারবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার কোন সুযোগই নেই। আপনি সেইখানে যান যেখানে এগুলোর প্রয়োজন আছে। এই মত শুধু আমার একার নয়। প্রতিটি ভদ্র সন্তানের, অফিসারদের এবং সাধারণভাবে সৈনিকদেরও আপনার ওপর আস্থা আছে। শত্রুরা কেবল খোঁজ করছে আপনি কোথায় এবং মনে হচ্ছে আপনি উপস্থিত থাকলে তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যায়..."

নক্স এবং ভার্জিনিয়ান যখন ফোর্ট লীতে উপস্থিত হলেন তখন গ্রীন তাঁদের ভয়াবহ সংবাদ দিলেন। ফোর্ট লী থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে ছ হাজার ব্রিটিশ সেনা হাডসন নদী পার হয়ে ইতিমধ্যেই বিস্তৃত পরিধি নিয়ে ভিতরে এগিয়ে আসছে। এর উদ্দেশ্য হল দুর্গটিকে বিচ্ছিন্ন করে হ্যাকেনস্যাকের ছাউনি ঘিরে ফেলা।

গ্রীন নৈরাশ্যে এবং তিক্ততায় বললেন, 'ওরা আমাদের একেবারে শেষ করে দিতে চায় এবং জানে যে ওরা তা পারে। হে ভগবান, আমি ওদের থামাবার কোন উপায় দেখছি না।'

'দুর্গ খালি করতে শুরু করেছ?' ভার্জিনিয়ান জানতে চাইলেন।

'খালি করব কি করে? আমাদের ঘোড়া নেই, গাড়ি নেই। ভাবছিলাম খানিকক্ষণ যদি ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারা যেত—।'

ওয়াশিংটন এবং নক্স পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। গ্রীন অসহায় ভাবে বললেন, 'হে ভগবান, কোথায় যে শেষ হবে!'

দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি বললেন, 'দুর্গ খালি করো।'

'কি বলছেন স্যর! তাঁবুগুলো, খাবারদাবার, কামানগুলো—এগুলো নিয়ে আমরা—'

'সেনাপতি গ্রীন, অবিলম্বে দুর্গ খালি করো।'

'সব ফেলে রেখে?'

'সব।'

'কাল সকালের মধ্যে আমরা হয়ত কামান টানবার জন্যে ঘোড়া পেতে পারতাম,' নক্স অনুনয় করে বললেন।

'এখনই!'

শেয়ালশিকারী ঘোড়ার ওপর বসে বসে দেখতে লাগলেন দুর্গ ছেড়ে লোক সব চলে যাচ্ছে, পেছনে ফেলে যাচ্ছে খাটানো তাঁবুগুলো, আগুনের ওপর বসানো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কেটলি এবং গোলাবারুদ ভরা সব কামান। তারা পালাচ্ছে হ্যাকেনস্যাকের দিকে: তিনি তাদের পেছনে, যেন পশুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাদের গতি একটু শ্লথ হলেই বা কেউ হোঁচট খেলে বা পড়ে গেলে তিনি গর্জন করে উঠে বেত লাগাচ্ছেন। এ এক অদ্ভুত বিশৃঙ্খল দৃশ্য—শয়ে শয়ে লোক ছুটছে, হাঁপাচ্ছে, হাঁটছে আবার ছুটছে হ্যাকেনস্যাকের পথে। একটি জাতির জন্ম রূপ নিচ্ছে পায়ে হাঁটার প্রতি-যোগিতায়, সকলের পেছনে আসছেন এক দীর্ঘকায় চাষী জমিদার, মুখময় বসন্তের দাগ। দর্শক চারজন ডাচ ছেলেমেয়ে—পথের ওপর দাঁড়িয়ে রুটি আর পনীর চিবুতে চিবুতে নির্বিকার চিত্তে দেখছে। হালকা অস্ত্রধারী একদল সৈনিক পাহাড়ের ওপর থেকে এ দৃশ্য দেখে ছুটে গেল লর্ড কর্নওয়ালিসকে খবর দিতে।

'খুব দেরী হয়ে গিয়েছে, স্যর।'

'ওরা দুর্গ ছেড়ে গিয়েছে?'

'যেন পেছনে শয়তান তাড়া করেছে এমনি ভাবে ওরা রাস্তা ধরে হ্যাকেনস্যাকের দিকে ছুটছে।'

নক্সকে বললেন যে বাহিনীর লোক তিনি গুনতি করে দেখতে চান।

'স্যর?'

'শুনতে হবে ! হায় কপাল ! নক্স, আমাকে কি একটা আদেশ সাতবার করে দিতে হবে ?'

'না স্যর, মানে দলত্যাগীগুলো—'

'আমি অন্ধ নই। আমি জানি পলাতক আছে।'

'কিন্তু স্যর, রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট।'

'আমি গুনতি করতে চাই।'

গুনতি করতে নক্সের কয়েক ঘণ্টা মাত্র লাগল। তিনি ফিরে এসে বললেন, 'দু হাজার নশো এগারজন, স্যর।'

দীর্ঘ মানুষটি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। নক্স বললেন, 'আমি দুঃখিত, স্যর।'

'তুমি ঠিক বলছ ?'

'আমি নিশ্চিত, স্যর।'

তখন দীর্ঘ মানুষটি মাথা নাড়লেন।

হ্যাকেনস্যাক থেকে নিউআর্কে যেতে যেতে বৃষ্টি এল, আস্তে নয়, জোরে। অবিরাম ঠাণ্ডা বর্ষণ। রাস্তা কাদায় ভরে গেল। তাঁদের জুতোর ফসফস শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যায় না। কুঁজো হয়ে, মাথা নীচু করে, হাত বেঁকিয়ে রাইফেলগুলো ধরে, আত্মরক্ষার চেষ্টা করে করে তাঁরা চলেছেন। সম্মুখের বাহিনী কাদা দলে চলেছে আর পেছনের যারা তারা গর্ত আরও গভীর করছে। সেই মাইলখানেক লম্বা সৈনিকের সারির পেছনে পড়ে থাকছে জলকাদার ডোবা। শেয়ালশিকারী বাহিনীর আগেই ছিলেন, এক পাশে রীড আর এক পাশে পাট্‌নাম। পাট্‌নাম বৃদ্ধ মানুষ, বাতের ব্যথায় পঙ্গু, সবচেয়ে বেশী কষ্ট পাচ্ছিলেন। সারির আরও পেছনে আসছিলেন গ্রীন, একটা মরুঞ্চে ঘোড়ায় চড়ে। নক্স হ্যামিলটনের সঙ্গে হেঁটে আসছিলেন ; গোলন্দাজ বাহিনীর ভাঙা-ভগ্ন অংশ তাঁদের ছেড়ে গেল। মার্সার সকলের পিছনে। ভীত কংগ্রেসকে আরও সৈনিক পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করতে মিফলিন সেইদিনই ফিলাডেলফিয়া চলে গিয়েছেন।

ঘোড়ায় যেতে যেতে রীড ভার্জিনিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কোথায় তাঁবু ফেলব ?'

'বোধহয় নিউআর্কে।'

'তারপর পশ্চাদপসরণ ?'

দীর্ঘকায় লোকটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে উঠলেন।

'কত দিন ধরে ?'

'জানি না।'

রীড বললেন, 'চিরকাল ধরে আমরা পশ্চাদপসরণ করে যেতে পারি না।'

'মনে হয়, পারি। বোধহয় চিরকাল।'

'কোথায়?'

'পেনসিলভ্যানিয়াতে।'

রীড জোর দিয়ে বললেন, 'সেখানেও যদি ওরা পেছন পেছন ধাওয়া করে?'

'তাহলে পশ্চিমে।'

'কোথায়?'

'আলিঘেনিজ পার হয়ে।'

এটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা প্রকাণ্ড, অপরিচিত ঊষর প্রান্তরে—লাখ দশেক স্কোয়ার মাইল জুড়ে অন্ধকার, অনুর্বর বনাঞ্চল। রীড এর কিছুই বুঝলেন না। পাট্নামের পক্ষে এর মানে আরও—আরও যন্ত্রণা; কিন্তু শেয়ালশিকারীর কাছে এটা হল সেই একই পথে যাওয়া যে পথ একটি দিকেই নিয়ে যায়। সেনাপতি চার্লস লী এখন পাঁচ হাজারেরও বেশী নিউ ইংল্যাণ্ডার ইয়াংকি সৈনিক নিয়ে ওয়েস্টচেস্টারে। যখনই একটু সুস্থ সবল ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে তখনই একখানি মিনতিভরা চিঠি তাঁর কাছে পাঠানো হচ্ছে। সব চিঠিগুলোরই এক সুর: সেনাপতি লীকে অনুনয় করা হচ্ছে হাডসন নদী পার হয়ে এসে ভার্জিনিয়ানের সঙ্গে যোগ দিতে। কিন্তু লীর নিজের অন্য পরিকল্পনা ছিল।

একজন ব্যবসাদার সৈনিকের পক্ষেও তিরিশ হাজার ডলার আর ভাগ্যের মধ্যে তফাত আছে। দিনের পর দিন ভাগ্য চার্লস্ লীর দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি যখন আয়নায় তাকিয়ে নিজের লম্বা অপছন্দ মুখখানা দেখতে থাকেন তখন ভাগ্য তাঁর কাঁধে চেপে বসে থাকে। কুকুর-গুলোকে নিয়ে যখন গান আদর চলতে থাকে তখনও ভাগ্য তাঁর সঙ্গে। যোসেফ রীডের কাছ থেকে যে চিঠিগুলো পাচ্ছেন তাতেও ভাগ্য, আবার অন্য অনেকের চিঠিতেই যারা এই গোলমেলে ভার্জিনিয়ানের প্রতি অসন্তুষ্ট, ধৈর্যও হারিয়ে ফেলেছে।

এই মিস্ত্রী, ব্যবসাদার, চাষীদের বিদ্রোহের সঙ্গেই লী তাঁর ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলেছেন। এখন এই সমস্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যাপারটা টলমল করে ভেঙে পড়ছে। ছুটে পালানোটা বোকার মতো কাজ হবে; তাতে লাভও

কিছু নেই। ব্রিটিশেরাও তাঁকে কিছু দেবার জন্যে অপেক্ষা করে বসে নেই : তাদের কাছে প্রাপ্য শুধু অপমান এবং অবজ্ঞা। কিন্তু ধরা যাক এই অনড় মড়াটাকে তিনি উদ্ধার করলেন? না, মারামারি নয়। কেন না তিনি তো সৈনিক হিসেবেই শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে এসেছেন প্রথম থেকে। তাই এক মারামারির বিরুদ্ধে আর এক মারামারি তাঁর স্বভাববিরুদ্ধই শুধু নয়, এর কোন মানেই হয় না তাঁর কাছে। কিন্তু যদি তিনি ধীরভাবে অপেক্ষা করেন পাকা ফলটি টুপ করে তাঁর কোলে এসে পড়বার জন্যে। ভবিষ্যতের ছকটা পুরো বোঝা যাচ্ছে। শেয়ালশিকারীর বাহিনী ভিজে বালির মতো ঝুরঝুর করে পড়ে যাচ্ছে। হয়ত আর দশ দিন, কি বিশ দিন কি তিরিশ দিন টিকে থাকবে। তিরিশটা দিনই চূড়ান্ত মেয়াদ বলা যেতে পারে এই ব্যাপারটার। হাডসনের পশ্চিম তীরের বাহিনী আর তিরিশ দিনের মধ্যেই অন্তর্ধান করবে এবং শেয়ালশিকারীকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ব্রিটিশ সামরিক আদালতের সামনে। তাঁর এখন কাজ হচ্ছে অপেক্ষা করা এবং অছিলা করে করে ভার্জিনিয়ানের অনুরোধ না রাখা। তাহলে আর মাস দেড়েকের মধ্যেই তিনি সমগ্র আমেরিকান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়ে যাবেন। নিশ্চয়ই ঐ পদের জন্য আর কেউই উপযুক্ত নয় এবং সারা আমেরিকাতে বিদ্রোহী বাহিনী বলতে তাঁরটিই কেবল অবশিষ্ট রইবে।

ভার্জিনিয়ান ঐ বালির উপমাটা ভুলতে পারেননি। বারে বারেই নিজের বড় হাত দুখানির দিকে তাকিয়ে, খুলছেন আর বোজাচ্ছেন—কি করবেন বুঝতে পারছেন না। হাত দুখানি এত বড় যে পাখনার কলম স্বস্তিতে ধরতে পারে না। তিনি যদি পণ্ডিতও হতেন, যদি কথার কারবারি হয়ে, ঠিকঠাক কথা লিখে, সেগুলোকে সুবোধ্য বাক্যে যোজনা করতে পারতেন, তাহলেও না। বসে বসে লেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কষ্ট; তবু নিউআর্কে তাঁবুতে বসে, বাতি জ্বালিয়ে লীকে লিখেই চলেছেন, ত্রস্ত কংগ্রেসকে, উপনিবেশগুলোর প্রশাসকদের কাছে—সৈনিক চেয়ে, খাদ্য চেয়ে, কামান চেয়ে। মাঝে মাঝেই থেমে কাঁধে হাত দিয়ে দেখছেন আর অবাক হয়ে ভাবছেন যে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ফাঁসি হলে কেমন লাগে একটা মানুষের যখন ফাঁসটা গলায় লেগে বেশ চেপে বসতে থাকে। এক সময়ে এই কথা ভাবলে আত্মাবমাননার ভারে তাঁর অসুস্থ বোধ হত কিন্তু এটাকে মৃত্যুর অনেক পন্থার একটা বলে মনে হচ্ছে। বলিচিহ্নিত, রোদে-পোড়া ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে তিনি কঠোর মৃদু হাসলেন।

এখন তাঁর মন প্রায়ই চলে যাচ্ছে মাউন্ট ভার্ননের দিকে—জীবনের

সেই দিকটাতে যেটা রোদে ভরা, ছোট্ট মোটা মার্থা, সাদা সাদা বাড়িগুলো আর সবুজ মাঠ—শীত এসে যাচ্ছে বলে এই স্মৃতিগুলোকে ধরে রাখাও এখন আরও শক্ত। অদ্ভুত লাগে বটে, কিন্তু যে সত্যটা তিনি এখন স্বীকার করে নিচ্ছেন সেটা এই যে মাউন্ট ভার্ননে আর তাঁর যাওয়া হবে না। এই চিন্তাটা এখন আর খুব অস্বস্তিও ঘটাচ্ছে না। তাঁর চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না যে পাঁচ বছর, কি ছ বছর আগের ওয়াশিংটনের কাছে আজকের তাঁর এই অবস্থাটা কি অবিশ্বাস্য মনে হত—দ্রুত ক্ষীয়মান পরাজিত এক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, ঢ্যাঙা, রোগা হতভম্ব এক মানুষ রং-উঠে-যাওয়া, আলুথালু ইউনিফর্ম পরা, তাঁর চারদিকে নিউ জার্সির আর পেনসিলভ্যানিয়ার নোংরা বিশৃঙ্খল ছেলেগুলো বসে। কিন্তু সেই আগের ব্যক্তিটি তিনি আর নন। সেই ব্যক্তিটির এই নিঃসঙ্গ, ভয়াবহ অহমিকা থাকতে পারত না। এই অহমিকাই এখন শুধু তাঁর আছে—তখন যেটা ছিল না তার জন্যে এখন অহংকার এবং যেটাকে তিনি এখন কথায় ভালো করে প্রকাশও করতে পারেন না। এটাকে তিনি এখন ভাবতে পারেন মানুষের কতগুলো অধিকারমাত্র হিসেবে।

শহরের অন্য প্রান্তে ব্রিটিশেরা ঢুকতেই এই ছিন্নভিন্ন বাহিনী নিউআর্ক থেকে পালাতে শুরু করে। নক্স, হ্যামিলটন এবং আরও কয়েকজন বার পাউণ্ডের কামানে ছোট গুলি ভরে রাস্তা একেবারে ধাতুময় করে ফেললেন আর কয়েক মুহূর্তের আত্মসম্মান বাঁচানোর উদভ্রান্ত চেষ্টায়। তারপর তাঁরাও পালালেন কামান ফেলে রেখে। সারা বাহিনীটাই ছুটে পালাচ্ছে—নিউ ব্রান্সউইকের পথে এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে। মহাদেশীয় সৈনিকদের আক্রমণ করার মতো সংখ্যা ব্রিটিশদের সম্মুখবর্তী রক্ষীদলের ছিল না কিন্তু ভারী অস্ত্রধারী অশ্বারোহীরা নিউআর্কের বাড়িগুলোর ছাদের ওপরে উঠে পলায়মান মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাতে লাগল।

ব্রান্সউইকে পৌঁছে প্রথম হালকা তুষারপাতে পড়ল এরা। ব্রুকলিন পার্বত্য অঞ্চল থেকে পশ্চাদপসরণের সময় ছিল গ্রীষ্মকাল আর এখন নভেম্বরের প্রায় শেষ। তাদের পরনে সেই একই কাপড়জামা; বরং আরও কম ছিল কেন না পথে, এখানে-সেখানে, এটা-সেটা ফেলে দিয়েছে—একটা থলি, কম্বল একখানা, হয়ত একটা কোট। অনেক আগেই তাদের মোজা ছিঁড়ে গিয়েছে। নতুন করে পাবার আশা আর নেই। জুতোর ডগা দিয়ে ময়লা আঙুল বেরিয়ে পড়ছে। জুতোর যে তলাগুলো এখনও আছে সেগুলো কাগজের মতো পাতলা। পশম তৈরী আমেরিকায় বারণ। তাই পশমের

জামা বা গরম জামা প্রায় কারও নেই : লিলেনের তৈরি শার্ট, চোগা বাড়ির তৈরি—কোনটাই বেশীদিন টেকে না বা গরম হয় না।

ধীরে ধীরে হলেও শীত এসে গেল—জার্সির সমতলভূমির হাড়-কাঁপানো ভিজে ঠাণ্ডা—জলে-ভরা, বিশ্রী শীত। কাদায় ভরা কিংবা বরফে ঢাকা জার্সির রাস্তার ওপর তারা তাদের পদচিহ্ন রেখে রেখে যাচ্ছে—একটি চিহ্ন বা তকমা; বহুদিন ধরে এইটিই হয়ে থেকেছিল অন্য সকলের থেকে তাদের পার্থক্যের দ্যোতক। সেটি একটি রক্তের ধারা, হাজারো পা থেকে ঝরে-পড়া একটি রেখা—রাস্তার ওপরে কালো দাগটি বলে দিচ্ছে: 'এইখান দিয়ে মুক্তিবাহিনী হেঁটে গিয়েছে।' যারা দেখতে চাইছে বা পড়তে চাইছে তারাই বুঝছে।

শুধু ঠাণ্ডাই নয় : পেটের মধ্যে উপবাসের একঘেয়ে যন্ত্রণা। ক্ষেতগুলো থেকে শস্য সব কেটে নিয়ে গিয়েছে যে। পশুপাল সব খেদিয়ে নিয়ে গিয়েছে। গোলাঘরগুলো তালাচাবি বন্ধ। নিউ ইয়র্কের সৎ নাগরিকদের কাছ থেকে জার্সির সৎ নাগরিকেরা শিক্ষা নিয়েছে। এই এলোমেলো বেজন্মার দলের সব বিদেশীরা, জেলেরা, পাগলেরা তো আর তাদের সৈনিক নয়। জার্সির বাড়িগুলোর জানলার খড়খড়ি শক্ত করে আঁটা। জার্সির চাষীদের বন্দুক গাদাই আছে। সেই সময় ব্রিটিশদের গুলিতে যত মুক্তিসৈনিক মরেছে তার চেয়ে বেশী মরেছে জার্সির চাষীদের গোলাঘরের সামনে। আর শয়ে শয়ে পলাতকেরা খিদেয় পাগল হয়ে খাবারের জন্যে বাড়ির সামনে এলেই তাদের মাথা গিয়েছে উড়ে। কি করে যে হঠাৎ এমন ঘটল তা বেচারীরা জানতেই পারল না। তারা নিজেরা তো জার্সি আর পেনসিলভ্যানিয়ার মানুষ তবু হঠাৎ তারা হয়ে উঠেছে বিদেশে বিদেশী সৈনিক—প্রতিটি হাত তাদের বিরুদ্ধে, প্রতিটি দরজা বন্ধ, প্রতিটি জানলায় খিল দেওয়া। বাহিনীর প্রধান অংশ ছেড়ে কয়েক গজ এগোলো অপেক্ষমান মৃত্যুর হাতে পড়া।

যত না তারা খাদ্য পরিধেয় চাইছে তত চাইছে উত্তর, বেপরোয়া হয়ে চাইছে। আর উত্তর কিছু দিতে পারেন একটি মানুষই—ছোটখাটো, কুশ্রী এক ইংরেজ। মাথাটা তাঁর নাসপাতির মতো লম্বা। তাঁর নাম টম পাইন।

চোখে তাঁর আগুন। প্রায় তাঁরই সমান একটা বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে এদের সঙ্গেই তিনি হেঁটে চলেছেন। খাচ্ছেন এদেরই সঙ্গে, আগুন পোয়াচ্ছেন এদেরই সঙ্গে বসে। এদের মতনই তিনি রুগ্ন। দেহ উকুনে ভরা। একই রকম ক্লান্ত এবং নোংরা। তাঁর কাছে সব উত্তর ছিল।

তিনি উপদেশ দিতেন। তিনি যদি সুদর্শন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতেন তাহলে এরা তাঁকে ঘৃণা করত। তিনি কিন্তু নোংরা, কুদর্শন। এরা কিছুতেই ঠিক করতে পারত না তিনি কি করেন—অফিসার না সাধারণ সৈনিক। কখনও এক রকম, কখনও আর এক রকম। কোনটাই তাঁকে দেখাত না যখন তিনি সন্ধ্যাবেলায় অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে উঠে, অদ্ভুত থেটফোর্ড উচ্চারণে বলে যেতেন, 'দেশভক্তগণ, আমার কথা শোন! শুনে মনে স্বস্তি পাও। আমি শপথ করে বলছি স্বস্তি পাবার কারণ আছে!'

পরস্পরকে কনুইয়ের গুঁতো দিতে দিতে ইচ্ছে করে হিহি করে হাসতে হাসতে, এ কোণ সে কোণ থেকে বেরিয়ে এসে আগুনের কাছে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত সব, মাথা নেড়ে পরস্পরকে বলত, 'টম পাইন।'

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'তোমার নামটি কি, দেশভক্ত?'

'বার্ক হুপার।'

'বার্ক হুপার, তুমি এই বাহিনীতে থেকে যুদ্ধ করছ কেন?'

'কে জানে কেন করছি!'

'তাহলে বলি শোন—একটা বিশেষ চিহ্ন নির্দেশ করে বলি যেটা এই ঝামেলার মধ্যে তোমাকে পথনির্দেশ করবে। তোমাকে বলি শোন: এই পৃথিবীতে মানুষের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে মহত্তর কিছু নেই এবং মুক্তি অর্জনের চেয়ে বড় আদর্শও কিছু নেই...'

টম পাইন ভিন্ন আর কেউ যদি হত এরা তাহলে হেসে উঠত, শাপমন্যি করত অথবা তাকে মেরেই বা ফেলত। কিন্তু টম পাইনের মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল, যেন প্রার্থনা আর আশীর্বাদ, এবং চোখে তার আগুন। এরা যে শহীদ এই কথাটাই তিনি এদের জানিয়ে দিলেন। তাদের নোংরামি আর ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড়ের মধ্যে থেকে এক ভীষণ বিস্ময় তিনি আকর্ষণ করে আনলেন। তারা হাত-পা গুটিয়ে, বসে পড়ে শুনতে থাকে, নাক খোঁটে, থুথু ফেলে, জটপাকানো নিজেদের দাড়ি ধরে টানে, পরস্পরকে গুঁতো দেয়।

'একটা মানে হয়, কিন্তু—।'

যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি কি কুসংস্কারের বশে বলছি?'

'না, না।'

'আমি কি উচ্ছন্নে-যাওয়া সালেমের ভণ্ড তপস্বী?'

'না।'

'আমি কি খ্রীশ্চিয়ানদের ইহুদির ওপর অত্যাচার সমর্থন করেছি,

প্রটেস্ট্যান্টদের হাতে ক্যাথলিকদের ?'

'না।'

'তাহলে আমি যখন তোমাদেরই একজনের মতো, তোমাদের এই কথা বলছি, তোমরা আমাকে বিশ্বাস করতে পার। শুধু একজন মানুষ হিসেবে বলছি, তার বেশী কিছু হিসেবে নয় যে ভগবান একজন আছেন!'

পরে কি বলবেন সেটা জেনেও এরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে; কেন না এই কথা তারা অনেকবারই শুনেছে আগে।

'আমি বলছি এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন যিনি তাঁর এত জীবকে অত্যাচারীদের হাতে ধ্বংসের জন্যে তুলে দেবেন না!'

তারপর একটা বোঝাবুঝির দ্বন্দ্ব শুরু হল: 'এক মিনিট দাঁড়াও, টম, শোন। আমি তোমার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করছি না কিন্তু আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ—নোংরা, উকুনে-ভরা। মনে হয় কি ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন? আমরা জিতছি না আমরা হারছি?'

'আমি বলছি আমরা জিতছি।' তিনি বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন। 'আমি বলছি, যদি মাটি ফেটে ফাঁক হয়ে যায় আর আমাদের শেষ মানুষটিকে পর্যন্ত গিলে ফেলে, তবু আমরা জিতে যাব। পৃথিবী তো আর আমাদের ভুলে যাবে না। আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ, বিনীত মানুষ। আমরা অস্ত্র ধরেছি শুধু মানুষের পবিত্র অধিকার রক্ষা করবার জন্যে। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা জিতছে তারা উচ্ছন্নে যাক।' তিনি নিজের বুকে চাপড় মেরে বললেন, 'আমার জয় এইখানে।'

একদিন রাতে যখন তিনি একটা লম্বা টোল-খাওয়া ঢোল দুই হাড়সার হাঁটুর মধ্যে নিয়ে, সেটাকে এমন তেরছা করে ধরে রেখেছেন যাতে ঢোলের মাথাটায় আগুনের আলো এসে পড়ে। সেটাকে ডেস্ক বানিয়ে তিনি তীব্র বেগে লিখে চলেছেন। একজন অনুরক্ত সৈনিক কালির দোয়াত ধরে রয়েছে পাশে, আর একজন পালকের কলম বেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু তাঁর লেখার বেগে সেগুলো বেঁকে নষ্ট হয়েই যাচ্ছে। যেখানে তিনি কাজ করছেন সেখানে নীরন্ধ্র স্তব্ধতা, কেন না এ কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছে যে টম পাইন লিখছেন। পালকের কলমের আঁচড়ে ঢোলের একটানা মৃদু শব্দ হয়ে যাচ্ছে

তিনি লিখেই যাচ্ছেন আর বেশী বেশী লোক তাঁর চারদিকে এসে জমছে; শেষে তাকিয়ে দেখেন কি একশোজনের বেশী মানুষের দীপ্ত লাল চোখ তাঁর ওপর নিবদ্ধ। যা লিখেছেন পড়তে শুরু করেন। ঢোলকের ওপর

নুয়ে পড়ে পড়ছেন আর তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে যেন ভবিষ্যৎ কালকে ডাক দিয়ে যাচ্ছে।

'এই হল কাল যখন মানুষের অন্তরের পরীক্ষা হয়। সৈনিক গ্রীষ্মকাল আর দেশভক্ত সূর্যালোক, এই সঙ্কটে দেশকে সেবা করা থেকে বিরত হবে। কিন্তু যে এ সব সহ্য করে থাকবে সে-ই দেশের নরনারীর ধন্যবাদ ভালো-বাসার পাত্র। নরকের মতো অত্যাচারীও সহজে পরাজিত হয় না, কিন্তু আমাদের এই সান্ত্বনা আছে যে, সংঘাত যত কঠিন হবে, জয় হবে তত গৌরবের।...কোন জিনিসের কি মূল্য তা ঈশ্বরই জানেন, এবং এটা অতি বিস্ময়ের কথাই হবে যদি স্বাধীনতার মতো স্বর্গীয় বস্তুর উচ্চ মূল্য না থাকে...'

আর শেয়ালশিকারী লীকে চিঠি পাঠিয়েই চলেছেন, সাহায্য চেয়ে চেয়ে —এক হাজার ইয়াংকি, শ'খানেক, কিছু না হলেও তাঁর জেলে সৈনিকের একটা রেজিমেন্ট। টম পাইনের গর্জন সত্ত্বেও দিনের পর দিন দলত্যাগ বেড়েই চলেছে; ব্রিটিশেরা দিবারাত্রি তাঁর পেছনে কুকুরের মতো তাড়া করছে। কেবল এখনই তিনি বুঝতে পারছেন গ্লোভারের লোকগুলোর কত নির্ভর তিনি করেছিলেন। কত জোর পেতেন মনে যদি জানতেন যে ছ-সাতশো লম্বামুখো জেলেও অন্তত তাঁর আছে যারা পালাবে না। তাঁর সংগ্রাম-পরিষদ এখন নির্বাক। তাঁর সামনে নক্স, গ্রীন, পাট্‌নাম এবং মার্সার। আদেশ শুধু পিছু হটবার। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তাঁর বেপরোয়া জেদ যে লোক গুনতি করতে হবে; যাতে তিনি জানতে পারেন কতজন আর রইল।

নিউ ব্রান্সউইকে এসে পেনসিলভ্যানিয়ার দুটো পুরো ব্রিগেড জানিয়ে দিল তাদের বাড়ি ফিরে যাবার ইচ্ছার কথা। যে কজন বিশ্বাসী সৈনিক আছে তাদের একত্রিত করে এদের ঘিরে ফেলতে আদেশ দিলেন গ্রীনকে, আর নক্সকে বললেন কামানে ছররা গুলি ভরতে। পেনসিলভ্যানিয়ার সৈনিকেরা যদি অস্ত্রত্যাগ করতে রাজী না হয় তাহলে যে কি করবেন তা তিনি নিজেই জানেন না। মিডল্যাণ্ডারেরা বেয়নেট নীচু করে হাঁটতে শুরু করে। তাদের মুখে যে বেপরোয়া ভাব তা তারা ব্রিটিশদের সামনেও কখনও প্রকট করেনি। গ্রীন অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলেন ভার্জিনিয়ানের মুখের দিকে। সেই মুহূর্তেই বিপ্লবের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন আস্তরণখানা রক্তাক্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারত। কিন্তু দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি মাথা নাড়লেন এবং ব্রিগেড দুটি বিনা বাধার ছাউনি ছেড়ে চলে গেল।

দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি তো আর নিজের মধ্যে পশ্চাদপসরণ করতে পারেন না। পরে তিনি পাট্‌নামকে বুঝিয়েছিলেন, 'আমার আর কি করা উচিত ছিল?'

'বলতে পারি না।'

'তুমি কি গুলি করতে?'

'জানি না। যে যেভাবে দেখে সে সেইভাবে কাজ করে।'

'আর কেউ যদি কিছু না দেখে তাহলে—?'

রীডকে তিনি বিশ্বাস করতেন; তাঁকে বললেন, 'তুমি তো জানো জোসেফ, আমরা শেষের কত কাছাকাছি।'

রীড মাথা নাড়লেন।

লীকে বারে বারে লিখেছি। ঈশ্বর জানেন তিনি কি করছেন। তিনি বিজ্ঞ, ভালো সৈনিক, তাঁকে আমি সমালোচনা করতে পারি না। কিন্তু তিনি আমাদের সাহায্য করবেন না—বোধহয় করতে পারছেন না।'

রীডের মুখের ওপর অদ্ভুত, অর্ধ-সন্ত্রস্ত ভাব।

শেয়ালশিকারী হতাশায় বললেন, 'বার্লিংটনে যাও। সেখানে গিয়ে তাদের বল যে শেষ আসন্ন, এইবারে সত্যিই শেষ। আমার ঘাড়ের ওপর যেমন কোপ পড়ছে তেমনি তাঁদের ঘাড়েও পড়ুক। তাঁরা বুঝুন।'

বার্লিংটনে রয়েছেন জার্সির ভীত সংসদ-সভ্যেরা। রীড প্রতিবাদ করে বললেন, 'কোন লাভ হবে না।'

'তবু যাও, জোসেফ। ঐ খড়কুটোটাকেই এখন আমি ধরতে পারি।'

রীড যাবার অল্পক্ষণ পরেই, অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল জোসেফ রীডের নামে একখানা চিঠি এল লীর কাছ থেকে। পত্রবাহক সেখানি সর্বাধিনায়কের হাতেই দিল। তাঁর প্রথম মনে হল সেখানি অ্যাডজুট্যান্টকে পাঠিয়ে দিই। পরে ভাবলেন তিনি যে আশার আলোটুকু খুঁজছেন সেটুকু এই চিঠিতেই থাকতে পারে। তাঁকে লেখা কোন চিঠি লীর কাছ থেকে আসেনি এবং রীড যেহেতু চিঠিপত্রের বেশীর ভাগই দেখছিলেন তাই তাঁকে লিখলে একই কাজ হবে। চিঠি খুলে তিনি পড়লেন:

"প্রিয় রীড, আমি তোমার সকৃতজ্ঞ চিঠি পড়ে খুশি হয়েছি এবং সেই সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নেবার অক্ষমতার জন্যে আমিও খুব দুঃখিত। ব্যক্তি-গত সাহস বা বোকামির চেয়েও, যুদ্ধের সময়, এটা আরও বেশী দোষের। যে সমান ভুল করে সে আচমকা একবার ঠিক কাজটি করতে পারে কিন্তু অতি গুণবান ব্যক্তিকেও কেবল পরাজয় মানতে হবে আর ভুলের মাশুল

যোগাতে হবে যদি তাঁর সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা না থাকে। সেনাপতি পীড়াপীড়ি করছেন মহাদেশীয় বাহিনীকে আমার অধীনে নিয়ে আসতে—এমন করে যে সেটা প্রায় আদেশের মতো। এই সুপারিশ, বা যাই বল না কেন, কতকগুলো কারণে ভীষণ উভয় সঙ্কটে ফেলেছে…”

তিনি পড়েই চলেছেন ; কালো এক সুড়ঙ্গপথে ঠোক্কর খেতে খেতে মন চলেছে—সে পথের শেষ নেই, সে পথ অন্ধকার। অভিবাদনের ভাষা তিনি বারে বারে পড়ছেন ঃ প্রিয় রীড, প্রিয় রীড। সইয়ের ওপরে আঙুলটি রাখলেন ঃ চার্লস লী।

ফিসফিস করে বললেন, ‘সিদ্ধান্ত নেবার অক্ষমতার জন্যে আমি দুঃখিত।’

দেহের প্রায় সর্বশক্তি দিয়েই তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং তাঁবুর নোংরা পর্দাগুলোর মধ্যে দিয়ে, অসহ্য বিষাদে, পায়চারি করতে লাগলেন। কম্পমান পৃথিবীটাকে একটা স্থির কিছুর ওপর দাঁড় করাতে চাইলেন তিনি। রীড তাঁর বন্ধু, তাঁর অ্যাডজুট্যান্ট, তাঁরই সঙ্গী। তাঁরই কংগ্রেসের একজন কর্মী হলেন লী। চিঠিখানা বাজে, ঘৃণ্য মিথ্যে কথায় ভরা, বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যে জাল করা। আর ঠিক এমন একটি সময়ে তাঁর হাতে এখানি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যখন রীড গিয়েছেন বার্লিংটনে এক বার্তা নিয়ে।

তিনি চিৎকার করে উঠলেন, ‘ঘৃণ্য মিথ্যে কথা!’ সেই আওয়াজে প্রহরী তাঁবুর মধ্যে উঁকি দিল।

‘কি হয়েছে, স্যর?’

‘কিছু না।’

চোখে চশমা দিয়ে, প্রতিটি কথা দেখে দেখে আবার যখন তিনি চিঠিখানা পড়তে থাকেন তখন তাঁর হাত কাঁপে। না, লীর ঐ বিশ্রী হিজিবিজি লেখা জাল-করা হতে পারে না। লীর হাতের লেখা তাঁর কাছে নিজের হাতের লেখার মতোই সুপরিচিত। রীডের একখানি চিঠির উত্তরেই এই চিঠিখানি লেখা। “কৃতজ্ঞ, খুশি হয়েছি।” বাহিনী যেমন ভেঙে যাচ্ছে তাঁর অফিসারেরাও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে—সেই লোকগুলো যেগুলোকে তিনি ভালোবেসেছেন, বিশ্বাস করেছেন ; এখন আর কাকে বিশ্বাস করবেন? গ্রীনকে? গ্রীন তাঁর জন্যে মরতে পারেন কিন্তু এ কথা তো তিনি রীড সম্পর্কেও বলতে পারতেন। মিফলিন? সে কেন এত আগ্রহ করে ফিলাডেলফিয়া চলে গেল! মাস´রের বাদামী মুখোশের পেছনে কি আছে কে বলতে পারে? পাট্‌নাম? নক্স?

‘ওঃ, ঈশ্বর!’ ফিসফিস করে বলে উঠলেন।

ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁবুর ঐ ছোট্ট স্থানটিতে তিনি পায়চারি করতে থাকেন ; খাবার তৈরি বলতে নিগ্রো চাকরটি ঘরে ঢুকলে তার দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকেন। নক্স যে খবরটি পাঠিয়েছেন তাতে কানও দেন না। হাঁটতে হাঁটতে চার দেওয়ালে তাঁর হাড়-বের-করা কাঁধ ঘষে যায়। উদ্ধারের কোন আশা নেই, কোন সমাধান নেই, শুধু একটি পথই আছে। সে পথ নির্দিষ্ট, তার পরিবর্তন নেই, জীবনের একটি কেন্দ্রবিন্দু যেটি একটুও বদলাবে না।

রীডকে চিঠি লিখতে বসলেন ঃ

"দ্রুত পত্রবাহকের হাতে হোয়াইট প্লেন্‌স্‌ থেকে একটি আঁটা চিঠি আমার হাতে এনে দেওয়া হয়েছে। এটা ব্যক্তিগত চিঠি হতে পারে এ ধারণা আমার না থাকায়, এবং কি লেখা থাকবে তার সম্বন্ধে কিছুই সন্দেহ না করে, আমি চিঠিখানি খুলি—যেমন খুলেছি ঐ একই জায়গা থেকে এবং পেক্‌স্‌ হিল থেকে তোমার নামে আসা আরও সব চিঠিগুলো। তোমার ঐ পদে থাকার জন্যেই সেই চিঠিগুলো—তাই ভেবেছিলাম, হয়েছিলও তাই। সত্যি কথা বলতে কি, এই চিঠিখানির বিষয়বস্তু পড়ে দেখার এই একটিমাত্রই আমার কৈফিয়ত। আগ্রহ কিংবা ইচ্ছা—কোন কিছুতেই এ কাজ আমাকে করায়নি। বার্লিংটনে যেতে তোমার যে কষ্ট ও ক্লান্তি হয়েছে সেটুকু গ্রহণ করেছ বলে ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কামনা করি যে তোমার চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হোক। মিসেস রীডকে আমার অভিবাদন দিও. ইতি,

ভবদীয় ইঃ।"

১৪. কেমন করে ভাগ্য এসে সেনাপতি লীর ঘাড়ে চাপল

যারা চার্লস লীকে জানত এবং ভালোবাসত তারা খেদে বলত যে ওঁর রাজা হয়ে জন্মানো উচিত ছিল। সাতাই তাঁর কুৎসিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং এব ঘেয়ে বিষাদে রাজকীয় ভাবও ছিল আবার শয়তানিও ছিল। তিনি শেয়ালশিকারীর মতো ভুল করতে করতে ভাগ্যের হাতে এসে পড়েননি। যতদিন নিজের জীবনকে তাঁর মনে পড়ে ততদিনই বুঝেছেন ভাগ্য তাঁর ভেতরেই এবং সে সম্পর্কে তিনি বরাবর সচেতনই ছিলেন। তবু কোন না কোন ভাবে সেই ভাগ্য তাঁর হাত ফস্কে গিয়েছে। এই প্রথম এসে তাঁর কাঁধের ওপর বসল।

এবং কাঁধেই যেন সে বসে থাকে এ বিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন। খুব ভালো করেই তিনি জানতেন এই ছড়িয়ে-থাকা আমেরিকান বসতি-

গুলোর মধ্যে কত সামর্থ্য সুপ্ত আছে। তারা সংখ্যায় প্রায় তিরিশ লক্ষ। তিনি একেবারে ঠিকই করে ফেলেছেন যে এদের মনে আগুন জ্বালাবার লোক হচ্ছেন তিনি। ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দেবার তাঁর শক্তি নিয়ে তিনি মোটেই উদ্বিগ্ন নন; সেটা পরে হবে। তাঁর বাহিনী তো রয়েছেই। বাকী রয়েছে শুধু সর্বাধিনায়কত্বটি পাওয়া।

যথেষ্ট অপেক্ষা করা হয়েছে ঠিক করে, ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে, তিনি মার্বেলহেডের জেলেদের সাহায্যে বাহিনীকে হাডসনের ওপারে নিয়ে গেলেন। জার্সিতে ব্রিটিশেরা তাঁর এবং শেয়ালশিকারীর বাহিনীর মধ্যে পড়েছে। স্পষ্টতই তাঁর বাহিনী সবচেয়ে ভালো করে সজ্জিত এবং সবচেয়ে বেশী সবল, এবং স্পষ্টতই ব্রিটিশেরা তাঁকে ঘাঁটাবে না; সব শক্তি প্রয়োগ করবে শেয়ালশিকারীকে ধ্বংস করার জন্যে। এসব তিনি বেশ কিছুদিন আগেই ভেবে রেখেছেন এবং নিজের কাজে তিনি এতই খুশি যে একটু মুচকি হাসিও ঠোঁটে এল। তখন তিনি এক নৌকো কুকুরদের সঙ্গে গুনগুন করে সুর মেলাচ্ছিলেন চিৎ হয়ে শুয়ে। কুকুরগুলো অবশ্য যথারীতি বীভৎস চিৎকারই করে যাচ্ছিল।

আর কিছুকে না হোক তাঁর কুকুরগুলোকে চার্লস লী ভালোবাসতেন। নিজের সন্তানদের যেমন করে সন্তর্পণে নৌকোয় তোলা হয় তেমনি করে তাদের তুললেন এবং জার্সির তীরে জেলেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল যখন তিনি একটি একটি করে ঐ কুকুরগুলোকে নামালেন—নিজে জলে দাঁড়িয়ে। তারপর তাদের বয়ে নিয়ে গেলেন ডাঙায়। দ্বিতীয় সেনানায়ক জেনারেল সুলিভ্যানের আদেশে বাহিনী ইতিমধ্যেই পদযাত্রা শুরু করেছে। ব্রুকলিনে বন্দী হবার পর তাঁকে বদলিতে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু কুকুরগুলোর খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত লী এক পা-ও নড়বেন না। মাংস আনা হলে প্রত্যেকখানি টুকরো সতর্কভাবে পরীক্ষা করে, বিরক্তিতে খানকয়েক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, যতক্ষণে তাঁর পছন্দমতো খাদ্য না এসে পৌঁছল ততক্ষণ তিনি চিৎকার রাগারাগি করতে থাকলেন।

ভার্জিনিয়ান যে পথে প্রায় দুই সপ্তাহ গিয়েছেন সেই পথেই বাহিনী জার্সির তীর ধরে চলল, কিন্তু লীর গতি এত মন্থর যে নিউ ইংল্যাণ্ডারেরা পর্যন্ত অভিযোগ করেছিল। দিনে মোটে দশ মাইল একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার—কখনও কখনও বা পাঁচ-ছ মাইল, আবার কখনও বা দিন চারেক কিছুই না করে, শুধু খেয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সর্বাধিনায়কের বাহিনীতে সব ঠিকমতো চলছে না এই সন্দেহে সুলিভ্যান একটু অস্বস্তি

বোধ করতে শুরু করলেন, কিন্তু তিনি যেহেতু লীর চিঠিগুলো পড়বার সুযোগ পাচ্ছেন না তাই তাঁর সন্দেহের কোন দৃঢ় ভিত্তিই খুঁজে পাচ্ছেন না। সাধারণ সৈনিকেরা এসবের কিছুই জানত না—নিউ জার্সিতে কি ঘটেছে বা পেনসিলভ্যানিয়ার লোকগুলোর কি হয়েছে। তাদের যতটুকু জানা তাতে তাদের মনে হয়েছে পৃথিবী হাঁ করে যেন মুহূর্তে তাদের গিলে ফেলতে পারে। তাদের দিক থেকে অবশ্য এই পদযাত্রা ধীর, মন্থর ; তারা বিশেষ জোরে আপত্তিও কিছু করছে না। আর করবেই বা কেন? ব্রুকলিন ও নিউ ইয়র্কের বিভীষিকা তাদের স্মৃতিতে তখনও উজ্জ্বল।

ওপর ওপর মনে হয় যুদ্ধের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা সবই বানচাল হয়ে গিয়েছে। আর একটু ঠাণ্ডা পড়তেই নিউ ইংল্যাণ্ডারেরা আরও বেশী বেশী সংখ্যায় দলত্যাগ করতে থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে লী তাঁর বাহিনী নিয়ে মরিসটাউনে এসে উপস্থিত কিন্তু হোয়াইট প্লেন্‌স্‌ থেকে মার্চের সময় তাঁর বাহিনী থেকে প্রায় হাজারখানেক দল ছেড়ে গিয়েছে। এখন তিনি ব্রিটিশ বাহিনীর প্রায় পেছন দিকে। তাই এমনিতেই শ্লথগতি লী তাঁর বাহিনীর গতি আরও কমিয়ে দিলেন। ১২ই ডিসেম্বর তিনি বাহিনী নিয়ে মরিস-টাউন ছেড়ে গেলেন ; আরও আট মাইল গেলে ভীলটাউন। তাঁর সৌভাগ্যের মুহূর্ত প্রায় এসে গিয়েছে। সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে প্রতিটি মিনিট দীর্ঘকায় ব্যক্তিটিকে আর একটু হতাশ করে তুলছে। আর একটা সপ্তাহ গেলেই, লী হিসাব করলেন, নতুন এক মহাদেশীয় বাহিনী গঠিত হবে এবং সর্বাধিনায়কও নতুন হবেন।

একে তো লী এই দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন ; তার ওপর এই নির্বুদ্ধি সৈনিকেরা, সপ্তাহব্যাপী ক্লান্তিকর মার্চের বিরক্তি। বাহিনীর অফিসারেরা হাঁদার মতো সব প্রশ্ন করে যাচ্ছে—কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, ইত্যাদি। জেনারেল নায়ক গ্লোভার লীকে পছন্দ করতেন না এবং তিনি সেটা জানতে দিতে দেরীও করলেন না। লী শাসালেন, তিনিও শাসিয়ে দিলেন, এবং লী যখন শাপমন্যি করলেন, তিনিও উল্টে তাই করলেন। সেই সময়টায় লী আর কিছু করতে চাইলেন না। তাই আগে চাই সর্বাধিনায়কত্ব এবং সেটা পাবার পর তিনি বাহিনীকে একটু আস্বাদ দেবেন শৃঙ্খলা কাকে বলে তার।

কিন্তু আপাতত তাঁর সব জিনিসটাতেই বিরক্তি ধরে গিয়েছে। সৈনিকেরা ভীলটাউনে ছাউনি ফেলবার পরে ক্যাপ্টেন গামারসন তাঁকে এক মদের দোকানের খোঁজ দিলেন। লীর তখন এই কথায় সায় দেবার মতনই

মনের অবস্থা।

'এখান থেকে কত দূর?' জিজ্ঞাসা করলেন লী।

'তিন মাইল। যাবার মতো জায়গা কিন্তু।'

লী নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন যাব না। একটু চিত্তবিনোদন না হলে মানুষ তো ক্ষেপে যাবে।

লী জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরী মেয়ে আছে একটা?'

গামারসন হাতের ভঙ্গী করে বললেন, 'না, সে কালো।'

লীর দেহ কামনায় অধীর হয়ে উঠল।

'তার নাম অ্যানা।'

লী বললেন, 'আপনি জানেন তো ক্যাপ্টেন যে, বিবেচনা থাকলে যে কেউ আমার সঙ্গে অনেকদূর যেতে পারে।'

'আমার নিজের বিবেচনায় আমার আস্থা আছে, স্যর।'

'রেখে যান।'

ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে একদৃষ্টে সেই শুকনো, কুশ্রী, বিষণ্ণ লোকটির দিকে চেয়ে রইলেন যে একদিন পরেই হোক আর এক সপ্তাহ পরেই হোক জাতির নেতা হতে চলেছে। তাঁর এঁর প্রতি ভালোবাসাও নেই, অশ্রদ্ধাও নেই; ভাবলেন যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির বদলে কিছু টাকা এখন হাতে পেলে বেশী ভালো লাগত।

লী গেলেন কুকুরগুলোর কাছে। তিনি ঢুকতেই তাদের চিৎকার থেমে যায়; তারা ছুটে গিয়ে তাঁর গা বেয়ে উঠে স্বাগত জানায়, চুমো খায়। যাতে তারা তার মুখের কাছে আসতে পারে সেইজন্যে তিনি হাঁটু গেড়ে বসেন, স্নেহে কোমলতায় প্রায় মেয়েমানুষের মতো হয়ে যান।

আদরে বলে ওঠেন, 'বাচ্ছারা, বাচ্ছারা।'

কোলে এসে উঠে তারা তাঁর হাত মুখ চাটতে থাকে।

আদরে বলেন, 'কচি বাচ্ছারা সব। থাম, থাম। চুপ করে শুয়ে পড় সকলে।'

কথা শুনে তারা শুয়ে পড়ে। তিনি পকেট থেকে সব মিষ্টি বের করেন, একে একে এদের মধ্যে অনুগ্রহ বিলিয়ে দেন; তাদের কৃতজ্ঞতায় নিজের মুখ চাটতে দেন।

বলেন, 'বাচ্ছারা সব, কাল আবার দেখা হবে।'

ওরা বোঝে তিনি চলে যাচ্ছেন; চুপ করে শুয়ে থাকে; তাকায় তাঁর দিকে। ওদের বড় বড় চোখ জলে ভরে ওঠে।

'কাল, কাল—'

তিন মাইল দূরে বাস্কিংব্রিজে মদের দোকানটা। ছজন রক্ষী নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে গেলেন লী। একা যাওয়াই যদিও তিনি পছন্দ করতেন তবু বুঝলেন যে একজন সেনাপতির পক্ষে, রক্ষী না নিয়ে কোথাও যাওয়া, অমর্যাদাসূচক।

ঢুকে টুপি নাড়িয়ে অভিবাদন করে, লী যখন লম্বা লম্বা পা ফেলে, ভাঁটিখানায় ঢুকে নিজের পরিচয় দিলেন তখন সেখানে মোটে জনকয়েক জার্সির লোক ছিল। তারা চোখ বড় বড় করে তাকাল। তিনি বললেন, 'মহাদেশীয় বাহিনীর মেজর জেনারেল চার্লস লী!'

বেশ জাঁকের মাথায়, অথচ জবড়জঙ্গীর মতো বন্দুকগুলো হাতে নিয়ে, হিহি করে হাসতে হাসতে তার পেছন পেছন রক্ষীগুলোও সরাইখানায় ঢুকে পড়ে। জার্সির চাষীরা উঠে দাঁড়িয়ে জবুথবুভাবে প্রত্যভিবাদন করে ঘরের এক ধারে চলে গেল। হাত কচলাতে কচলাতে, অভিবাদন করতে করতে, নিজের জিভ চাটতে চাটতে ছুটে বেরিয়ে আসে সরাইখানার বেঁটে মালিক।

'দেশভক্ত স্যর, সত্যিকারের এক দেশভক্তের বাড়িতেই আপনি এসেছেন।'

ঘেরা জায়গাটার পেছনে মেয়েটিকে দেখে লী মুচকি হাসলেন। গামারসন যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমনটিই।

'মান্যবর, এই দীন কুটিরে আপনাকে আমি স্বাগত জানাই।'

'বেশ, বেশ। খাবার চাই, আর একটা বিছানা, পালকের বিছানা, বুঝলে?'

'ঠিক বুঝেছি, মান্যবর।'

'আর আমার লোকেদের থাকবার জায়গা।'

'আস্তাবলে—শুকনো-শাকনা, বেশ গরম, আরাম হবে। আমি কি এ কথা বলতে পারি মান্যবর যে, এই বাইশ বছরের মধ্যে, এই ভদ্র বাড়িতে এত সম্মানিত কখনও আমি হইনি।'

লী সদয়ভাবে বললেন, 'তা পার।'

'আমাদের খাবার কিন্তু সাদাসিধে, তবে রান্না ভালো। আমাদের খাবার খেয়ে আপনি নিরাশ হবেন না।'

লী কোট খুলে ফেলে অগ্নিকুণ্ডের পাশেই একখানা তুলোর গদি-দেওয়া ইজি-চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লেন; বললেন, 'এক বোতল মদ নিয়ে

এস, দেখি।'

'ক্ল্যারেট, না বার্গাণ্ডি, না ম্যাডীরা, না পোর্ট?'

লী ঠিক করলেন, 'ক্ল্যারেট।' খাসা গরম গরম লাগছে তাঁর। আরামই পাচ্ছেন। তাঁকে বেশ মর্যাদাই দেওয়া হচ্ছে। মেয়েটি মদ নিয়ে এসে, আগুন আর তাঁর মধ্যে দাঁড়িয়েছে। চেয়ারের দু দিক উঁচু থাকার জন্যে ঘরের অন্য স্থান থেকে সে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে না। তার উরুর ওপর লী হাত বুলিয়ে দিলেন হালকা করে। বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে সে এমন হিহি করে হাসতে লাগল যে তার হাত থেকে ট্রেখানা পড়ে যাবার উপক্রম হল।

'ওঃ মান্যবর, আপনি মানে—'

লী বললেন, 'মদ ঢাল; পেয়ার, মদ ঢাল।'

মেয়েটি মদ ঢালতে নীচু হতেই লী তাকে আবার আদর করেন। হাতে উষ্ণ, মসৃণ দেহের স্পর্শ লাগতেই তিনি দেহকামনায় কেঁপে ওঠেন।

দু বোতল মদ খেয়ে তিনি রাতের খাবারের জন্যে তৈরি হলেন। ততক্ষণে সরাইখানা খালি—রয়েছে শুধু সরাইয়ের মালিক আর মেয়েটি। লী জানেন না মেয়েটি ঐ সরাইয়ের পরিচারিকা না সরাই-মালিকের মেয়ে। যাই সে হোক না কেন মালিক তাকে লীর কাছে পাঠাল। সে খাবার দিয়ে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। লী খাচ্ছেন। খাবার ছিল একটি রোস্ট-করা পাতি-হাঁস, মাংসের কাবাব আর পুডিং; এক বোতল বার্গাণ্ডিও। তার ওপরে ছিল মাটির কুঁজোতে বাড়ির তৈরি পীচফলের ব্র্যাণ্ডি।

গত কয়েক মাসের মধ্যে এমন স্বস্তি, এমন কোমলতা লী পাননি; জগতের ওপর এত কম বিরক্তও বোধ করেননি। মেয়েদের ব্যাপারে পরিপক্ক লোক লী কখনও ছিলেন না তবু মেয়েদের সঙ্গে যা মেলামেশা করেছেন তাতে বুঝে নিলেন যে বেশী চেষ্টাচরিত্র না করেই মেয়েটিকে তিনি পেয়ে যাবেন। তাকে টেবিলে বসতে বলতেই সে হিহি করে হেসে উঠে বসতে অস্বীকার করেও তাঁর দিকে দেহ এগিয়ে দিয়ে, বড় ফুলে-ওঠা বেড়ালের মতো, নিজের পুরন্ত বুক ঘষে দিল তাঁর কাঁধে।

তাঁর পেট ভর্তি; মদে তিনি চুর। টেবিল থেকে উঠে, অগ্নিকুণ্ডের ধারে আরাম-কেদারায় বসতে যেতেই পেট ওয়েস্টকোট সেঁটে বসল। মেয়েটি রসের মিষ্টি পানীয় তৈরি করছিল তাঁর জন্যে। কলসীর মধ্যে আগুনে লাল ডাণ্ডা ভরতে ভরতে সন্তোষে সে দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস নিতে থাকে। তারপর লী যখন খাসা করে মগে চুমুক দিচ্ছেন তখন সে তাঁর জুতো খুলে পা দুখানা টুলের ওপর তলে দিল। ইতিমধ্যে লীর চোখে মেয়েটার সব স্থূলতাই উবে

গিয়েছে। সে হয়ে উঠেছে ছিমছাম, সুরুচিময়ী—একটি মেয়ে সম্পর্কে যা তিনি চিরকাল কল্পনা করে এসেছেন ঠিক তাই। তার চুল নাড়তে নাড়তে তার হাসিটাও তাঁর কাছে গানের সুরের মতো মনে হয়।

'আঃ পেয়ার, তোমাকে এত ভালো লাগছে!'

সে বোকা বোকা হেসে বলে, 'প্রতিদিন তো আর আমরা একজন সেনাপতি পাই না।'

'সে তো বটেই। একজন সেনাপতিও সব সময় রাজকন্যে পান না তাঁর ক্লান্তি দূর করবার জন্যে।'

'কি যে বলেন,' হেসে বলে মেয়েটি।

'একজন সেনাপতির জীবন ফুলের শয্যাও নয়, গৌরবময় পথও নয়।'

সে হাসতেই থাকে।

'তাঁর দুর্বল কাঁধের ওপর সমস্ত বাহিনীর এবং জাতির ভাগ্যের বোঝা চাপানো।'

সে মনে করে বলে, 'একবার একজন ব্রিটিশ কর্নেলকে দেখেছিলাম।'

'আমাদের শত্রুদের সঙ্গে আমরা সম্মানজনক ব্যবহার করব কিন্তু ভোগাব খুবই।'

'তাঁর পরনে ছিল সাদা ব্রিচেস আর লাল কোট। দেখতে বেশ।' ভুরু কুঁচকে আবার স্মরণ করে বলে, 'তাঁর একটা পেরুকও ছিল।'

লী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'আমার বাহিনী ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়জামা পরে লড়াই করে।'

মেয়েটার মনে পড়ে ছজন সৈনিককে সে যখন গোলাবাড়িতে তাদের শোবার জায়গা দেখাচ্ছিল সেই সময়কার কথা। সে ফট করে বলে ফেলে, 'ওদের গা দিয়ে দুর্গন্ধ বেরোয়।'

তৃতীয় মগ পানীয় খেয়ে তাঁর মেজাজটা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। নিজের জীবনের সমস্ত দুঃখ আর অভাব মনের মধ্যে ঠেলে উঠে যন্ত্রণা দিতে থাকে; বলতে থাকেন, 'গৌরবের পথ নিঃসঙ্গতার পথ। দুর্ভাগা আমি; নিঃসঙ্গ, কুৎসিত একটি লোক। কুকুরগুলো ছাড়া আমার কেউ বন্ধু নেই। ঈশ্বরের নামে বলছি, মানুষের চেয়ে তারা ভালো। তারা আমার সন্তান; তারা আমাকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। খুকী আমার, তুই আমার গৌরবের দিকে তাকাচ্ছিস কেন না আমার জামার বোতামগুলো ঝকঝক করছে। কিন্তু আমি এক হতভাগা, নিঃসঙ্গ মানুষ। উষ্ণ গৃহকোণ আমার নেই, মাথার ওপরে ছাদ নেই, বিদায় দেবার জন্যে সাধের বৌ-ও নেই, আর বাবা বলে

ডাকবার জন্যে কোন শিশুও নেই। আমার জন্যে আছে ছাউনির কেটলি। অন্য জানোয়ারদের মতো আমিও তাতে মুখ ডুবোই আর মাটিতে মাথা পেতে শুই…' মত্ত অবস্থার চোখের জল তাঁর চ্যাটাল গাল দুটো বেয়ে পড়তে থাকে ; নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়ে, মাথা দুলতে থাকে এপাশ থেকে ওপাশে।

মেয়েটি মৃদু হেসে বলে, 'শুতে আসুন।'

তিনি বিড়বিড় করে ওঠেন, 'বেশ্যার সঙ্গে শুতে যাওয়া! মুক্তিবাহিনীর নতুন সর্বাধিনায়কের কপালে এই!'

তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে যেতে যেতে সে হাসতেই থাকে।

ভোর চারটের সময় দরজায় বিষম ধাক্কায় তিনি জেগে ওঠেন। ঘরখানা অন্ধকার। মাথায় খুব যন্ত্রণা। মুখখানা কেমন বড় হয়ে গিয়েছে : বিশ্রী আস্বাদ মুখে।

বিড়বিড় করে ওঠেন, 'কে ওখানে?'

ধাক্কা চলতেই থাকে।

'কে?'

'মেজর উইলকিনসন।'

'মেজর উইলকিনসন হতচ্ছাড়া আবার কে?'

'সেনাপতি গেটসের কাছ থেকে খবর নিয়ে আসছি।'

'কার কাছ থেকে?'

'সেনাপতি গেটস্।'

'নরকে যাও, উচ্ছন্নে যাও : ও সব শোনবার সময় সকালে হবে।'

'খুব জরুরী খবর, স্যর।'

লীর মনে মেয়েটির কোমল এলিয়ে-দেওয়া দেহের অনুভব, কিন্তু আগের রাত্রিটা অসংখ্য গ্লাস মদ আর রসের পানীয়ে যেন কেমন রহস্যে আবৃত হয়ে আছে। কম্বলের তলা থেকে মেয়েটাকে টেনে বের করে তার মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলেন লী : সে ভয় পেয়ে, হতভম্ব বেড়ালের বাচ্ছার মতো হুঁ-হুঁ করে কেঁদে উঠল।

লী বলে উঠলেন, 'তুই কে রে, শালী?'

'অ্যানা।'

'কে?'

ভয় পেয়ে আগের রাত্রের সব কথা সে বলতে শুরু করতেই তিনি চেঁচিয়ে

উঠলেন, 'শালী, বেরো এখান থেকে ; উচ্ছন্নে যা !'

সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দরজার দিকে যেতেই তিনি অন্ধকারে ধরে ফিসফিস করে বললেন, 'খাটের তলায় যা !'

'কি ?'

'আরে মলো, খাটের তলায় !'

তখনও ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নীচে গেলে লী দরজা খুললেন। সরাইখানার বেঁটে মালিকের সঙ্গে উইলকিনসন নামে লোকটি দাঁড়িয়ে। মালিকের গায়ে রাতে পরবার লম্বা জামা। তার কম্পমান হাতে একটা মোমবাতি। উইলকিনসন উনিশ বছরের ছেলে। মুখে হাসির ভান। সরাই-মালিকের কাছ থেকে যে সব বিশ্রী কথা সে জেনে নিয়েছে তার চোখের ভাবে তা ফুটে উঠেছে।

'কি খবর ?'

'এই চিঠিখানা, স্যর,' চিঠিখানা লীকে এগিয়ে দিয়ে উইলকিনসন বলে।

'কে পাঠিয়েছে ? এর মানেটা কি, অ্যাঁ ?'

'সেনাপতি গেটস্‌। ওয়ালপেকের কাছে তিনি চারটি রেজিমেন্ট নিয়ে রয়েছেন।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। তিনি এখান থেকে একশো মাইলের মধ্যে নেই।'

চিঠিখানি টেনে নিয়ে আলোয় ধরে তিনি বলেন, 'এ তো ওয়াশিংটনকে লেখা !'

মজামারা আতঙ্কে উইলকিনসন বলে, 'ঈশ্বরের দোহাই, স্যর, আমি জানি না জেনারেল ওয়াশিংটন কোথায় ; জেনারেল গেটস্‌ও জানেন না। এই পোড়া দেশটায় কেউই জানে না। ওয়াশিংটন অসুবিধায় পড়েছেন জেনে শুইলার চার রেজিমেন্ট সৈনিক দিয়ে গেটস্‌কে পাঠিয়েছেন, কিন্তু জেনারেলও তাঁকে খুঁজে পেলেন না, আমিও না। সারা রাত্রি আমি ঘোড়ার পিঠে, স্যর। সারা শরীর এমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে যে নড়তে পারছি না।'

'ঠিক আছে।'

খামখানা ছিঁড়ে চিঠি বের করে বললেন, 'ঠিক আছে। এখান থেকে যাও এখন ; একখানা কম্বল পেতে কোনখানে শুয়ে পড়।'

গুটিশুটি হয়ে বিছানার নীচে যেতে করুণ কান্নার আওয়াজ লীকে মেয়েটির কথা মনে করিয়ে দেয়।

'বেরিয়ে আয়!' বাতিটা তিনি ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। এইবার তিনি মেয়েটাকে একটু একটু দেখতে পেলেন—ফোলা মুখ, লাল চোখ আর কোমর পর্যন্ত ঝুলে-পড়া তারের মতো চুল।

'তুমি কে?'

ফুঁপিয়ে মেয়েটি বলে ওঠে, 'অ্যানা, অ্যানা।'

চোখ কচলে, শুকিয়ে-যাওয়া গলা দিয়ে ভালো করে নিশ্বাস নিলেন লী। একটু একটু করে গত রাত্রির কথা মনে এল। কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে তিনি বললেন, 'রস যোগাড় করতে পার?'

সাগ্রহে মাথা নাড়ল মেয়েটি।

'নিয়ে এস।'

টিনের একটি পাত্রে পানীয় নিয়ে এলে তিনি ঢক ঢক করে খেতেই, গলায় আগুনের তাতে তাঁর প্রায় শ্বাসরোধ হয়ে এল। কিন্তু গলা দিয়ে নামতেই বেশ ভালো লাগল। পাতলা একটা জামা-পরা মেয়েটি ধীরেসুস্থে বিছানার পায়ের কাছে বসে, কৌতূহল ও বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে থেকে থেকে বললে, 'জেনারেল লী!'

'কি?'

মুখ ভেঙিয়ে হিহি করে হেসে, সে নিজের পেটে হাত বুলোতে লাগল।

কুঁতিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'বেরিয়ে যা!'

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাতে তাকাতে, হাসতে হাসতে সে দরজার দিকে গেল। লী গড়িয়ে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজলেন।

বাতিটা পুড়ে শেষ হয়ে গেল; নোংরা ছোট্ট জানলা দিয়ে প্রভাত চুঁইয়ে এল ঘরের মধ্যে। বিছানায় উঠে বসে, সামনের দিকে তাকিয়ে, নিজের প্রতি ঘেন্না এল তাঁর। হতভাগা। পেটে টক টক আস্বাদ; অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। আস্তে আস্তে সমানে ঢেকুর উঠতে থাকে। সামনে প্রসারিত হাত দুখানা পাশ-বালিশের গায়ে হলদে দেখাচ্ছে। উঠে বসার মতো জোর বা ইচ্ছা হতে হতে প্রায় আটটা বেজে গেল। পায়ে চটি গলিয়ে, হোঁচোট খেতে খেতে, যেখানে কোট ঝুলছিল সেইদিকে গেলেন। রাতের জামার ওপর কোনরকমে কোটটি চাপিয়ে, মুখ না ধুয়েই, দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

আগুন পোয়াতে পোয়াতে উইলকিনসন তৈরি হয়েই ছিল: লীকে দেখে হাসল এবং এমন করে তাকিয়ে রইল যেন নিজের চোখকে সে

বিশ্বাসই করতে পারছে না।

লী নিরাগ্রহে শুধোলেন, 'তাকিয়ে কি দেখছ?'

উইলকিনসন ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল, 'কিছু না, স্যর।'

'আমাকে?'

'মনে কিছু করবেন না, স্যর।' বিনীত ক্ষমা প্রার্থনায় অপমান করার ইঙ্গিত।

'গোল্লায় যাও! মনে আবার কি করব,' বললেন লী। মহাদেশীয় বাহিনীর পরবর্তী সর্বাধিনায়ককে দেখছে, এই মনে করে লীর মনে একটু সন্তোষ এল। আরাম-কেদারায় বসে পড়ে ছেলেটিকে আর একটু কোমল করে বললেন, 'একটু মদ নিয়ে এস তো মেজর।'

'রস?'

মুখ গোমরা করে লী মাথা নাড়লেন, 'রস।' চেয়ারখানা আগুনের কাছে টেনে নিয়ে তিনি গেলাসটিকে শেষ করলেন; তারপর নিজের হাত আর খালি পা আগুনে সেঁকতে লাগলেন। সরাই-মালিক এগিয়ে আসে প্রাতরাশের কথা জিজ্ঞাসা করতে কিন্তু লী গর্জে উঠে, হাত নেড়ে, কয়েকবার ঢোক গিললেন।

উইলকিনসন শুরু করে, 'সেই চিঠিখানা সম্পর্কে, স্যর।'

'দূর হোক ছাই! তুমি জান ওয়াশিংটন এখন কোথায়?'

'জানি না, স্যর—বোধহয় ডেলাওয়ারের ওপারে।'

'আমিও তো জানি না। বেঁচে আছেন কি মরেছেন কি তাঁর কোন বাহিনী আছে কি না তাও জানি না। তবে তাতে কিছু যায় আসে না। আরে গেল যা, আমার দিকে তাকাবে না অমন করে। আমি বলেছি তাতে কিছু যায় আসে না।'

'হ্যাঁ স্যর, আপনার মতই আমারও মত।' সে আবার হাসে, নিজেকে ওঁর ঘনিষ্ঠ করে তোলবার আশায়।

'যদি চাও প্রাতরাশ খেয়ে নাও।'

'আমার তেমন খিদে পায়নি, স্যর

'দূর হোক গে যাক, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে অমন করে চেয়ে থেকো না।'

আগ্রহহীনভাবে তখনও তিনি আগুনের ধারে বসে আছেন এমন সময় তাঁর অ্যাডজুট্যান্ট কর্নেল স্ক্যামেল এসে পৌঁছলেন। এখন নটা বেজে গিয়েছে। কিন্তু বড় রাস্তার ধারে সরাইখানাটা না থাকায় এখনও কোন

খদ্দের এসে জোটেনি। এবং লী-ই একমাত্র অতিথি যিনি সেখানে রাত কাটিয়েছেন। মেয়েটা রান্নাঘরে আত্মগোপন করেছে। মালিকের বকুনির কিচিরমিচিরেও তাকে আর বসবার ঘরে আনতে পারল না। রাতের জামার ওপরে কোটটা পরে লী সেখানে খালি পায়ে বসে আছেন।

লীর চেহারা দেখে স্ক্যামেলও যত বিস্মিত উইলকিনসনও তাই ; কিন্তু নিজেকে আর একটু সামলে নিয়ে, অভিবাদনটি করতে তার মনে ছিল।

অ্যাডজুট্যান্টের দিকে একবার তাকিয়ে, আগুনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে লী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি ?'

'জেনারেল সুলিভ্যান মার্চ করে যাবার আদেশ চাইছেন, স্যর।'

'মার্চের আদেশ ?'

'হ্যাঁ, স্যর।'

লী আগুনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'মার্চের আদেশ চাইছেন কেন ?'

'আমার মনে হয়, স্যর, উনি মনে করেন না যে আপনি ভীলটাউনে কোন স্থায়ী আসন গাড়তে চান না।'

'চাই না ? যত্তসব ! স্ক্যামেল, কোথায় তিনি মার্চ করে যেতে চান ?'

'সেটা আমি জানি না। সেটা আপনার ওপর নির্ভর করে।'

'তোমার কোন বেয়াদবি আমি বরদাস্ত করব না, স্ক্যামেল।' ভীষণ রাগে অ্যাডজুট্যান্টের দিকে তাকিয়ে লী চেঁচিয়ে ওঠেন। অ্যাডজুট্যান্ট অবিচলিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে কোমল কণ্ঠে বলেন, 'দুঃখিত, স্যর, আমি কোন বেয়াদবি করতে চাইনি।'

লী বিড়বিড় করে ওঠেন, 'আমি দুঃখিত। মাথাটা আমার ফেটে যাচ্ছে !'

'আমি কিছু করতে পারি কি ?'

'না—না। একখানা ম্যাপ আছে কাছে ?'

স্ক্যামেল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে তাঁর থলি থেকে ম্যাপ নিয়ে এসে, টেবিলের ওপর পেতে ধরতেই লী নিজেকে চেয়ার থেকে টেনে আনলেন সেখানি দেখবার জন্যে। অক্ষর, পংক্তি, নদনদী, শহর—সব চোখের সামনে কেমন তাল পাকিয়ে গেল। দুই প্রসারিত হাতের ওপর ভর দিয়ে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত উইলকিনসন একখানা চেয়ার এনে তাতে তাঁকে বসিয়ে দিল। স্ক্যামেল আর উইলকিনসন তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে দেখছেন আর লী একটা আঁকাবাঁকা দাগ টেনে চলেছেন

জীলটাউন থেকে প্লাকামিন পর্যন্ত। ঐখানে তাঁর আঙুল থেমে যেতেই উইলকিনসন আর স্ক্যামেলের চোখাচোখি হল।

'প্লাকনাম,' বললেন লী।

যেন সব জানে শোনে এইভাবে উইলকিনসন দাঁত বের করে হাসল।

স্ক্যামেল মন্তব্য করলেন, 'এখান থেকে সাত মাইলের বেশী নয়, স্যর।'

'অ্যাঁ?'

'বললাম যে এই মার্চটা খুব অল্পই, স্যর।'

'বেশী হতে যাবে কেন, স্ক্যামেল?'

'তাই তো বলছি, স্যর। কিন্তু জেনারেল সুলিভ্যানের ধারণা এই যে আমরা জেনারেল ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি।'

'সুলিভ্যানকে বল যে আমি আমার যেমন খুশি তেমনি চলব। তাকে বলে দাও, স্ক্যামেল।'

'দিচ্ছি, স্যর।' স্ক্যামেল গোড়ালির ওপর ঘুরে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

স্ক্যামেলের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি উইলকিনসনের দিকে ফিরে, কলহ করার ইচ্ছায় জানতে চাইলেন, 'আমার বাহিনীটা দেখেছ? তাদের জুতোগুলো দেখেছো? আর জামাকাপড়গুলো?'

মাথা নাড়ল উইলকিনসন। নিজের প্রতি করুণায় লীর মন ভরে গেল; লাল চোখ ভিজে ভিজে, নীচের ঠোঁট কাঁপছে। আহত হয়ে, যেন করুণা চেয়েই, বলে উঠলেন, 'ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগ দিতে। হুঁঃ! ওদের জুতোগুলো দেখেছ? আর জানবই বা কি করে ওয়াশিংটন কোথায়? কেউ কি জানে?'

ঘাড় নেড়ে মেজর টেবিলে গিয়ে বসলেন। সরাই-মালিক প্রাতরাশের জন্যে ডিসগুলো সাজিয়ে রাখছিল। আগে খিদে না বুঝলেও লী এখন গোগ্রাসে খেতে লাগলেন—ডিম, প্যানকেক, শুয়োরের শুকনো মাংস। যেন সপ্তাহখানেক উপোসী আছেন এইভাবে রুটির মোটা মোটা টুকরো মুখে গুঁজছেন। মেয়েটা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘেরা জায়গাটার ওপাশে দাঁড়ায়, দাঁত বার করে হাসে আর উরুর ওপর হাত ঘষে। তার চোখ চলে যায় উইলকিনসনের দিকে। উইলকিনসন দাঁত বার করে হেসে কামুকের মতো চোখ মটকাল।

লী বিড়বিড় করে ওঠেন, 'বেহায়া কোথাকার।'

'মেয়েটা কে ?'

জমিদারী সন্তোষে লী তাকে দান করেই বললেন, 'তোমারই।' টেবিলের ওপর চাপড় মেরে সরাই-মালিককে বললেন কালি কলম কাগজ দিতে। উইলকিনসনকে লী বললেন, 'তোমার জেনারেল গেটসের কান আমি পুড়িয়ে দেব। শুনে রাখ, নতুন একটা আদেশ আসছে। আমি একটা মানুষকে মারতেও পারি রাখতেও পারি, উইলকিনসন। বুঝতে পারছ!'

ছেলেটি কিছুই জানে না এমনি ভাবে হেসে বলে, 'স্যর, আমাকে নিয়ে নেবেন আশা করি। আমার মতে, পুরনো হুকুমটা যাচ্ছেতাই বাজে ছিল।'

'মারতে পারি, রাখতে পারি,' লী জোর দিয়ে বলেন।

উইলকিনসন উঠে সরে যায় জানলার দিকে আর লী কলম চেপে ধরে তীব্র বেগে লিখে চলেন :

"ফোর্ট ওয়াশিংটনের ব্যাপার যে নিপুণ কৌতূহলে পরিচালনা করা হয়েছে তাতে আমরা যে সুব্যবস্থাটি গড়ে তুলছিলাম তা একেবারেই পর্যুদস্ত হয়েছে। কি যাচ্ছেতাই কাজ যে করা হয়েছে তা আর বলা যায় না; নিজেদের মধ্যে বলছি, একজন উচ্চ পদের লোক কাজে একেবারে অনুপযুক্ত। তিনি আমাকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলেছেন যে কোন্ ঝুঁকিটা নেব ঠিক করতে পারছি না। এখানে থাকলে আমার এবং বাহিনীর বিপদ; আর যদি না থাকি তাহলে এই অঞ্চলটি একেবারে যাবে…"

উইলকিনসন জানলার বাইরে চেয়ে ছিল। সেখান থেকে, শখানেক গজ দূরে রাস্তার ওপর কি একটা দেখা যায়। ব্রিটিশ ড্রাগুনের একটা দল বাঁক ঘুরে বেরিয়েই পিস্তল খুলে ছুটে এল সরাইখানার দিকে। এই আসাটা অসঙ্গতও নয়, অসম্ভবও নয়। ছোট্ট একটা খারাপ নাটকের এটা খারাপ পরিসমাপ্তি। এই সব কিছুতেই উইলকিনসনের মনে হল সে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আছে।

চিঠিখানি লেখা মোটে শেষ করে লী সই করতে যাবেন এমন সময় ঘোড়ার খুরের অবিরাম আওয়াজ। পেছন না ফিরেই উইলকিনসনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কি?'

অদ্ভুত শান্ত উত্তর এল, 'ব্রিটিশ অশ্বারোহীর দল।'

লী চিঠিখানি মুড়ে, চেয়ার থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ঘুরপাক খেয়ে বলে উঠলেন, 'কি?'

উইলকিনসনের শান্ত উত্তর, 'ব্রিটিশ অশ্বারোহী।'

'কোথায়? হায় কপাল! কি করে?' লী দাঁড়িয়ে আলুথালু অবস্থায়,

শক্তি নেই কিছু করবার, এক পায়ে চটি নেই ; করুণ অবস্থায় দু পাশে হাত দুখানা ঝুলছে ; মাথাটা পাখীর মতো সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্রহরীরা কোথায় !' করুণ স্বর।

উইলকিনসন ইতিমধ্যেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছেন।

লী চিৎকার করে উঠলেন, 'এ কি উইলকিনসন, তুমি যাচ্ছ কোথায় ?'

ছেলেটি খুশির স্বরে বলল, 'নিজের চামড়া বাঁচাতে। আমি ওটাকে বেশ ভালোবাসি।'

বাড়িখানার যেদিকে ভাঁড়া সেইদিকে বন্দুকগুলো গাদা করে রেখেছে প্রহরীরা ; পরে শীত লাগায় রোদ্দুরের দিকে গিয়েছে একটু গরম হবার জন্যে. বন্দুকগুলোকে সরাইখানার ওপাশে গাদা করে রেখেই ; তারা তখন রোদই পোয়াচ্ছে। মেয়েটা রসের গরম সরবৎ নিয়ে এলে সেটা শেষ করেই চেপে ধরল মেয়েটাকে এবং কে তার দেহের সবচেয়ে মনোরম অংশে হাত দেবে এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ধস্তাধস্তি বেধে গেল। চিৎকার করে মেয়েটা হাসছে আর তারা তাকে টানতে টানতে গোলাঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় ব্রিটিশ ড্র্যাগুনদের আবির্ভাব। তারা ওকে ছেড়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকে বোকার মতো আর মেয়েটা বড় বড় চোখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঐ জাঁকজমকওয়ালা ঘোড়সওয়ারদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দল ভেঙে তারা এদিক ওদিক ছুটতে থাকে ; পেছনে ড্র্যাগুনেরা তাদের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তলোয়ারের ভোঁতা দিক দিয়ে পিটোতে থাকে।

আরাম-কেদারাখানা ধরে আগুনের পাশে লী দাঁড়িয়ে। রয়্যাল ড্র্যাগুন-দলের কর্নেল হারকোর্ট সরাইখানায় ঢুকলেন। পরে তিনি বলেছিলেন যে জীবনে কখনও তিনি এত হাস্যকর অথচ করুণ এবং দুঃখজনক কিছু দেখেননি। এঁদের দুজনের দীর্ঘকালের পরিচয়। অতীতে লী যখন ব্রিটিশ অফিসার ছিলেন তখন এই ড্র্যাগুনেরাই তাঁর রেজিমেন্ট ছিল। এখন লীর মনে হচ্ছে যে ভাগ্যের এক ভীষণ, যন্ত্রণাদায়ক পরিহাস এই সরাইখানায় তাঁর থাকাটা পরিকল্পনা করেছিল। তারই এই পরিণতি। যেন ভূত দেখছেন এমনিভাবে হারকোটের দিকে তাকিয়ে লী কম্পিত হাতে কোটের বোতাম লাগাবার চেষ্টা করলেন। তাতে যদি নোংরা কোঁচকানো রাতের জামাটা ঢাকা পড়ে।

হারকোর্ট মুচকি হেসে মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাকে দেখে খুশি হয়েছ, লী ?'

চেয়ারখানা ছেড়ে দিয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লী একটু মর্যাদা খুঁজে পাবার চেষ্টা করলেন ; এদিকে ওদিকে একটু টলে গিয়ে খালি পা ঢাকবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গা বমি দিয়ে উঠে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হল। ক্যাপ্টেন হ্যারিসকেও তাঁর মনে আছে। তিনিও এসে ঢুকলেন ; হ্যারিস তরুণ, সুদর্শন, জামাকাপড়ে একেবারে দুরস্ত। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে লীকে তিনি দেখতে লাগলেন।

লী ফিসফিস করে বললেন, 'আমাকে নিয়ে আপনি কি করতে চান, স্যর ?'

'বোধহয় ফাঁসিতে লটকাব,' হারকোর্ট নিস্পৃহভাবে উত্তর দিলেন।

'না—না। হে ঈশ্বর ! না, তা করবেন না !'

পকেট থেকে সুগন্ধি রুমাল বের করে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে শুঁকতে থাকেন হারকোর্ট।

ফিসফিসিয়ে ওঠেন লী, 'আপনি আমাকে ফাঁসি দিতে পারেন না।'

হ্যারিস জিজ্ঞাসা করেন, 'এঁকে নিয়ে কি করব, স্যর ?'

'বাইরে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় চাপাও।'

'জামাকাপড় পরে নিতে দেবেন না, স্যর ?'

হারকোর্ট এক পা পিছিয়ে গেলেন। রুমালখানা হাতে দুলছে। লীকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করতে থাকেন তিনি ; তারপর টেনে টেনে বলেন, 'না, বাস্তবিক, তা বোধহয় করা হবে না, তা বোধহয় না। এমনিতেই দেখতে কত ভালো। ক্যাপ্টেন হ্যারিস, তাই মনে হচ্ছে না কি ?'

লী মিনতি করলেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, স্যর, আমাকে ইউনিফর্মটা পরে নিতে দিন।'

'আপনি কি ইউনিফর্ম পরে নেই, মিঃ লী ?'

'আমার পদের মর্যাদাটাও তো দেবেন।'

কর্নেল কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দেন, 'আপনার কোন পদমর্যাদা নেই। হ্যারিস, এঁকে বাইরে নিয়ে যাও।'

খাটের তলা থেকে বেরিয়ে জানলার কাছে গেলে উইলকিনসন। ড্র্যাগুনেরা জেনারেল লীকে মাঝখানে নিয়ে নিউ ব্রান্সউইকের দিকে চলেছে ঘোড়ায় চড়ে। ইউনিফর্ম থেকে ধুলো ঝেড়ে নীচে বাহরের ঘরে গিয়ে উইলকিনসন দেখে সরাই-মালিক দুঃখ করছে যে লী টাকাপয়সা দিয়ে যাননি। সে উইলকিনসনকে বলল, 'দু দু পাউণ্ড। আমি গরীব মানুষ। সাতটা ডিনার, আটটা প্রাতরাশ, ঘোড়ার জন্যে খরচ—সব মিলিয়ে দু পাউণ্ড !'

উইলকিনসন বলল, 'তুই মরগে যা।'

সে বাইরে গিয়ে দেখে মেয়েটা দাঁড়িয়ে তাকে দেখে মুচকি হাসছে, আর তার দিকে এগিয়ে আসছে পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে। দুর্দশাগ্রস্ত, ছেঁড়াখোঁড়া জামাজোড়ায় কয়েকজন প্রহরী পা টেনে টেনে সরাইখানায় ফের ঢুকছে। মেয়েটি উইলকিনসনের খুব কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে উঠল। প্রহরীগুলো ভীত, পরিত্যক্ত। একজনের কানের ওপরে মস্ত কাটা থেকে রক্ত ঝরছে। তারা উইলকিনসনের দিকে তাকিয়ে তার মেজাজটা বোঝবার চেষ্টা করছে। এইবারে মেয়েটা আবার কাছে এসে উইলকিনসনের বাহুর ওপর হাত রাখল। উইলকিনসন ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মুখে নির্দয় এক থাবড়া মারল, চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বেশ্যে কোথাকার! নোংরা খানকি!'

লীর বাহিনীর অবশিষ্ট সেনাপতি সুলিভ্যান সম্প্রতি ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন ব্রুকলিনে, ছিলেন ব্রিটিশ জেলে। শেষ পর্যন্ত ভার্জিনিয়ান এক ব্রিটিশ অফিসারকে হাতে পেয়ে তাঁর সঙ্গে বদল করেন। সেই থেকে তিনি লীর সঙ্গে কাজ করছিলেন। সম্পর্ক বিশেষ ভালো ছিল না। লীর উদ্দেশ্যে সন্দেহ করে তিনি বুঝেছিলেন যে সর্বাধিনায়কের পক্ষে এর ফল শুভ হবে না। বিপ্লবের যেটুকু বাকী আছে তার সব শেষ হবে। তবু, এখন, তাঁর আদেশ মানা ছাড়া উপায় ছিল না এবং স্ক্যামেল যখন এসে সরাইখানার অদ্ভুত ঘটনার কথা বললেন তখন সুলিভ্যান ঘাড় ঝাঁকিয়ে, ছাউনি তোলার আদেশ দিয়ে প্লাকামিনের দিকে এগোতে বললেন। একেবারে না নড়ার চেয়ে সাত মাইল মার্চ করা তো ভালো।

এর ঘণ্টা দুই পরে, বাহিনী যখন চলতে শুরু করেছে তখন উইলকিনসন এসে উপস্থিত। আগের দিন রাতে যখন সে লীর খোঁজে এসেছিল তখন সুলিভ্যানের সঙ্গে তার দেখা হয়। তখন তাকে এই সরাইখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুলিভ্যান রূঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন এখন আর স্ক্যামেল গত রাতের স্মৃতিতে মুখ বিকৃত করে বললেন, 'সেনাপতিকে ভালোয় ভালোয় রেখে এসেছেন তো?'

ঠোঁট চেটে হাসির ভান করে, শান্তভাবে হিসেব করে, দুই অফিসারের দিকে তাকাল সে। একেবারেই আত্মকেন্দ্রিক, জন্ম থেকেই ষড়যন্ত্র-পরায়ণ উইলকিনসন, ওপরে ওপরে অন্ততঃ পাহাড়ের মতো কঠিন। উনিশ বছর মোটে বয়েস হওয়া সত্ত্বেও সে দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিদের এই কাড়াকাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, বিপ্লবের মই বেয়ে গৌরবের শিখরে উঠতে। লী যে

ধরা পড়েছেন এতে তার একটুও মাথাব্যথা নেই। লীকে সে একটা নির্বুদ্ধি বর্বরই মনে করত, নিজের ভোগসুখে নিজেই সেদ্ধ হবার মতো বোকা। তাই পথ থেকে সরে গিয়ে ভালোই হয়েছে। যেটা উইলকিনসনকে ভাবাচ্ছে সেটা হল একটা সন্দেহঃ এখনও আলগা আলগা, এই যে ভার্জিনিয়ানকে ডোবাবার বহুবিস্তৃত ষড়যন্ত্র, তাতে সুলিভ্যান এবং স্ক্যামেল কতখানি জড়িত। এখনও পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের প্রধান দুই সমর্থক ছিলেন গেটস্ এবং লী। অফিসারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে উইলকিনসন ইচ্ছে করেই, একেবারে সোজাসুজি, উত্তরটি দিল একটু হেসে।

'বেশ ভালোই রেখে এসেছি, তবে ব্রিটিশদের হাতে।'

বাহিনীর সঙ্গে ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ধীরে ধীরে ; এইবার যেন নীরব কোন সর্ত অনুসারেই ঘোড়াগুলো থেমে গেল। স্ক্যামেল চোখ মিটমিট করে তাকাচ্ছেন আর সুলিভ্যান কঠিন, নীল চোখে চেয়ে আছেন ছেলেটির দিকে। উইলকিনসনের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই সুলিভ্যান নেমে পড়লেন ঘোড়া থেকে। স্ক্যামেলও নামলেন, ছেলেটিও নামল।

উইলকিনসনের প্রতি ঘৃণা চাপতে না পেরে সুলিভ্যান বলে উঠলেন, 'সেটা হাসির কিছু নয়, বর্বর কোথাকার!'

তিনজনে এখন কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আর তাঁদের অদূরে পা টেনে টেনে চলা সীমাহীন, বিরক্তিকর দৃশ্য।

উইলকিনসন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'উচ্ছন্নে যেতে পারেন আপনারা! আমি সত্যি কথাই বলেছি।'

সুলিভ্যান স্ক্যামেলের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই ছোকরা বদমায়েসটা বলে কি ?'

'বুঝছি না, স্যর। আমি তো আপনাকে বলেছি, কিছুক্ষণ আগে লীকে কি অবস্থায় দেখে এসেছি এবং তিনি কি বলেছেন। তখন পর্যন্ত তিনি ঠিকই ছিলেন।'

চিৎকার করে ওঠে উইলকিনসন, 'ওরকম করে আমার সঙ্গে কথা বলার কোন অধিকার নেই আপনাদের, বলে দিচ্ছি। আমি একজন মেজর। আপনাদের কাছ থেকে ঐ সব সহ্য করব না।'

ছেলেটির কোটের তলা চেপে ধরে সুলিভ্যান বলেন, 'থাম্!' তাকান হেঁটে-চলা বাহিনীর দিকে। 'থাম্ বলছি! নইলে মেরে ফেলব! ঘৃণ্য কুকুরের বাচ্ছা কোথাকার!'

সুলিভ্যানের চোখের দৃষ্টিতে উইলকিনসনের ভয় লাগল। ছেলেটার কোট না ছেড়ে দিয়েই সুলিভ্যান জানতে চাইলেন, 'লীর কি হয়েছে?'

'কেউ যেন ড্র্যাগুনদের ডেকে এনেছিল। তারা লীকে নিয়ে গেল।'

'কে?'

'আমি জানি না।'

'কে? উইলকিনসন? তোকে মেরে ফেলতেও পারি, নাও পারি। বল্‌!'

ছেলেটি প্রতিবাদ করে, 'আমি নই, হায় ঈশ্বর, আমি লীকে সরাতে চাইব কেন? ড্র্যাগুনেরা তাঁকে ধরে নিয়ে যাক এ আমি চাইব কেন?'

সুলিভ্যান তাকে ছেড়ে দিয়ে চিন্তান্বিত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, তাই তো, কেন—'

উইলকিনসন প্রায় কেঁদে ফেলেছিল; বানিয়ে বলল, 'আমি তাঁকে সাহায্য করবার চেষ্টা করেছিলাম। অতগুলো ড্র্যাগুনের বিরুদ্ধে আমি একা। বজ্জাত প্রহরীগুলো পালিয়েছিল। দুই হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে, দরজায় দাঁড়িয়ে আমি বলেছিলাম—যে আগে ঘরে ঢুকবে তাকেই গুলি করব—'

স্ক্যামেল হাসলেন। সুলিভ্যান শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকেও তারা ধরে নিয়ে গেল না কেন, উইলকিনসন? না কি, তোমাকে তাদের কোন দরকারেই লাগত না?'

'লী আত্মসমর্পণ করলেন। যখন দেখলাম আর কোন আশা নেই তখন আমি ওপর তলায় চলে গেলাম।'

'তুমি একটি জঘন্য মিথ্যাবাদী,' বললেন সুলিভ্যান।

উইলকিনসন কোনমতে চুপ করে থাকলেও যে ভাবে সে সুলিভ্যানের দিকে তাকাল তাতে তার মনোভাব গোপন রইল না। তার সাদা, চাপা, পাতলা ঠোঁট একটু কেঁপে উঠল এবং স্ক্যামেল ভাবলেন, একদিন না একদিন সুলিভ্যানের পেছনে ও গুলি বিঁধোবে, যদি অবশ্য আগে ও মারা না পড়ে। সেটাও অসম্ভব নয়।

মাথা নেড়ে সুলিভ্যান বললেন, 'তোমার গল্প বলে যাও।'

বাকীটুকু বলে, সে সুলিভ্যানকে চিঠিখানি দিয়ে বলতে লাগল, 'লীকে যখন ওরা ধরে নিয়ে গেল তখন তিনি এই চিঠিখানি লিখছিলেন। পরে আমি এখানি টেবিলে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।' সেনাপতি চিঠিখানি যখন পড়ছেন তখন তাঁর মুখখানা উইলকিনসন নিরীক্ষণ করছিল

তাঁর প্রতিক্রিয়া বোঝবার জন্যে। কিন্তু বুঝল না কিছু। সুলিভ্যান মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'চিঠিতে কি আছে তুমি জান?'

মিথ্যে কথা বলল উইলকিনসন, 'না।'

চিঠিখানা সুলিভ্যান স্ক্যামেলকে দিলে তিনি সেখানি পড়ে ফেরত দিলেন কোন কথা না বলে। চিন্তান্বিতভাবে, কিছুটা অস্বস্তিতে সুলিভ্যান চুপ করে থাকায় উইলকিনসন আত্মপ্রত্যয়ে আবার সদম্ভে বকতে শুরু করল।

সুলিভ্যান তাকে চিঠিখানি দিয়ে বললেন, 'সেনাপতি গেটসের কাছে নিয়ে যাও।'

আর একবার হেসে উইলকিনসন জানতে চাইল, 'আপনি কি করতে চাইছেন এ সম্পর্কে তাঁকে কি বলব?'

স্ক্যামেল আর সুলিভ্যান দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর সুলিভ্যান আস্তে আস্তে, বিপজ্জনক ভাবে বললেন, 'উইলকিনসন, তাঁকে চিঠিখানা দিয়ে বলবে যে, আমি সেনাপতি ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি—বলবে যে আমার কার্যক্রমে কারও আপত্তি থাকলে সে গোল্লায় যেতে পারে, উচ্ছন্নে যেতে পারে। তাঁকে এ কথাটা বলবে।'

লী যে ধরা পড়েছেন এ কথাটা বাহিনীতে জানাজানি হয়ে গেল, বোধহয় লীর দেহরক্ষীদের কাছ থেকেই। তারা নিজেদের রেজিমেন্টে ফিরে এল একে ছুইয়ে। আবার অফিসারদের কাছ থেকেও হতে পারে। তাদের তো খবরটা দিতে হল। কেন মার্চের গতি পরিবর্তন করতে হল তাও বলতে হল। যাই হোক উইলকিনসন খবরটা আনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সারা বাহিনী জল্পনা-কল্পনায় মুখর হয়ে ওঠে; মনোভাব এবং উদ্দেশ্যের পরিবর্তন তখনই প্রকট হয়ে ওঠে। সুলিভ্যান তখনও ব্যাপারটা পুরো বুঝে উঠতে না পেরে, প্রায় করুণভাবে স্ক্যামেলকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কিন্তু ওরা জানতে পারল কি করে যে উনি সরাইখানায় আছেন। লী এবং গেটসের সঙ্গে সে তো গলা পর্যন্ত এর মধ্যে ডুবে আছে—ঐ ছোকরা বেজন্মাটা—তবু যে কেন—'

'তারা কি করে জানতে পারবে, বলছেন? প্রত্যেকেই জানত। এই অঞ্চলটা টোরিতে ভর্তি।'

'ওর ঘৃণ্য ঘাড়টা আমার মটকে দেওয়া উচিত ছিল!'

স্ক্যামেল বললেন, 'মনে হয় না ও বলে দিয়েছে। ও বলে দেবে কেন?'

'ঈশ্বর জানেন!'

বাহিনী মার্চ করতে করতে ঘেমে নেয়ে উঠল এবং বিকেল হতে হতেই শীর বন্দী হবার আকস্মিক ফল বোঝা গেল। দুশোজন ম্যাসাচুসেটসের সৈনিক অবিচলিতভাবে বাহিনী ছেড়ে চলে গেল। সুলিভ্যান ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে তাদের যাবার পথের ওপর দাঁড়ালেন কিন্তু তাঁর চারদিক দিয়েই তারা হেঁটে চলে গেল—চোখ মাটিতে নিবদ্ধ, তাঁর শাপমন্যি উপরোধ-অনুরোধে বধির। তারা সোজা চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে, মেন থেকে আসা, একশোজন লোক বাহিনী থেকে বেরিয়ে গেল। সুলিভ্যান নিজে মেনের লোক; তিনি এদের আর দু-তিন দিন অপেক্ষা করতে বললেন। নিজে ঘোড়া থেকে নেমে তাদের সঙ্গে অনুনয়-বিনয় করতে করতে চললেন। কিন্তু কোন ফল হল না।

এক দুই তিন, দশজন বিশজন করে জার্সির লোকেরাও চলে গেল।

সুলিভ্যান জানতেন ব্রুকলিনে এবং পেল্‌স্ পয়েন্টে মার্বেলহেডের লোকেরা কি করেছিল। তিনি এখন গ্লোভারকে বললেন, 'আমি আদেশ দিলে আপনার লোকেরা এই পলাতকদের গুলি করবে কি?'

বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে গ্লোভার বললেন, 'মনে হয় না, করবে।'

'ওরা আমার পাশে দাঁড়াবে?'

গ্লোভার ভেবে বললেন, 'সেটা সম্ভব। কিন্তু নিজেদের জনকে খুন করতে ওরা রাজী হবে না।'

সন্ধ্যা ছটার সময় কনেকটিকাটের আশিজনের একটি ঘোড়সওয়ার দল অন্ধকারে বেরিয়ে চলে গেল।

এবং রাত্রে ভার্মন্টের প্রায় শ-দুই এবং ভার্জিনিয়ার আরও শখানেক লোক চলে গেল। পেনসিলভ্যানিয়ার একটি রেজিমেন্টের এক রাত্তির কাটল জল্পনা-কল্পনা করে মনস্থির করতে। সকালবেলায় তারাও চলে গেল। তিনশোজন। রাত্রে সুলিভ্যানের ঘুম হল না। তিনি এ রেজিমেন্ট থেকে ও রেজিমেন্ট ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দল-ভাঙা এলোমেলো সব ক্যাপ্টেন, কর্নেল, মেজর, লেফটেনান্টদের অনুরোধ-উপরোধ করে, গণ্ডায় গণ্ডায়; এমন কি যাঁরা নিজেদের জেনারেল বলেন তাঁদের সঙ্গেও। আদেশ লিখছেন তিনি; শাসাচ্ছেন; চিৎকার করতে করতে গলা ভেঙে ফেলছেন। তাঁবুতে গিয়ে প্রায় দু পাঁইট রস খেয়ে, নিজের জন্যে, দেশের জন্যে, ভাগ্যের জন্যে কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর স্ক্যামেলকে ডেকে তুলে বললেন, 'হায় ঈশ্বর, আমি এখন কি করি?'

'বলতে পারি না।'

'কি করতে পারি ?'

'যারা আছে তাদের আদেশ দিতে পারেন পলাতকদের গুলি করতে।'

'কোন লাভ নেই। তারা করবে না। তারা সবাই এক কথাই ভাবছে।'

'গিয়েছে কতজন ?'

'মনে হচ্ছে হাজারখানেকের কাছাকাছি।'

নিজে অধিনায়কত্বে নেই বলেই, বিনা খেদে স্ক্যামেল বললেন, 'বলতে পারি আপনি কি করতে পারেন। বলতে পারলে ভালো হত কিন্তু পারছি না।'

এবং পরের দিন বসে-যাওয়া চোখে, ঝাপসা দৃষ্টিতে, সুলিভ্যান দেখলেন একই দৃশ্য চলছে। ম্যাসাচুসেটসের, রোড দ্বীপের, কনেকটিকাটের, জার্সির, নিউ ইয়র্কের, মেরিল্যাণ্ডের, ভার্জিনিয়ার সব লোকেরা সরে পড়ছে। এক দুই তিন করে রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্ট, ব্রিগেডের পর ব্রিগেড চলে যাচ্ছে।

১৫. কেমন করে শেয়ালশিকারী একনায়ক হয়ে উঠলেন

ছোট ছোট অপ্রয়োজনীয় জিনিস যেমন মনে থেকে যায় তেমনি শেয়াল-শিকারীর মনে থেকে গিয়েছিল শৈশবে ছয়, সাত, আট বছরে পড়া অক্ষর পরিচয়ের বইয়ের সেই ছড়াটা। বহুদিন আগের সেই ছড়াটা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আজও মনে আছে। সেই ছড়ার জং-ধরা বইটা—ছোট ছোট ইস্পাতের ফ্রেমে ছোট ছোট মানুষগুলো, তাদের বড় বড় পা, বড় বড় নাক :

ছোট, ছোট, ছুটে পালাও
ছোট ছোট ছুটে পালাও,
জান না যে কখন কেন
বারে বারেই বারে বারেই
তুমি পালাও, ছুটে বেড়াও।

ব্রান্সউইকে তিনি একটু থেমে, বিশ্রাম নিয়ে, একটু হাঁপ ছেড়ে, কিছু ময়দা আর গরম কাপড়-জামা পাওয়া যায় কি না দেখতে চেয়েছিলেন। এই আশাতেই একটু অপেক্ষা করবেন ভেবেছিলেন যে হয়ত, শেষমেশ, এইখানে লী তাঁর পাঁচ হাজার সৈনিক নিয়ে এসে যোগ দেবেন—হয়ত স্থানীয় বাহিনীকে এসে উঠবার একটা সুযোগ দেবেন। 'এসে ওঠা'—এই [illegible] মরচে-ধরা হয়ে পড়েছে ; কংগ্রেসও এই

কথাকটি ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন—অ্যাডামস্‌, হ্যানকক, ফ্র্যাঙ্কলিন, জেফারসন, সকলেই। কথাটা এমন একটা উজ্জ্বল ছবি আঁকে: চাষীরা, গাঁয়ের অন্য লোকেরা, কারিগরেরা, কেরানীরা, সকলেই খাতাপত্র যন্ত্রপাতি লাঙল ফেলে রেখে, বন্দুক তুলে নিয়ে, গর্বভরে সোজা মার্চ করে আসছে শত্রুকে দেশ থেকে তাড়িয়ে। চিরকালের মতো স্বদেশে স্বাধীনতা, মুক্তি আর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু শূন্য ফাঁপা সত্যটা হল বন্ধ দরজা, খড়খড়ি-নামানো জানলা, চাপা রাগে ভরা বন্দুকের সতর্কবাণী: 'এই হতচ্ছাড়া ভিখিরীগুলো, দূর হয়ে যা!'

নিউ ব্রান্সউইক মানে ছিল অন্তত কাতর পাগুলোর একটু বিশ্রাম, একটু বিরাম, নিজেদের দিকে তাকিয়ে একটু সংখ্যাটা গুণে নেওয়া—সেটি ১লা ডিসেম্বর শেষ হল যখন উনিশ বছর বয়সের ক্যাপ্টেন পিটার মেনডোজ তার ক্ষুৎ-কাতর, শীর্ণকায় ঘোড়াটায় চড়ে এসে উপস্থিত হল সর্বাধিনায়ক যে বাড়িটায় আছেন সেইখানে এবং চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওরা এইখানে, স্যর!'

সার্ট গায়ে দিয়েই তিনি বেরিয়ে এলেন; খোঁজ নেবার ভঙ্গীতে লম্বা হাড়সার কাঁধ দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে; হাতে একখণ্ড রুটি: 'কারা?'

'ব্রিটিশেরা, স্যর!'

এক গ্রাসে রুটিখানা শেষ করলেন; তারপর বিলি পেছনে দাঁড়িয়ে কোটটা পরতে সাহায্য করল; ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'ঘোড়া থেকে নেমে, একটু বুদ্ধিসুদ্ধি রেখে কথা বল।'

বিপর্যস্তভাবে ছেলেটি বলে ওঠে, 'এই মাইলখানেক দূরে!'

'কি করে জানলে?'

ছেলেটি ককিয়ে উঠল, 'আমি দেখলাম যে ওদের। ঈশ্বরের দোহাই, স্যর। আমি ওদের দেখেছি।'

'সংখ্যায় কত?'

'ওঃ স্যর, সমস্ত বাহিনীটাই।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে, এদিকে ওদিকে দেখে, শেয়ালশিকারী দৌড়তে শুরু করেন; গ্রীনকে দেখে ডেকে বলেন, 'ন্যাথানিয়েল, আমরা মার্চ শুরু করছি।'

'কখন?'

'এখনি।'

'কোথায়?'

'এখান থেকে সরে যেতে।'

'কোথায়?'

'মাস'ার আর স্টার্লিংকে বল ব্রিগেড নিয়ে বেরিয়ে পড়তে।'

নক্সকে দেখতে পেলেন। দেখে মনে হল কি ঘটেছে তিনি জানেন। মোটা শরীরটা যেন উত্তেজনার ঘূর্ণিঝড়। তাঁকে ডেকে বললেন, 'হ্যারি, একটা ব্রিজ ভেঙে দিতে পার?'

'ব্রিজ?'

'ধোৎ তেরি, হ্যারি, তোমার কি বুদ্ধি লোপ পেল? নদীর ওপরে ব্রিজটা।'

'কখনও চেষ্টা করিনি, স্যর।'

'বেশ। এখন ভাঙ হ্যারি। ওরা পার হবার চেষ্টা করলে কামান দাগ। ব্রিজটা ভেঙে দাও।'

বইয়ের ব্যাপারীর ফুসফুস ছুটো কুয়াশার সাইরেনের মতো। তিনি গাঁক গাঁক করতে করতে বললেন, 'ব্রিগেড সব মার্চ শুরু কর, মার্চ শুরু কর।' সারা ছাউনিটা হয়ে উঠল একটা বিশৃঙ্খল জনতার ভিড়—লোকগুলো ছুটছে অস্ত্রশস্ত্র নিতে, অফিসারেরা তাদের লক্ষ্য করে অর্থহীন চিৎকার করছে, আর গাড়ির চালকেরা যা কিছু পাচ্ছে হাতের কাছে তাই তুলে গাড়িতে চাপাচ্ছে। এরই মধ্যে দিয়ে নক্স ঠেলেঠুলে চলেছেন তাঁর গোলন্দাজদের হাঁকডাক করতে করতে, ভাবছেন কোথায় শাবল আর হাতুড়ি পাওয়া যায়। এর আগে তিনি কখনও ব্রিজ ভাঙেননি আর দেখেও মনে হচ্ছে না যে ব্যারিট্যানের ওপরে ভারী কাঠের পুলটা একটু-আধটু ঠুকঠাকেই ভেঙে পড়বে। তাই এখন কেবল চিন্তা হাতুড়ি আর শাবলের। তবু ব্রিজটা ছোট এবং সেইটেই বাঁচোয়া। ব্যারিট্যানের বেশীর ভাগ অংশেই জল হাঁটু-সমান। হ্যামিলটনকে দেখে চেঁচিয়ে ডাকলেন:

'অ্যালেক্স, তোমার কামানগুলো কোথায়?'

'নদীর ধারে, স্যর। আমি ঘোড়া খুঁজছি।'

'উচ্ছন্নে যাক ঘোড়া! ওগুলো ব্রিজের ওপর নিয়ে গিয়ে ব্রিটিশদের পার হওয়া ঠেকাও।'

'যাচ্ছি, স্যর।'

'শাবল-টাবল কোথাও দেখেছ?'

'কি বলছেন?'

'শাবল, শাবল! ঐ শালার ব্রিজটাকে ভেঙে দিতে হবে।'

অসহায়ভাবে তিনি মাথা নাড়লেন, নক্স চললেন ছুটে। কিছুক্ষণ পরে, কুড়ুল আর ডাণ্ডা আর হাতুড়ি হাতে জন-বারো লোক যোগাড় করে, ব্রিজের কাছে যখন গেলেন তখন হ্যামিলটন সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। কামান গাদা হয়েছে, সকলে অপেক্ষমান। বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে লোকগুলোকে নামাতেই তারা হাঁচতে শুরু করে, কাঁপতে কাঁপতে খুঁটি আর পাটাতনগুলো ভাঙতে থাকে। ইতিমধ্যে তাদের মাথার ওপর দিয়ে কামানের গোলা থাকে ছুটতে। মিনিট বিশেক পরে ব্রিজের একটা দিক ভেঙে পড়ে।

আবার তীরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে, নিজেকে গরম রাখার চেষ্টায় এলোমেলো লাফাতে লাফাতে নক্স দেখলেন ব্রিটিশেরা অপর তীরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে; কামানের পাল্লার বাইরে, যথাযথ সুশৃঙ্খলায় লাল আর সবুজের সারি। ব্রিজের ঐ প্রান্তে তিনজন হালকা অস্ত্রধারী পদাতিকের দেহ পড়ে রয়েছে। ওরা জবরদস্তি নদী পার হতে গিয়ে ছটরায় মরেছে। একজন ব্রিটিশ অফিসার, যাঁকে নক্স পরে কর্নওয়ালিস মনে করেছিলেন, আধা মজা-মারা ভঙ্গীতে টুপিটা একটু নামিয়ে, খানিকটা সসম্মানেই যেন অভিবাদন করলেন। হাইল্যাণ্ডের বাঁশী-বাজিয়েরা বাঁশী বাজিয়ে পায়চারি করছে। তারা উচ্চগ্রামে বেসুরো বাজিয়ে চলেছে ইয়াংকি ডুড্‌লের একটি চলিত রূপ।

নক্স বিড়বিড় করে উঠলেন, 'যত শালার ঘাঘরা-পরা বর্বর!'

অসহায় ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকেন হ্যামিলটন।

নক্স বলেন, 'কামানগুলোকে বোধহয় শিক গুঁজে অকেজো করতে হবে।'

'যদি অন্ধকার হলে টেনে সরিয়ে না নিয়ে যেতে পারি।'

'বিনা ঘোড়ায়?' নক্স ভাবছিলেন যে অন্ধকার হতে হতেই ব্রিটিশেরা নদী পার হয়ে তাঁদের পেছনে এসে যাবে আর তাঁরা ব্রিটিশ কারাগারে কেমন করে বসে থাকবেন। তখন আর এই সব দুঃস্বপ্নের ঘোর থাকবে না। পেছন ফিরে তাকিয়ে মহাদেশীয় বাহিনীর শেষ সারিটিকে কোনমতে দেখতে পেলেন—তারা প্রিন্সটনের দিকে ছুটে চলেছে।

পরের দিন সন্ধ্যা নাগাদ বাহিনীর ছিন্নভিন্ন অবশেষ ট্রেনটনে এসে পৌঁছাল। প্রতিরোধের অন্তত একটা ভঙ্গী দেখানোও তো দরকার। নিউ জার্সি থেকে যাতে বিতাড়িত না হন সেইজন্যে একটা সবিনয় ভঙ্গী। তাই ভার্জিনিয়ান বারশোখানেক লোক প্রিন্সটনে রেখে গেলেন, স্টার্লিংয়ের অধিনায়কত্বে। ব্রিটিশেরা ব্রুকলিনে বন্দী করার পর এই স্টার্লিং আর সুলিভ্যানকেই তিনি বদল করে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

এলোমেলো, শীতে কম্পমান, অর্ধ-সজ্জিত, অর্ধভুক্ত ব্রিগেডগুলোর দিকে তাকিয়ে স্টার্লিং জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু কি আমি করব, স্যর!'

দীর্ঘকায় মানুষটি প্রায় ঐকান্তিকতার সঙ্গেই বললেন, 'আমরা তাদের এই অঞ্চলটি রক্ষা করবার চেষ্টা করছি জানতে পারলে হয়ত জার্সির কোন স্থানীয় বাহিনী এসে যোগ দেবে।'

'রক্ষা করছি? হায় যীশু! ওরা আমাদের ঘেন্না করে, স্যর।'

দীর্ঘকায় মানুষটি চোখ কোঁচকালেন।

স্টার্লিং বললেন, 'রক্ষা করছি! আমেরিকার সবচেয়ে সম্পদশালী অঞ্চল এটি, খাদ্যে ভরপুর। আর আমরা এখানে উপোস করছি।'

উনি ফিসফিস করে বলেন, 'ওরা বুঝছে না।'

'ওরা ভালো করেই বোঝে কি করে নিজেদের পেট ভরিয়ে রাখতে হয়।'

'জানি।'

'আর যদি ব্রিটিশেরা এসে পড়ে?'

দীর্ঘ লোকটি মাথা নাড়লেন।

'বারশো লোক। একবার তাকিয়ে দেখুন, স্যর। আর ব্রিটিশদের রয়েছে দশ থেকে পনের হাজার জগতের সবচেয়ে সুশিক্ষিত বাহিনী।'

'জানি।'

'কিন্তু, স্যর—'

'যতখানি পার কর,' বললেন ভার্জিনিয়ান।

ট্রেনটনে তাঁবুতে বসেছিলেন মিফলিন আর গ্রীনের সঙ্গে। মনে হচ্ছে যেন, কতকাল আগে, ব্রুকলিন টিলার চূড়ায়, তিনি মিফলিনের ওপর গাঁক করে রেগে আগুন হয়ে উঠেছিলেন, আর এক যুগেরও আগে একবার তিনি কুকুরদল সঙ্গে নিয়ে মাউন্ট ভার্ননের ঘন সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন। সেই সুদর্শন, দীর্ঘকায়, অভিজাত পোটোম্যাকের শেয়াল-শিকারীকে তিনি এখন বিশ্লেষণ করতে পারছেন,—একটি জীবন্ত মানুষ যে কতকাল আগে মরেছে সে যতখানি বীতরাগে পারে, খেদে নয়। কিন্তু তিনি ভাবছেন যন্ত্রণায়, সেই নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে একটি জগৎ শেষ হয়ে গেল, যেমন আগেও অনেক জগৎ মরেছে তেমনি করে, আবার যেমন করে মরবে তেমনি করে। পেছনে কোন ভবিষ্যৎ থাকবে না; থাকবে শুধু অন্ধকার অবসন্ন বর্তমান সেইসব মানুষদের জন্যে যারা এই দুই যুগের মধ্যে পথ করে চলবে।

গ্রীনকে বললেন, 'ন্যাথানিয়েল, লোকগুলোকে একবার গুণে নিতে চাই।'

মিফলিন তিক্ততায় বললেন, 'তার দরকার নেই, স্যর।'

'কেন?'

'নিউ ইয়র্ক মিলিশিয়া আজ চলে গিয়েছে। হাজারখানেক লোকও আর নেই। আটশো-নশোর মাঝামাঝি হবে।'

অবিশ্বাসে, কোমল স্বরে শেয়ালশিকারী বললেন, 'তা হতে পারে না।'

গ্রীন স্থির উত্তর দিলেন, 'তাই ঠিক। মিফলিন ঠিকই বলেছেন। নিউ ইয়র্ক মিলিশিয়া চলে গিয়েছে। ওদের থামাবার চেষ্টা করে কোন লাভ হত না। আমরা এত কমে গিয়েছি; যদি থামবার চেষ্টা করতাম তাহলে বাকিরাও ওদের সঙ্গে চলে যেত।'

শেয়ালশিকারী আনমনা হয়ে ভাবতে থাকেন, 'আটশো কি নশো।'

মিফলিন আর্তভাবে বললেন, 'ভাবতে বিশ্রী লাগে যে এই শেষ। ভাবতে মনে ঘেন্না আসে!'

গ্রীন মনে করিয়ে দিলেন, 'লীর বাহিনী আছে।'

'যদি লীর বাহিনীর সঙ্গে আবার কখনও দেখা হয়।'

'দেখা হবে,' বললেন শেয়ালশিকারী কিন্তু তাতে প্রত্যয় কিছু নেই—ঐ ঠিক যেভাবে লোকে ভগবানের দয়া আর মঙ্গলময়তার কথা বলে তেমনি ভাবে।

গ্রীন বললেন, 'মনে হয়, এই যেন গতকাল আমরা হাজার বিশেকের বাহিনী নিয়ে নিউ ইয়র্কে ছিলাম।'

শেয়ালশিকারী বলেন, 'গতকাল চলে গিয়েছে। আমি চাই তোমরা ফিলাডেলফিয়ায় যাও মিফলিন এবং লোক নিয়ে ফিরে এস, যত লোক পার নিয়ে এস। আমি চাই তোমরা কংগ্রেসের সামনে যাও। তার কারণ তাঁরা আমার চিঠি পড়েন না; আর যদিও বা পড়েন তাহলে এমন জায়গায় রেখে দেন যাতে তাঁদের স্মৃতি বা বিবেক পীড়িত না হয়। কিন্তু তোমরা যাও কংগ্রেসের সামনে—শাসাও, তর্জন-গর্জন কর। প্রয়োজনে মিনতি কর—কিন্তু লোক নিয়ে ফিরে এস।'

তিনি বলতেও পারতেন, 'চাঁদখান পেড়ে নিয়ে চলে এস।'

ব্যারিট্যান নদীতে ব্রিটিশদের রুখে নক্স ফিরে এলেন; শুধু তাঁর কাশিটা একটু বেড়েছে এই যা। জেনারেল হো দু-একদিন আগে যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করেছেন সেইটি সম্পর্কে বললেন, 'আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে যারা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন তাঁরা দল ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যান। পঞ্চাশ দিনের মধ্যে এই আদেশ যাঁরা পালন করবেন তাঁদের ক্ষমা করা হবে।'

ভার্জিনিয়ান মাথা নেড়ে বললেন, আমি এই রকমই একটা কিছু আশা করছিলাম।'

'এটা কি আমাদের খুব ক্ষতি করবে, স্যর ?'

'আর বেশী আঘাত আমরা কি পেতে পারি ?'

'জানি না। কথাটা দাবাগ্নির মতো গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। ওরা নিজেদের টোরি বলে স্বীকার করতে ভয় পেত কিন্তু এখন ওরা অহঙ্কারে ফেটে পড়ছে। জার্সিতে এখন একা হাঁটা মানে একটি মানুষের জীবন হাতে করে চলা।'

প্রায় শেষে, একটু কিছুক্ষণের জন্যে, শেষটা ঘটতে দেরী হল। মিফলিন এক অঘটন ঘটালেন—ফিলাডেলফিয়া থেকে ফিরে এলেন পনেরশোর এক মিলিশিয়া নিয়ে। সৈনিক না হলেও তারা মানুষ তো—ফিলাডেলফিয়ার কেরানী, মালগুদামের রক্ষক, দফতরি, পোশাকের দোকানের কর্মচারী, ছুতোর, দর্জি—এরাই সব, সাদা সাদা মুখ। এরা ভীত, ক্লান্ত, মার্চ করে আসায় এদের গা-গতরে ব্যথা। এদের মধ্যে যে দুই-তৃতীয়াংশের বন্দুক ছিল তারা সেগুলো ধরে আছে একটু ভয়ে, অনভ্যস্ত হাতে; আর বাকীদের হাতে ছিল শড়কি, আর সেই সব তলোয়ার যেগুলো রান্নাঘরে আলমারির গায়ে ঝুলত। আর ছিল এদের সঙ্গে পুরনো গাদা বন্দুক। এরা একেবারেই নবাগত। ড্রিল আর মার্চ এদের কাছে ছিল খেলা মাত্র। মিফলিন শেষ পর্যন্ত এদের বকেঝকে ট্রেনটনে নিয়ে এসেছেন। তবু এরা মানুষ তো।

ভার্জিনিয়ান তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় সব শেষ হবার কত কাছাকাছি তিনি এসে পড়েছিলেন। মিফলিন সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতজন আর আছে ?'

'ছশো।'

মিফলিন শিস দিয়ে ওঠেন।

'প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল আর কি,' দীর্ঘ মানুষটি স্বীকার করেন। তাঁকে দুর্বল, ক্লান্ত দেখাচ্ছিল; মুখে অসুস্থতার হলদে আভা। কিন্তু তার মানসিক অবস্থা আরও ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল তার বেশী কথা বলায়। নিজের কথার ব্যাখ্যায় তিনি যতখানি মিফলিনকে বললেন তা আগে কখনও বলেননি: 'আমি ওদের না জানতে দিতে চেষ্টা করেছিলাম। জানলে সব পালাত। ওদের ছোট ছোট দলে ভেঙে আমি কেবল ঘুরিয়েছি; কেউ যে তাদের ছেড়ে যায়নি এইটি ছাড়া আর সবই তাদের চোখে পড়েছে। আর শোন সেনাপতি—শোন, আমি প্রার্থনা করেছি—' সচেতন হয়ে লজ্জায়

তিনি থেমে গেলেন। একটু লজ্জিত হয়ে আবার কর্কশ হয়ে ওঠেন, 'অ্যাডজুট্যান্টের কাছে নিয়ে গিয়ে নাম লিখিয়ে ফেলে এদের প্রিন্সটনে নিয়ে যাও। ওখানে গ্রীন আছে। আমার যা অবশিষ্ট আছে তাদের নিয়ে আমি গিয়ে পৌঁছচ্ছি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে মিলিশিয়াকে একবার দেখে নিলেন।

'আর শোন জেনারেল, এদের দুজন দুজন করে মার্চ করাবে। এই বদমাইস টোরিগুলো যেন দেখতে না পায় যে আমাদের সৈন্যবাহিনী আছে। দেখবে শুধু যেন মারামারি না করে,' বলে শেষ করলেন।

সদর দফতরে ফিরে গিয়ে বিলিকে ডাকতে, সে এলে জানতে চাইলেন, 'ম্যাডীরা একটু-আধটু আছে কি?'

সে ঘাড় নাড়ে।

'কতখানি?'

'ছ বোতল।'

'সবগুলো নিয়ে আয়,' বলেন শেয়ালশিকারী।

তিনি কখনও মাতাল হননি। মদ খেয়ে এখন নিজেকে ক্লান্ত, প্রাণহীন এক দুর্ভাগা বলে মনে হল। যন্ত্রের মতো খেয়ে চলেছেন, ক্ষিপ্রবেগে, নৈরাশ্যে, ভোলবার জন্যে নয়, মনে রাখবার জন্যে, যে স্তরগুলো দিয়ে তাঁর জীবন শক্ত করে তালাবন্ধ আছে যেন সেইগুলোকে খোলবার জন্যে।

কোন লাভ হল না। দেখলেন ভোলাও যেমন অসম্ভব, মাতাল হওয়াও তেমনি। মাউন্ট ভার্নন একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন, তার বেশী কিছু নয়, এবং মাউন্ট ভার্ননে তিনি যে শেয়াল-শিকার-করা ভদ্রলোক ছিলেন সেটিও এই স্বপ্নের অঙ্গ। সে সব গিয়েছে, শেষ হয়ে গিয়েছে, আর ফিরে পাওয়া যাবে না। যে শুষ্ক পথ দিয়ে তিনি এখন চলেছেন সে পথে চলতে চাই সহ্য করবার শক্তি। অতীত থেকে কোন বল আর আহরণ করা যাবে না।

এখন শুধু বেঁচে থাকাটাই দরকার—চলমান বাহিনীর জন্যে আর আদর্শের জন্যে। তারা ছুটছে, পাশ কাটাচ্ছে, লুকোচ্ছে, এঁকেবেঁকে যাচ্ছে; আবার হোঁচোট খাচ্ছে, পড়ছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে, তবু চলছে কোনমতে! আর ফিরে আঘাত হানার কথা বলছে না। এই বেশীক্ষণ আগেও ভার্জিনিয়ান নিজে পালাতে চাইতেন না; গর্বে ফেটে পড়ে তিনি নিজের সুদর্শন মাথাখানা গুঁতো খেয়ে রক্তে ভাসিয়ে দিতে পারতেন ধ্বংসের মধ্যে। কিন্তু এখন সেই তাঁর গর্ব অন্য কিছুতে পর্যবসিত হয়েছে। পথও বদলেছে, মূল্যবোধও বদলেছে।

ফিলাডেলফিয়াতে বাড়তি সৈনিক আগেভাগে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজের

বাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে, প্রিন্সটনে ফিরে যাবার পথে তিনি পলায়মান এক জনতার সামনের সারির মুখোমুখি হলেন। কিন্তু তফাত হল এইখানে যে, আগের মতো রেগে ক্ষেপে না গিয়ে বিনা উত্তেজনায় নির্লিপ্তভাবে সৈনিকগুলোকে দেখতে লাগলেন এবং গ্রীন উপস্থিত হলে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন ব্যাপার কি, ন্যাথানিয়েল ?'

গ্রীন ক্লান্ত বিরক্ত, এমন কি সর্বাধিনায়কের জন্যেও এখন কোন সহানুভূতি তাঁর নেই। তিনি আর্তস্বরেই উত্তর দিলেন, 'একই ব্যাপার। আর কি হতে পারে বলুন ?'

দীর্ঘ ব্যক্তিটি কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্রিটিশেরা কি প্রিন্সটনে ?'

গ্রীন হতাশায় মাথা নাড়লেন।

'কিছুক্ষণও কি রুখবার সুযোগ ছিল না, ন্যাথানিয়েল ?'

'না—না, আপনি কি ভাবছেন না আমি রুখবার চেষ্টা করেছিলাম। যদি আমাদের বাহিনী সুশৃঙ্খল হত তাহলেও ওদের সংখ্যা আমাদের তিন গুণ। কিন্তু আমি বলছি স্যর, ঐ ফিলাডেলফিয়ার মিলিশিয়াটা কি রকম আপনি দেখেছিলেন ?'

দীর্ঘ ব্যক্তিটি মাথা নেড়ে বললেন, 'দেখেছিলাম,' তারপর যেন নিয়তিকে মেনে নিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'কতগুলো পালিয়েছে ?'

'মাত্র তিনশো।'

ভার্জিনিয়ান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে, পশ্চাদপসরণকারী বাহিনীর পেছন পেছন ঘোড়া ছোটালেন। তাঁর পেছন পেছন ঘোড়ায় যেতে যেতে, প্রায় রুক্ষভাবে গ্রীন জানতে চাইলেন, 'আপনার এখন আদেশ কি, স্যর ? না, কোন আদেশ নেই ? আমি এখন করব কি ?'

'কিছুই না ন্যাথানিয়েল। শুধু নিজেকে সামলে রাখো।'

'কিন্তু আপনি কি করবেন ?'

ভার্জিনিয়ান ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বোধহয় ডেলাওয়ার পার হয়ে যেতে হবে।'

গ্রীন চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপরে স্যর ?'

দীর্ঘ লোকটি মুচকি হেসে কোন উত্তর না দিয়ে ঘোড়ায় চেপেই চলেছেন। গ্রীন যখন ঘোড়া ছুটিয়ে বেপরোয়াভাবে তাঁর পাশে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি বললেন, 'যখন তোমার সামনে একটাই পথ আছে ন্যাথানিয়েল তখন আর ম্যাপের দরকার হয় না।'

'ঈশ্বরের দোহাই, ধাঁধায় কথা বলবেন না !'

'ধাঁধা না করেই তাহলে বলছি ন্যাথানিয়েল, আমরা পিছু হটেই চলব। কতদূর পর্যন্ত?' বলে ঘাড় ঝাঁকালেন। 'তুমি কি ভাবছ ব্রিটিশেরা ধৈর্য ধরবে? ওরা কি পাহাড় টপ্‌কে আমাদের পেছু ধাওয়া করবে? তাহলে আমরা বনের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে চলব। বন শেষ হয়ে গেলে—আর জানি না। কেউ সেখানে কখনও যায়নি। আমরাই বোধহয় প্রথম যাব ন্যাথানিয়েল।'

ডেলাওয়ার নদীর দিকে ওঁরা যখন মার্চ করে যাচ্ছেন তখন হালকা তুষারপাত হচ্ছে; শীতে, ক্ষিদেয়, ভয়ে খুবই কষ্ট। তুষারের উপর তাঁদের রক্তের চিহ্ন পড়ে রইল। কর্নওয়ালিশের কোন শিকারী কুকুরের দরকার হবে না এদের পেছনে ছোটাবার জন্যে; তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর মনে থাকবে, অবশ্য নিরানন্দেই, যে মহাদেশীয় বাহিনী হেঁটে কোথায় চলে গিয়েছে তিনি কি করে জানতে পারলেন।

তাঁদের পদমর্যাদার চিহ্ন সব খুলে রেখে দিলেন। খরস্রোতা নদী কি রকম জবুথবু ভাবে নৈরাশ্যে তাঁর শীতে জমে যাওয়া সৈনিকেরা পার হবার চেষ্টা করছে দেখতে দেখতে ভার্জিনিয়ান ভাবলেন, 'সেই জেলেগুলো যদি এখন এখানে থাকত।' এরা হোঁচোট খেয়ে সামলাবার চেষ্টা করেও বরফের মতো ঠাণ্ডা স্রোতে পড়ে যেতে লাগল। নৌকোর ওপর কামান-গুলো গড়িয়ে তুলে দিয়েও যখন দেখল নৌকোগুলো উল্টে গিয়ে কামানগুলো নদীর তলায় চলে যাচ্ছে তখন তাদের ব্যর্থ ক্রোধের অশ্রু আর বাগ মানল না। বন্দুক আর বারুদ জলে ভিজিয়ে দিল। যদি ব্রিটিশেরা তখন তাদের ওপর এসে পড়ত তাহলে বিনা যন্ত্রণায় তাড়াতাড়ি বিপ্লব শেষ হয়ে যেত। চাপা গলায় কাঁদতে কাঁদতে তারা শাপমন্যি করতে লাগল। কোমর পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে নক্স পর্যন্ত রাগে গরগর করতে করতে একটা আড়াইশো পাউণ্ডের যন্ত্রণার গোলা হয়ে উঠলেন।

তবু তারা ধীর গতিতে, যন্ত্রণায়, তিক্ততায় পার হয়ে চলে; কোনমতে কামানগুলোকে টেনে হিঁচড়ে তোলা হয়; আর কয়েকখানা গাড়ি, অবশিষ্ট কয়েকটা ঘোড়া আর কোনমতে বাঁচিয়ে-রাখা সামান্য খাদ্যসামগ্রী।

এইবারে ভার্জিনিয়ান নষ্ট সময় পুষিয়েও নিতে চান, বিশ্রামও চান; বেপরোয়াভাবে কোন ঝুঁকি আর নিতে চান না। বছরের এই সময়টাতে, ডেলাওয়ার নদীর অনেকখানিই পারাপারের অযোগ্য। মাইল পঁচিশেক কি তিরিশেক এদিকে ওদিকে নৌকোগুলোকে সরিয়ে নিয়ে গেলে কিছু সময়ের জন্যে ব্রিটিশদের ঠেকিয়ে রাখতে পারা যায়—কতদিনের জন্যে তা অবশ্য

তিনি জানেন না ; তবু এক সপ্তাহেও একটু ক্ষতিপূরণ হয় আর দু সপ্তাহ হলে তো ভগবানের কৃপা বলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে, ছোট ছোট দল তিনি পাঠালেন উজানে এবং ভাঁটায় আর যেখানেই নৌকো দেখা গেল সেখান থেকেই সেখানাকে নিয়ে নেওয়া হল কিংবা নষ্ট করে দেওয়া হল।

ডেলাওয়ার পার হয়ে গেলেন তাঁরা এবং এবারেও, সেই ব্যারিট্যান পার হবার মতো, তাঁরা এক চুলের জন্যে বেঁচে গেলেন, কেন না, শেষ বোঝাই নৌকোখানা জার্সির তীর ছেড়েছে কি না ছেড়েছে অমনি তাঁদের কানে এল হাইল্যাণ্ডের বাঁশীর আওয়াজ। পশ্চিম তীরে আগুন জ্বালাল শীতে জমে-যাওয়া স্থানীয় বাহিনী, আগুন ঘিরে বসল তারা ; দেখতে পেল কর্নওয়ালিশের লালকুর্তা-বাহিনীকে, ঘাঘরা-পরা হাইল্যাণ্ডারদের, সবুজ ইউনিফর্ম-পরা জার্মান সৈনিকদের। তারা যে জায়গাটা ছেড়ে এসেছে সেই জায়গায় মার্চ করে আসছে। শীতার্ত, ক্ষুধার্ত, অর্ধনগ্ন, একেবারে সন্ত্রস্ত মহাদেশীয় বাহিনীর পক্ষে হাজার হাজার উজ্জ্বল পোশাক-পরা সুশৃঙ্খল সৈনিকদের সামনে দেখা একটা ভীতিপ্রদ, একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এরা মার্চ করছে অদ্ভুত শৃঙ্খলায় ; ঠিক প্রয়োজন অনুসারে একেবারে নিভু‍র্লভাবে তীরে বিন্যস্ত হচ্ছে ; শয়ে শয়ে কামান তাদের পেছনে গড়গড় করে আসছে। সেই শীতের মেঘলা আকাশের নীচে দুর্লক্ষণের কালো দৃশ্য। মনে হচ্ছে ওদের গাড়ির যেন শেষ নেই ; ব্যাঙের ছাতার মতো হঠাৎ হঠাৎ সাদা তাঁবুগুলো গজিয়ে উঠছে সব জায়গায়। বাঁশী-বাজিয়েরা গটগট করে হেঁটে তীর দিয়ে ব্যঙ্গে, বেপরোয়া ভাবে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে।

পাট্‌নামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করতে পারি আমি ? পাঠাব যে এমন লোক নেই। ইজরায়েল, তুমি যাও, দেখ ওদের মিলিশিয়া নিয়ে কি করতে পার।'

পাট্‌নাম বৃদ্ধ, ক্লান্ত এবং রুগ্ন ; রাতে তিনি নিজের গোলাবাড়ির স্বপ্ন দেখেন আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কুঁথিয়ে ওঠেন।

দীর্ঘ মানুষটি বদমেজাজে জানতে চাইলেন, 'আর কাকে বিশ্বাস করতে পারি আমি ? আমি জানি, ইজরায়েল, তুমি ক্লান্ত। শহরে হয়ত একটু বিশ্রাম পেতে পারবে।'

বিষণ্ণ উত্তর দেন পাট্‌নাম, 'সে বিশ্রামই হবে না। কি হবে সে আমি জানি—নরকযন্ত্রণা হবে। যা শুনছি তাতে মনে হয় ওরা ভয়ে পাগল হয়ে আছে। আমি আর কি করতে পারি ?'

'কিছু না করার চেয়ে যা করবে তাই ভালো।'

ইতিমধ্যেই স্বাজী হয়ে বিরক্তিতে পাট্‌নাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর যদি ব্রিটিশেরা এসে পড়ে?'

'লোকজন জিনিসপত্র যা পায় নিয়ে পেছু হটবে।'

অনুযোগ করলেন পাট্‌নাম, 'আমি ক্লান্ত। আপনার ঝামেলা অনেক কিন্তু আপনার তো আর বাত নেই।'

শেয়ালেশিকারী শান্ত জবাব দিলেন, 'ভগবান যদি আর একটু মুখ তুলে তাকাতেন, শুধু তোমার জন্যে, ইজরায়েল। অন্যদের মতো তুমি তরুণ নও; আমিও নই। তুমি যা বলছ তা আমি বুঝি—যা করতে চাইছ দেহ যখন তা শোনে না তখন কি রকম মনে হয়।'

পাট্‌নাম আর্তকণ্ঠে বললেন, 'শুরু হবার সময় বেশ কমসম ছিল।'

'শুরুতে তাই হয়।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে পাট্‌নাম ঘোড়া ছোটালেন কিন্তু তিনি ফিলাডেলফিয়াতে পৌছতে না পৌছতে কংগ্রেস এক কাণ্ড করে বসল। সরকারের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাই নিয়ে এক গাড়িতে চাপিয়ে কংগ্রেস চলে গেল বাল্টিমোরে। অতি কষ্টে বসে পড়ে সর্বাধিনায়ক পাট্‌নাম লিখে দিলেন সব।

গ্রীন এসে দেখেন ভার্জিনিয়ান আগুন পোয়াচ্ছেন—গলায় জড়ানো পশমের মাফলার, নাকের ওপর চশমাটা ঢলঢল করছে, মাথায় একটা পুরনো মোজার টুপি। যে খুপরিখানাটাকে তিনি সদর দপ্তর বানিয়েছেন সেখানাকে গরম রাখা অসম্ভব। দীর্ঘ মানুষটির চোখ লাল আর নাক আরও লাল। তিনি সমানে হাঁচছেন।

বললেন, 'বস ন্যাথানিয়েল।' দেখিয়ে দিলেন একখানা ভাঙা পেছনে মইয়ের মতো কাঠ লাগানো চেয়ার। সামনে একখানা নড়বড়ে টেবিল। আসবাবের মধ্যে ঘরে এই কটি জিনিস।

'ঠাণ্ডা লাগলে রসের গরম সরবৎ-ই সবচেয়ে ভালো, স্যর,' গ্রীন বললেন।

'কতখানি রস মানুষ খেতে পারে? দু পাঁইট খেয়েছি। তাতে কিছু হয়নি।'

মাথা নেড়ে সহানুভূতি জানিয়ে, বিনা ব্যস্ততায় গ্রীন চেয়ারে গিয়ে বসলেন। খুব শীত লেগেছে বলে আগুনের এত কাছে গিয়ে বসলেন যে হাঁটুর ওপরে পরিধেয়র ঝুলন্ত সুতোগুলো পুড়ে যেতে লাগল।

দীর্ঘ মানুষটি সাবধান করলেন, 'পুড়ে যাবে কিন্তু।'

'ধন্যবাদ, স্যর। এ অঞ্চলে শীতে আবহাওয়ায় জল বড্ড বেশী।' হাঁটু

জড়ো করে, তার ওপর হাত রেখে, কেন তাঁকে ডাকা হয়েছে জানবার জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন।

দীর্ঘ মানুষটি বললেন, 'ফিলাডেলফিয়া ছেড়ে কংগ্রেস চলে গিয়েছে।'

'মানে ?'

'তাঁরা ঠিকই করেছেন। যতক্ষণ একটা সরকার থাকে ততক্ষণই বিপ্লব বজায় থাকে। ধরা পড়ার থেকে তাঁদের পালানোই ভালো হয়েছে।'

'কোথায় গেলেন তাঁরা ?'

'বাল্টিমোরে বোধহয়। এই নয় যে—' গ্রীন ভার্জিনিয়ানকে এত বুড়ো, এত ক্লান্ত, এত অধীর কখনও দেখেনি। বুকপকেটে একখানা চিঠি খুঁজতে খুঁজতে তাঁর মস্ত হাতখানা একটু কেঁপে কেঁপে উঠছে: 'জানি না অন্যদের বলব কি করে—কংগ্রেস জিনিসটাকে পাল্টে দিয়েছে। ভগবান জানেন! আমার তো মনে হচ্ছে ওঁরা হাল ছেড়ে দিলেন।'

এমন করে কথা এর আগে কখনও তিনি বলেননি। কর্তৃত্বের শেষ চিহ্নটুকু, আভিজাত্যের গর্ব—সব চলে গিয়েছে গলা থেকে। গ্রীন ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করেন, 'কারা, স্যর ?'

'কংগ্রেস—'

অনমনীয়ভাবে মাথা নাড়েন গ্রীন।

ক্লেশে বলে ওঠেন দীর্ঘ মানুষটি, 'ওরা সব আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছে।'

'কি ফেলে দিয়ে গিয়েছে, স্যর ?'

'সরকারটাকে। আমি কখনও বলিনি, কখনও চাইনি। নিজের কাঁধটায় আমি আর কতখানি বইতে পারি ?'

অবাক হয়ে গ্রীন চেয়ে থাকেন তাঁর দিকে।

চশমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে চোখ কুঁচকে চিঠিখানির দিকে চেয়ে বলেন, 'ব্যাপারটা এই রকম আর কি।' তারপর পড়তে থাকেন, 'তাঁরা অন্যরকম আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত, আদেশ দেবার, সরকার সম্পর্কিত সব কিছু এবং যুদ্ধ পরিচালনা করবার সর্বময় কর্তৃত্ব জেনারেল ওয়াশিংটনকে দেওয়া গেল…'

গ্রীন জোর দিয়ে বললেন, 'অন্য কাউকে হলে আমি ভয় পেতাম; কিন্তু আপনাকে দিয়েছে, স্যর। সেটা দেখছেন তো ?'

আর্তভাবে ঘাড় নেড়ে দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি বললেন, 'না—, মানে, কাকে দেওয়া হল তাতে কি আসে যায় ? কি জন্যে আমরা যুদ্ধ করছি ? একটি

লোক শাসন করবে বলে ?'

'ভগবানের দিব্যি স্যর, ওতে আমার ভয় নেই। বিশ্বাস করুন আপনি। কিন্তু এটা ওঁরা করলেন কেন ?'

'ওঁরা ভাবছেন এই তো শেষ। তাই খড়কুটোটাও আঁকড়ে ধরছেন।'

গ্রীন কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি মনে করেন এই শেষ ?'

দীর্ঘ মানুষটি উত্তর দেন, 'আমি জানি না, আমি জানি না।'

যুদ্ধের মন্ত্রণাপরিষদের বৈঠকের জন্যে এঁকে ঘিরে এই ঠাণ্ডা ঘরে সকলে বসেছিলেন। গ্রীন, মার্সার, নক্স, মিফলিন, স্টার্লিং এবং জন ক্যাডওয়া-লেডার। শেষোক্ত ব্যক্তিটি ফিলাডেলফিয়ার এক যুবক। পাট্‌নামের বিষণ্ণ অদ্ভুত প্রভাব তাঁকে নাড়া দিয়েছে। একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে তিনি ফিলাডেলফিয়া থেকে মার্চ করে এসেছেন। ডেলাওয়ারের ধারে যা দেখে এসেছেন তা তিনি এখনও সামলে উঠতে পারেননি। ফিলাডেলফিয়ার দর্জির হাতের সদ্য তৈরি জামাজোড়া-পরা ক্যাডওয়ালেডার ছাড়া আর সকলের পরনেই ছেঁড়াখোঁড়া, তালিমারা ইউনিফর্ম। একসময়ে সর্বাধি-নায়কের পোশাকের অনুকরণে নীল-পীত ইউনিফর্মই সযত্নে তৈরি হয়েছিল ; এখন বেশীর ভাগই পুরনো হাতবদলানো চোপা আর বাড়িতে তৈরি কোট সব গায়ে হয় না। যাকে তাঁদের বাহিনী বলা হত সেই বিশৃঙ্খল, নোংরা বিভীষিকাময় বস্তুটি ক্যাডওয়ালেডার দেখেছেন এবং এটাও একটা নিষ্করুণ হাস্যকর স্বপ্নের মতো—এই যে এঁরা, যাকে বলে, যুদ্ধের মন্ত্রণাপরিষদে এসে বসেছেন।

যে পরিস্থিতির ফলে আজ তিনি একনায়ক হয়ে উঠেছেন সেইটি ভার্জি-নিয়ান ব্যাখ্যা করে বলে এখন বিনীতভাবে। প্রায় মিনতি করে বলছিলেন :

'ভদ্রমহোদয়গণ, বিশ্বাস করুন, এ আমি কখনও আশা করিনি, চাইনি। আমি মনে করি আমাদের কংগ্রেস মহৎ নির্ভীক প্রতিষ্ঠান। এঁদের কাছেই আমি আমার সব কাজের জন্যে দায়ী।' কণ্ঠে কোন ব্যঙ্গের আভাস নেই ; 'তাঁদের কাছেই আমি এখনও দায়ী। এর আর কোন পরিবর্তন নেই। যে মহৎ উদ্দেশ্যে তাঁরা কাজ করছেন তাতে আমাদের শ্রদ্ধাই জাগে ; আর তাঁদের যে বাহিনী আমি পরিচালনা করার সম্মান লাভ করেছি সে বাহিনী সেই কাজের যোগ্যই বটে। তবু নিজের দায়িত্বেই কতকগুলো কাজে নামতে হচ্ছে, এই সময়টার জন্যে। কেন না এখন তো আর কংগ্রেসকে দিয়ে সেগুলো বিবেচনা করবার সময় নেই।'

'আমরা শুধু একটা কারণেই পেছু হঠে চলেছি—বাহিনীটিকে বজায় রাখবার জন্যে এবং তার মাধ্যমে দেশকে। কিন্তু এখন এমন একটি স্থানে পৌছানো গিয়েছে যে, আর পেছুলে যেটুকু বা অবশিষ্ট আছে তাও যাবে। আমাদের পাল্টা আঘাত করতেই হবে এবং যে জন্যে যুদ্ধ করে আসছি সেই মহৎ উদ্দেশ্যের তাতে সাধন হবে না শেষ হবে, তা আমি জানি না। কিন্তু আঘাত আমাদের হানতেই হবে, কেন না, আর একটু পরেই খুব দেরী হয়ে যাবে।'

তিনি যেন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছেন এমনিভাবে তাঁরা তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন ; পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন। তিনি বলে চলেছেন :

'দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের এবং কংগ্রেসের টাকা বিশেষ নেই ; যা ছিল তার বেশীর ভাগই খরচ হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশের অর্থবান মানুষেরা যদি আরও বেশী সংখ্যায় আমাদের আদর্শের দিকে আসতেন, পরিস্থিতি অন্যরকম হত। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁরা বেশীর ভাগই সহায়-সম্পদহীন ; অনেকেই যথাসর্বস্ব দিয়ে দিয়েছেন। আমাকে লোকে বড়লোক মনে করে ; বোধহয় কিছু টাকাকড়ি যোগাড় করতে পারি। আপনাদের কেউ কেউ সাহায্য করতে ইচ্ছুক হতে পারেন। অবশ্য আমি জানি আপনাদের কতটুকুই বা আছে তবু আমাদের অনেক রকমের পুরস্কার, অনুদান দিতে হবে যাতে লোকে বাহিনীতে যোগ দিতে চায়। আপনাদের কাছে আমার বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই যে আমাদের অবস্থা কত খারাপ হয়ে উঠেছে। এই কর্নেল ক্যাডওয়ালেডার আসায় কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের বাহিনীতে জনসংখ্যা হাজার দুয়েকের কিছু কম দাঁড়াবে। আমি মনে করি না এতে হতাশ হবার কিছু আছে বরং এটাই প্রমাণ করে যে, আমাদের আরও প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে—'

থেমে এর মুখ ওর মুখের দিকে তাকান। মার্সার টেবিলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ; নক্সের চোখ ভিজে আর গ্রীন ক্রমাম্বয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন মুখখানা দৃঢ় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ রাখবার জন্যে ; স্টার্লিং শূন্য চোখে সামনের দিকে চেয়ে। মিফলিনের চোখে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার নিষ্প্রভ নৈরাশ্য।

দীর্ঘ লোকটি কোমল কণ্ঠে বলেন, 'আমরা সব মহাযোদ্ধা। যে সব অন্ধকার দিন আমরা একসঙ্গে পার হয়ে এসেছি তার জন্যে আপনাদের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ দিই।' বলা শেষ করে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

লীর ধরা পড়ার খবর প্রথম পেয়ে প্রায় ফেটে পড়ার অবস্থায় গ্রীন

এলেন নক্সের কাছে এবং প্রথম ধাক্কা সামলাবার পর নক্স বললেন, 'আমার পক্ষে, ও বাজে মাল বাতিল হওয়াই ভালো। ঐ শুয়োরটাকে আমি ঘেন্না করি।'

গ্রীন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ওঁকে খবরটা দেবে না কি হ্যারি?'

'আমি বলতে পারব না।'

'ওঃ ক্রাইস্ট, সেই বাহিনী, পাঁচ হাজার সৈনিক, ভালো সৈনিক সব, জেলেরা—হ্যারি, তারা গেল কোথায়? মনে আছে ঐ জেলেরা পেল্‌স্‌ পয়েন্টে কি কাজই করেছিল! ওইটুকু শুধু আমাদের মনে রাখতে হবে। তারা গেল কোথায়?'

'জরুরী সংবাদে কি বলল? সুলিভ্যান পাঠিয়েছেন? যদি অবশ্য সুলি-ভ্যানই অধিনায়কত্বে অবশিষ্ট থেকে থাকেন?'

'ও বললে, এখান থেকে উত্তরে, সুলিভ্যান নদী পার হবার চেষ্টা করছেন।'

'সেটা কত আগে?'

'কয়েকদিন আগে। কর্নওয়ালিশ ওদের গতিরোধ না করলে এতক্ষণে তারা এখানে পৌঁছে যেত। যদি তাই ঘটে থাকে—' ঘাড় ঝাঁকিয়ে ওঠেন গ্রীন।

নক্স জিজ্ঞাসা করেন, 'সরাইখানায় লীর সঙ্গে কে ছিল?'

'উইলকিনসন বলে একটা ঘৃণ্য হতভাগা—গেটসের বাহিনী। আমি জানি তাকে। একটা বাচ্ছা ছেলে। কোন কাজের নয়। বলল যে সে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি ও মিথ্যে কথা বলেছে। ও যদি লীর সঙ্গে ওখানে থেকে থাকে, আমি বুঝতে পেরেছি, কেন।'

মাথা নেড়ে, ভার্জিনিয়ানের সদর দপ্তরের দিকে ইঙ্গিত করে নক্স জানতে চাইলেন, 'উনি কিভাবে নিলেন খবরটা?'

'তুমি কি রকম মনে কর, হ্যারি?'

'বলতে পারি না—মনে হয় বাহিনীর জন্যে চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন।'

তিক্ততায় গ্রীন বললেন, 'না, উনি চিন্তিত হয়েছিলেন লীর জন্যে; শুধু চিন্তিত নয়, একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন, শুনছ হ্যারি, ভেঙে পড়েছিলেন। ভেঙে পড়েছিলেন একজন মহাযোদ্ধাকে হারালেন বলে—একজন মহান নেতা, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। তখনি তিনি কর্নওয়ালিশকে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন লীকে বদলীতে মুক্তি দেবার জন্যে—প্রায় আমাদের হাতে প্রত্যেকটি বন্দীর বিনিময়ে, যা কিছু আমাদের আছে সব কিছুর বিনিময়ে।

লীকে ফাঁসি দেওয়া হলে, ভগবান জানেন, কি শাসানি দিয়েছেন।'

'কেন?' নক্স সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেন।

'জানি না। ওঁকে বোঝবার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। ওঁর জায়গায় আমি থাকলে—'

'তোমার কি মনে হয় ওরা লীকে ফাঁসি দেবে?'

'দিতে পারে। জানই তো উনি ব্রিটিশ অফিসার ছিলেন।'

চারদিন পরে, বিশে ডিসেম্বর, লীর বাহিনীর আর্ত, ছিন্নভিন্ন অবশেষ ডেলাওয়ারের ছাউনিতে এসে উপস্থিত হল। হোয়াইট প্লেন্‌সে লীর অধীনে যে পাঁচ হাজার সৈনিক ছিল তার হাজার দুয়েকেরও কম অবশিষ্ট আছে। শেয়ালশিকারীর বাহিনীর বেচারী ভিক্ষুকদেরও এদের দেখে দয়া হল। ঠাণ্ডায় কালিয়ে গিয়েছে, জামাজোড়া ছেঁড়া, কাটা-ছেঁড়া পা দিয়ে তখনও রক্ত পড়ছে। ইয়াংকিরা ওদের টেনে-হিঁচড়ে ছাউনির মধ্যে নিয়ে এলে কেউ কেউ হোঁচোট খেতে খেতে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চলে যায়, অন্যেরা শুয়ে পড়ে প্রায় তখনই ঘুমিয়ে পড়ে। এক সপ্তাহ ধরে তার গোঁ ধরে, আঁকাবাঁকা পথে পালিয়ে পালিয়ে ব্রিটিশদের হাত এড়িয়েছে—পালিয়ে যে আসতে পেরেছে এইটাই আশ্চর্য। তাদের মধ্যে আশা বা শৃঙ্খলার একমাত্র চিহ্ন হল ঐ মার্বেলহেড জেলেদের এক কোম্পানি সৈনিক। এরা এখনও সুসংহত, সংখ্যায় শ ছয়েক—তাদের নীল কোটগুলোর আর বিশেষ কিছু নেই। জুতো গিয়েছে, কিন্তু তাদের কৃশ, লম্বা ইয়াংকি মুখগুলো হয়েছে আরও দৃঢ়, আগের চেয়ে আরও কঠিন।

ঘুমের অভাবে, ক্লান্তিতে সুলিভ্যান টলছেন; মুখে সপ্তাহখানেকের দাড়ি, চোখ দুটো রক্তরাঙা, বিস্ফারিত। তিনি হোঁচোট খেয়ে এগিয়ে এসে ভার্জিনিয়ানকে বললেন, 'আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, স্যর, ঐ যে ভীরু নৌকোগুলো পথে পালিয়েছে তাদের জন্যে।'

১৬. কি করে আবার তিনি ডেলাওয়ার পার হলেন

অবশেষে আবার একবার ভার্জিনিয়ান এবং গ্লোভার মুখোমুখি বসে। সামনে এক কলসী রসের গরম সরবৎ। হাতে ভরা গেলাস। গ্লোভার দাড়ি কামিয়েছেন, বিশ্রাম নিয়েছেন আর শেয়ালশিকারী আরও শীর্ণ, গাল বসে গিয়েছে, চোখের চারদিকে গভীর কালো রেখা পড়েছে। প্রত্যেকেই

প্রত্যেকের পরিবর্তন লক্ষ্য করে, এক নূতন রকম নম্রতা অনুভব করলেন। পূবের ঠাণ্ডার প্রভাব কিছুটা গ্লোভারের কেটেছে; মানুষের সব মর্যাদাবোধ খসে পড়ে যেতে তিনি দেখেছেন; পেল্‌স্‌ পয়েন্টে যা দেখেছিলেন তার চেয়েও শক্ত এই দৃশ্য সহ্য করা। শেয়ালশিকারী অবশ্য তাঁর পথ ঠিক করে ফেলেছেন এবং যতদূর যাওয়া যায় সেই পথেই তিনি যেতে বদ্ধপরিকর। এঁদের দুজনেরই এক বয়েস—কিছু কিছু বিষয়ে একই রকম আবার অন্যান্য বিষয়ে তফাত। গ্লোভার অভিজাত ব্যক্তিটি আর সেই দেখে স্বীকার করে নিলেন; উপলব্ধি না করেও আঁচ করলেন টেবিলের ওপাশে বসা ব্যক্তিটির মধ্যে এক নতুন লক্ষ্যের গৌরববোধ। দুজনেই তাঁরা নিঃসঙ্গ ব্যক্তি হলেও কেউই কারও কাছ থেকে, সেই নিঃসঙ্গতা দেখেও, কোন সুখ-স্বস্তি পাচ্ছেন না। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের নিঃসঙ্গতাটা বুঝছেন।

গেলাসে চুমুক দিতে দিতে শেয়ালশিকারী বললেন, 'আপনাকে দেখে খুশি হচ্ছি, কর্নেল। কতদিন আগে দেখা।'

গ্লোভার মাথা নেড়ে, প্রায় কখনও যা করেন না তাই করলেন—একটু মুচকি হাসলেন।

শেয়ালশিকারী অর্ধ রসিকতায় আনমনে বলে যান, 'কখনও জেলেদের কথা ভাবিনি—কখনও ভাবিনি যে আমার প্রাণ, এই বাহিনী এবং দেশের আদর্শ এদের ওপর এতখানি নির্ভর করবে।'

গ্লোভার বললেন, 'ভালো কথা, স্যর।' তাঁর পোড়খাওয়া, বলিচিহ্নিত মুখে একট লালচে আভা দেখা দিল।

'আপনার কাছে আমাদের অনেক ঋণ।'

'আমার হিসেবে সামান্যই,' অস্বস্তিতে গ্লোভার বললেন।

'যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আপনি এখানে এসে উপস্থিত। সৌজন্য ইত্যাদি জানাতে আমি তেমন ভাল পারি না।'

'আমিও ঐ সব মনে ধরে রাখতে পারি না, স্যর।'

গেলাসটি পুরো গলায় ঢেলে শেয়ালশিকারী বলেন, 'মনে একটা পরিকল্পনা ছিল যে—'

ইয়াংকি সামনে ঝুঁকে পড়েন।

'অসুবিধাজনক অবশ্য, কোন মানে হয় না,' গেলাসে কড়া গরম সরবৎ ঢেলে সেদিকে তাকিয়ে বলে গেলেন, 'মানে, আপনাকে আমার দরকার ছিল। এ বিষয়ে অন্য রকম করে ভেবে কিছু লাভ নেই।'

কোমল কণ্ঠে, অবিশ্বাসে নয়, কিন্তু বাস্তব সন্ত্রাসে গ্লোভার বলেন,

'ডেলাওয়ার পার হওয়া।'

শেয়ালশিকারী মাথা নাড়েন।

মার্বেলহেডের লোকটি মুচকি হেসে বিড়বিড় করেন, 'আমি তাই ভাবছিলাম। সেইটাই হতে হবে। তা ছাড়া কি হতে পারে?'

নিজের চিন্তাগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে যাঁর এত দেরী লাগে সেই ভার্জিনিয়ান অপূর্ব ক্ষিপ্রতায় বলে যান, 'ব্রিটিশেরা চলে গিয়েছে, চলে গিয়েছে নিউ ইয়র্কের অগ্নিকুণ্ডের ধারে, জার্মানদের রেখে গিয়েছে নদীর ধারে। এমনিই তাদের আমাদের প্রতি অবজ্ঞা। বেশ, ভালো কথা, আর জার্মানদের কাছে আমাদের অনেক দেনা।' এই প্রথম শুধু গ্রোভার কেন, আর কেউই এঁর এই দিকটা দেখেননি, এই আবেগময় বাকপটুতা: 'জার্মানদের ওরা রেখে গিয়েছে। ওরা শুধু যুদ্ধ করে, মরে, খুন করে। নিজেদের দেশের জন্যে নয়, কোন কিছুকে রক্ষা করতে হবে বলে নয়, ঘৃণা করে বা ঘৃণার প্রতিবাদ করে বলে নয়—শুধু ভাড়াটে বলে, যুদ্ধই ওদের ব্যবসা বলে। ক্লিপহসেন ওখানে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া রয়েছে।' হঠাৎ থেমে যান। এই কথা বলার প্রচেষ্টায় ক্লান্ত—কাশতে থাকেন।

জিজ্ঞাসা করেন গ্রোভার, 'কখন পার হতে চান?'

দীর্ঘকায় লোকটি শান্তস্বরে জবাব দেন, 'বড়দিনে।' তাঁর সে আবেশ কেটে গিয়েছে। সেই পুরনো, শান্ত, প্রায় অনমনীয় সত্তাটি আবার ফিরে এসেছে।

গ্রোভার যুক্তি-টুক্তি বিচার করতে চান না। তিনি চোখ বুজে, পেছনে হেলান দিয়ে, ব্যাপারটা কি করে সমাধা করা যাবে তাই ভাবেন—যেন সুশিক্ষিত, ভাড়াটে, প্রাশায় শিক্ষিত একটি ছাউনিকে পরাজিত, অর্দ্ধভুক্ত, অর্ধসজ্জিত এক বিশৃঙ্খল জনতার সাহায্যে আক্রমণ করা একটা অতি সাধারণ ব্যাপার।

'আমাদের লোক কতজন?'

'তার মধ্যে আমাদের হাজার পাঁচেক জমা হবার কথা।'

'এক রাত্রেই?'

দীর্ঘ মানুষটি বললেন, 'আশা করি কয়েক ঘন্টাতেই হয়ে যাবে।'

গ্রোভার চোখ বুজে, আস্তে আস্তে শিস দিতে দিতে, রসে চুমুক দিতে থাকেন। চোখ বুজেই টেবিলে টোকা দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করেন, 'আসলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে, স্যর?'

'আমি চাই ওরা নৌকোয় করে, ওপারে গিয়ে, পুনর্বিন্যস্ত হয়ে,

অবতরণের স্থান থেকে মার্চ করে ট্রেনটনে যাবে, এবং অন্ধকারেই, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আক্রমণটা চালাবে।'

গ্লোভার ভাবতে থাকেন, 'এক জায়গাতেই তো এটা করা যেতে পারে।'

'আমি যা পরিকল্পনা করেছি তাতে ত্রিমুখী আক্রমণ হবে—একটা নদীর ন মাইল উজানে, একটা এখান থেকে এক মাইল ভাঁটায় আর তৃতীয়টা বার্লিংটনে।'

'এতে ব্যাপারটা আর একটু কঠিন হয়ে গেল। নৌকোগুলো কেমন?' শুধোলেন গ্লোভার।

শেয়ালশিকারী উত্তর দিলেন, 'আমার নৌবিদ্যা ততখানি নয় যে বিচার করি। নদীর উজানে ভাঁটায় ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সব এইদিকেই। সংখ্যায় যথেষ্টই বলে মনে হয়, কেন না, আমরা চালাতে পারি এমন সব নৌকোই আমরা দখল করে নিয়েছি। গ্লোভার চোখ বুজে, পেছনে আবার হেলান দিয়ে, একটু ঘাবড়ে গিয়ে টেবিলে টোকা দিতে লাগলেন। ইনি উদ্বেগে চেয়ে রইলেন গ্লোভারের দিকে।

শেয়ালশিকারী জিজ্ঞাসা করেন, 'কেমন মনে হচ্ছে?'

ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন গ্লোভার, 'মনে হয় পারা যাবে। কামান চান যদি তাহলে কিন্তু বজরা চাই। ডিঙিতে করে সারারাত্রি বয়ে বয়ে নিয়ে যাব। মনে হচ্ছে পারা যাবে।'

'আপনার ওপর নির্ভর করতে পারি তো?'

'পারেন, স্যর,' বললেন গ্লোভার; নড়বড়ে টেবিলের দুই ধার থেকে লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে দুজনে করমর্দন করলেন।

একটু ভালোর দিকে সব যাচ্ছে। ভার্জিনিয়ান লোক গণনার আদেশ দিলেন। প্রায় হাজার পাঁচেক। অবশ্য এদের মধ্যে সকলে যুদ্ধ করবার অবস্থায় ছিল না। উত্তরে শুইলারের বাহিনী থেকে গেটস্‌ এসেছেন চারটি রেজিমেন্ট সঙ্গে করে, কিন্তু পথে তার অর্ধেকই পালিয়েছে। কিন্তু যে পরিকল্পনাটি তৈরি হচ্ছে সেটির কথা যখন গেটসের কানে এল তখন তিনি ভার্জিনিয়ানের কাছে গিয়ে বললেন, 'স্যর, আমি ছুটি নিয়ে ফিলাডেলফিয়া যেতে চাই।'

'ফিলাডেলফিয়া?'

'এমন এক ধরনের ক্ষ্যাপামি এখানে দেখতে পাচ্ছি, স্যর, যার সঙ্গে সায় দিতে পারছি না।'

দীর্ঘকায় মানুষটি শান্তস্বরে বললেন, 'ফিলাডেলফিয়াতে কি জাহান্নামে

যেখানে খুশি যেতে পারেন। তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

'এই যদি আপনার মনোভাব হয়, তাহলে বুঝতে পারছি, আপনি আমার মনোভাবটাও বুঝেছেন।'

গেটসের সঙ্গে উইলকিনসন এসে গটমট করে ছাউনিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং অনেক রঙ চড়িয়ে বর্ণনা করছে কেমন করে দুই হাতে দুই পিস্তল নিয়ে সে এক কোম্পানি ড্র্যাগুনের সঙ্গে লড়েছে লীকে গ্রেপ্তারের সময়। সে অবিরাম অনর্গল বকে চলেছে এবং এমন ইঙ্গিতও করছে যে লীর গ্রেপ্তারের ব্যাপারটায় সর্বাধিনায়ক নিজে চোখ বুজে ছিলেন। ওয়াকিবহালের হাসি হেসে তিনি চারদিকেই ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন যে শীগগিরই নতুন সর্বাধিনায়ক আসছেন এবং সেই নতুন ব্যক্তিটি যদি গেটস্ হন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জেনারেল হো এবং শেয়ালশিকারীর মধ্যে কত চিঠি চালাচালি হয়েছে সেদিকেও সে দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং বোঝাতে চেষ্টা করল যে বাহিনীতে যে বিপদ ও দুর্ঘটনাগুলো ঘটে গেল সেগুলো সবই ভাগ্য বা প্রতিকূল অবস্থার জন্য নয় ; বরং একটি পরিকল্পনারই অঙ্গ।

ক্যাপ্টেন একদিন তাকে খুঁজে বের করে বললেন, 'উইলকিনসন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ছেলেটি বললে, 'মেজর উইলকিনসন।'

এঁদের দুজনের প্রায় একই বয়েস। হ্যামিলটন একটু বেশী লম্বা, পাতলা ; তাঁর নীল চোখে অদ্ভুত দীপ্তি, মুখে কুটিল হাসি ; বললেন, 'হ্যাঁ, মেজর উইলকিনসন।'

'কি চান আপনি ?'

হ্যামিলটন মুচকি হেসে বললেন, 'তোমাকে খুন করতে চাই—তবে করব না বোধহয়—এখনও নয়।'

'ক্ষেপেছেন না কি ?'

'দুঃখিত, মেজর। আমার মাথার ঠিক আছে। আপনি বরং সরে পড়ুন—জেনারেল গেটসের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়া চলে যান।'

রেগে আগুন হয়ে উইলকিনসন শুরু করে, 'আপনি যদি লড়তে চান—'

'লড়তে চাই না, আপনাকে খুন করতে চাই,' ঘুরে চলে যেতে যেতে হ্যামিলটন বলে গেলেন।

পরের দিন গেটসের সঙ্গে উইলকিনসন ফিলাডেলফিয়া চলে গেল।

ভার্জিনিয়ান গুরুগম্ভীর ভাবে বলছিলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এটা যদি

পাগলামি হয় তাহলে এইটাই আমাদের শেষ পাগলামি। এই সিদ্ধান্তে আমি সহজে আসতে পারিনি—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নিজের সঙ্গে যোঝাযুঝি করে তবে এই সিদ্ধান্তে এসেছি। কংগ্রেস যে ক্ষমতা আমাকে দিয়েছেন সেই ক্ষমতার ব্যবহার আমি করিনি কোন লঘু চিন্তার বশে; অনেক ভেবেচিন্তে কারে পড়ে করেছি। এটা যে কত জরুরী তা আপনাদের বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। খেলা আমাদের শেষ। বলেছিলাম একবার যে, প্রয়োজন হলে আমরা হাজার মাইল পেছু হটে যাব পশ্চিমে, অবশ্য তাতে যদি আমাদের বাহিনী অক্ষত থাকে এবং কংগ্রেস টিকে থাকেন। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, কংগ্রেসের সঙ্গে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছি: রক্ষা করতে পারিনি বলে কংগ্রেস তাঁরা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছেন এবং আমাদের মতোই পালিয়েছেন। এখন যদি আমাদের আর শ'খানেক মাইলও পেছু হঠতে হয় তাহলে এই বাহিনীর আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।'

তাঁর সামনে সবাই দাঁড়িয়ে—গ্রীন, সুলিভ্যান, নক্স, মার্সার, স্টার্লিং, পাট্‌নাম, মিফলিন এবং গ্লোভার। রীড আর ক্যাডওয়ালেডার বার্লিংটনে কিন্তু তাঁদের ইতিমধ্যেই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সর্বাধিনায়কের কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই, যাকে বলা যেতে পারে সর্বনাশের আহ্বান, তা গম্ভীর মুখে শুনলেন।

উনি বলেই চলেছেন, 'আমি আপাততঃ বড়দিনের রাত্রিই ঠিক করেছি, পরের দিন সকাল হবার এক ঘণ্টা আগে।'

সকলে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রকৃত ঘটনাই যেন ব্যাখ্যা করছেন এমনি ভাবে বলছেন, 'কেন না জার্মানগুলো তখন মাতাল হয়ে থাকবে।'

কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার ওপর কি নির্ভর করা চলে, স্যর?'

'আমরা নির্ভর কিছুর ওপর করতে পারি না, আমাদের আশা করবারও কিছু নেই। আমরা এগোচ্ছি কেন না আমরা নিরুপায়।'

নক্স জিজ্ঞাসা করলেন, 'কামানের কি হবে?'

'তোমার তো ষোলটা আছে।'

'আঠারটা, স্যর। ফিলাডেলফিয়াতে বাঁচানো গিয়েছিল যে দুটি সে দুটি জেনারেল পাট্‌নাম পেয়ে গিয়েছেন—বার পাউণ্ডের গোলা ছোঁড়ার।'

'আমরা সবগুলোই পার করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব, হ্যারি। কর্নেল গ্লোভার কতকগুলো বজরা যোগাড় করেছেন; আলো ঝাপসা হতে শুরু করতেই তুমি কামানগুলোকে বজরায় তুলতে শুরু করবে—চারটের পরেই

সময়টা হবে আর কি ; ঘোড়াগুলোও আমরা নিয়ে যাবার চেষ্টা করব এবং ওপারে গিয়ে কিছু ঘোড়সওয়ারও সাজাব। বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিয়েছে বলে জেনারেল পার্ট্‌নাম ফিলাডেলফিয়া ফিরে যাবেন কিন্তু বাকী আপনারা সকলে আমার সঙ্গে থাকবেন। কালকে সকলে আমার সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে নেবেন ; রাতে যদি আলাদা আলাদা হয়েও যাই, তাহলে ঠিক সময়ে একই সঙ্গে কাজে এগোতে পারব।'

গম্ভীর হয়ে তাঁরা মাথা নাড়েন। ভয় আর নেই, মুখ দৃঢ়, আশায় নয়—তবে এই উপলব্ধিতে যে হয় এই শেষ, নয় শুরু।

শেয়ালশিকারী বললেন, 'কর্নেল ক্যাডওয়ালেডার দয়া করে আমাদের কিছু ম্যাডীরা দিয়েছেন। বোতলগুলো ভেঙে আমরা সকলের স্বাস্থ্যপান করব।'

বড়দিনের দুপুরের মধ্যে সারা ছাউনিই কর্মব্যস্ত। যেখানে যেটুকু ছেঁড়া-খোঁড়া কম্বলের টুকরো পেয়েছে তাই দিয়ে নিজেদের জড়িয়ে মহাদেশীয় বাহিনী ত্রস্তব্যস্তভাবে সারি দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, অফিসারেরা তাদের বড় বড় গোল হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। সবাই পা ঠুকছে, নড়ছে-চড়ছে, একটু গরম থাকবার জন্যে হাতে তালি দিচ্ছে। তাদের নিশ্বাস ধোঁয়া হয়ে মিশছে বাতাসে।

আকাশে স্তরের পর স্তর মেঘ। ঠাণ্ডা ধূসর দিন। বাতাস থেমে গিয়েছে দেখে মনে হচ্ছে শীগগিরই তুষারপাত হবে। খুব শীত যদিও নয় তবু এই বেচারীদের পক্ষে যথেষ্ট ঠাণ্ডা। যত ছেঁড়া কম্বল গায়ে চাপানো সত্ত্বেও এরা অর্ধনগ্নই রয়েছে। এখনও এরা জানে না ঠিক কি করতে যাচ্ছে। শুধু জানে জার্মানদের সঙ্গে কিছু একটা ব্যাপার। বাহিনীর মধ্যে রাগে, ঘৃণায়, আকস্মিক ভয়ে ঐ 'জ্যাগার' কথাটা উঠছে পড়ছে। পেনসিলভানিয়া থেকে আসা দক্ষিণ জার্মানীর স্বেচ্ছাসেবীদের একটি দল প্রুশিয়ান শয়তানদের সামনাসামনি হতে হবে ভাবতেই সিঁটিয়ে উঠছে। ওদেরই ভয়ে তারা পালিয়েছে। বংশপরম্পরা ধরে এই ভয় তাদের মধ্যে জেঁকে বসেছে। নিউ ইংল্যাণ্ডারদের মনে পড়ছে সেই কর্কশ যুদ্ধের ধ্বনি, 'ইয়াংকি, ইয়াংকি।' এই বাহিনীর সাহস আর নেই, ভয়ে মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণাদায়ক, ভীতিপ্রদ দৃঢ়তা।

নক্সের কাছে হ্যামিলটন যেন টনিক। আঠারটি কামান ছেড়ে তিনি নড়বেন না। গোলন্দাজদের একটু ভাবতেও সময় দিচ্ছেন না। তাদের ব্যস্ত

রাখছেন ধ্রোয় চর্বি মাখাতে, ফুটো পরিষ্কার করতে, নিশানার স্ক্রুগুলো থেকে মরচে খসিয়ে ফেলতে আর গোলাবারুদের বস্তা সাবধানে বাঁধতে। নক্স সেই সময়ের কথা ভাবছেন, যে সময়টা বেশী দিন আগের নয়, যখন নিউ ইয়র্কে তাঁদের বাহিনীতে বিশ হাজার লোক, যখন কামানগুলোকে শয়ে শয়ে গোনা যেত। সব বদলেছে। তিনি নিজেও বদলেছেন। ছিলেন বইয়ের কারবারী, স্বপ্ন দেখতেন যেন ফ্র্যাঙ্কলিনের মতো প্রকাশক হবার। সে স্বপ্ন জীবন থেকে চলে গিয়েছে, পেছনে, এতদূরে যেন যে, আর ফিরে পাওয়াও যাবে না, ধরা-ছোঁয়াও যাবে না; আর তিনি বসে বসে, মনের আনন্দে বইয়ের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করবেন না, লক্ষ কপি বা দেড় লক্ষ কপি বিক্রী হবার আশায়। আরাম স্বাচ্ছন্দ্য তিনি এত বেশী ভালোবাসতেন, এত বেশী ভালোবাসতেন উপভোগের সামগ্রীগুলোকে। বিদেশী হালকা আসবাবপত্রে সাজানো বৈঠকখানা থাকবে বাড়িতে; ইংরেজ হাস্যরসিকদের লেখা শ্রেষ্ঠ বইগুলো; রাত্রে বিছানায় বউ নিয়ে শোবার নিটোল আনন্দ; চোখের সামনে ছেলেমেয়েরা ঘুরবে। ছাপার কালির সুসভ্য সুগন্ধ দিয়ে তাদের ভরে দেবেন। বয়েস তাঁর মোটে ছাব্বিশ কিন্তু মনে হচ্ছে যেন বুড়িয়ে গিয়েছেন। একটি ছাড়া আর সব উদ্দেশ্য জীবন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে—সেটি হল ভার্জিনিয়ানের সঙ্গে সেই নির্জন পথে একা দাঁড়িয়ে থাকা যে পথের কোন শেষ নেই।

নীল-চোখ রোগা-মুখ দুষ্টু ছেলের মতো হ্যামিলটন কামানগুলোর চার-দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এত কম সৈনিকের সংখ্যা দেখে দুঃখে শেয়ালশিকারী মার্সারকে বললেন, 'শুনেছ?'

'তেইশ শো বাহাত্তর।'

যেন আপনমনেই শেয়ালশিকারী বললেন, 'আর ক্যাডওয়্যালেডারের সঙ্গে আঠার শো।'

আর তারপর তিনি ও ক্ষুদ্রকায় স্কচম্যান পরস্পরের দিকে তাকালেন।

গোলন্দাজ বাহিনীর মোটাসোটা কর্নেলের কাছে গ্রীন এসে বললেন, 'কি রকম মনে হচ্ছে, হ্যারি?'

'জানি না। না ভাবাই ভালো। উনি যদি নরকে গিয়ে দৈত্য-পিশাচদের উস্কানি দিতে চান আমি ওঁর সঙ্গে সেখানেও যাব। অন্য কিছু করবার নেই। আছে কি?'

'মনে হয় না তো।'

'কটা বেজেছে ?'

'বারটা কুড়ি ।'

জবড়জং রূপোর ঘড়িটায় দম দিয়ে কাঁটাগুলো ঠিক করলেন নক্স ; অনুযোগ করে বললেন, 'তেমন কাজের নয় । ঘণ্টায় মিনিট পাঁচেক এদিক-ওদিক যায় ।'

'এগিয়ে যায় কি পেছিয়ে যায়, জানলেই তো হল ।'

'পেছিয়েই যায়—কখনও বেশী, কখনও কম ।'

'তুষারপাত হবে-না আশা করি,' গ্রীন মন্তব্য করেন ।

'হবে ।'

'ঐ জলের মধ্যে বেচারীদের ভাবতে আমার বিশ্রী লাগে ।'

নক্স ঘাড় ঝাঁকিয়ে, দাঁত বার করে হাসে ।

'কামান দাগতে শুরু করছ কখন ?'

'শীগগিরই ।'

'জলে কিন্তু বরফ রয়েছে,' গ্রীন বললেন ।

স্বীকার করে সখেদে বললেন নক্স, 'থাকবে । যা কিছু বিশ্রী সব আজকে থাকবে ।'

'সফল হও, হ্যারি ।'

উত্তরের পাহাড়ের থাক থেকে, অগভীর সব খাল থেকে ভেঙে ভেঙে এসে নদী ভরে যাচ্ছে । বড় বড় সব চাঙড় । অবশ্য খুব মোটা নয় কিন্তু ছুরির মতো ধারাল এই স্রোতের ঘূর্ণির মধ্যে । নিঃশ্বাস জমে সাদা হয়ে উঠছে সেই আবরণের মধ্যে দিয়ে এই দৃশ্য দেখে গ্লোভার খেদে মাথা নাড়লেন ।

গ্লস্টারের ক্যাপ্টেন পাণ্ডিকে বললেন, 'এটা আমার খারাপ লাগছে ।'

'লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে হবে ।'

'যদি তলাটা ধসে না যায় ।'

'সে যাই হোক, ভাঁটায় আমাদের পা বেশী হড়কাবে । মাইলখানেক উজানে একটা জায়গা আমাদের স্থির করা উচিত ।'

'খুব দেরী হয়ে গিয়েছে । জাহাজ-ঘাটা না হলে নৌকোয় কামান তোলা যাবে না । যতদূর পারি ততদূর করতে হবে ।'

একটা শক্ত-সামর্থ্য ভালো ঘোড়ায় চড়ে, সেই শীতে-কাঁপতে-থাকা জমে-যাওয়া সৈনিকশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটে চলেছেন, 'জেনারেল গ্রীন জেনারেল গ্রীন !'

তাঁর মস্ত ঢিলে কোটটা একেবারে ছেঁড়াখোঁড়া, তাঁর দীর্ঘ দেহ ঘিরে পতপত করছে। নাক একেবারে লাল, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কাশতে কাশতে হাঁচতে হাঁচতে ডাকলেন, 'জেনারেল গ্রীন!'

'কি হয়েছে, স্যর?'

'কটা বেজেছে?'

'একটা বেজে ঠিক আধ ঘণ্টা হয়েছে।'

'তাহলে, ন্যাথানিয়েল, আর অপেক্ষা করছ কেন? লোকগুলোকে পার ঘাটে নিয়ে যাও। দেখছ না, ওরা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে।'

'ভাবছিলাম আর একটু অপেক্ষা করব।'

'না, এখনি যাত্রা করাও।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দ্রুতবেগে তিনি দেখতে গেলেন নক্স আর হ্যামিলটন গোলন্দাজদের নিয়ে কি করছেন।

অর্ধেক জমে-যাওয়া লোকগুলোকে পা টেনে টেনে নদীর দিকে যেতে দেখে গ্রীনের কি কষ্ট যে হল। ঘণ্টাখানেক তারা ছিল ভয়াবহ প্রত্যাশায় কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ভয় দৃঢ়, একরোখা সঙ্কল্পে তেতে উঠেছে। তাদের আর সে ধৃষ্টতাও নেই, দম্ভও নেই। তাদের জায়গায় এসেছে স্তব্ধ বিষণ্ণ এক স্থির লক্ষ্য। অনেকেরই মনে হচ্ছে যে ক্ষণস্থায়ী বিপ্লবের এই হল বিয়োগান্ত পরিণতি; যুক্তি-তর্ক উবে গিয়েছে। তারা যাচ্ছে মরতে কেন না তারা মুক্তির জন্যে জীবন পণ করেছিল। এখন যখন সব চলে গিয়েছে তখন রয়ে গিয়েছে সেই পণটি।

চলতে চলতে তারা কথাও বলছে না, গানও করছে না, ভীষণ আগ্রহে জোরে চেপে ধরে আছে মস্ত মস্ত জবড়জং গাদা বন্দুকগুলো; বেশীর ভাগেরই চোখ সোজা সামনে নিবদ্ধ; জানত না যে তাদের টেনে টেনে পা ফেলার শব্দ প্রতিধ্বনিত হতেই থাকবে, মিলোবে না কোনদিন।

অর্থহীন পথে যেতে যেতে নিজের মনেই গ্রীন ভাবতে থাকেন, 'ওরা সাহসী। এই একটা কথার মতো কথা আমি মনে রাখব। ওরা পালালেও আমি চিরকাল মনে রাখব যে এই সময়টাতে তারা বীর বটে।'

একসময়ে গ্রীনকে নিজের সঙ্গেই নিজেকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল; তিনি ছিলেন কোয়েকার; আদেশ ছিল কঠিন, একেবারে সোজা: তুমি হত্যা করবে না। কিন্তু যদি কখনও সেই কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে পারে সেটা এই সময়ে—এই বড়দিনে—যে দিনে একটি মানুষ পৃথিবীতে এসেছিলেন শান্তির বাণী প্রচারের জন্যে, মানুষের প্রতি শুভবুদ্ধি প্রচারের জন্যে; এবং যদিও সে বাণী আজ অপ্রযোজ্য, অদ্ভুত বলে মনে হয় তবু গ্রীনের কাছে

আজ স্পষ্ট যে এই দিনটিকে তিনি কলুষিত করছেন না, তিনি আছেন এমন মানুষদের সঙ্গে যাদের শুভবুদ্ধি আছে। পাশাপাশি যে বিশৃঙ্খল ভীত বাহিনী চলেছে তিনিও তাদের মতোই তবু তাঁর মনে আজ আছে বিনয় আর গর্ববোধ।

জিনের একপাশে ঝুঁকে পড়ে শেয়ালশিকারী গ্রোভারকে জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন চলছে এখন সব?'

'যেমন আশা করা গিয়েছিল, স্যর।'

'নৌকোগুলো ঠিক আছে তো?'

গ্রোভার মাথা নাড়লেন কিন্তু আঙুল দিয়ে দেখালেন পাক-খাওয়া বরফের দলাগুলোকে।

'তুমি আমাদের ওপারে নিয়ে যেতে পারবে তো?'

গ্রোভার বললেন, 'পার হয়ে যাব; হয়ত যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে একটু বেশী সময় লাগবে, কিন্তু পার হয়ে যাব। কখন যাত্রা করবেন?'

দীর্ঘকায় মানুষটি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন।

'আগে মানুষগুলো, তারপর কামানগুলো?'

'একটু একটু করে প্রত্যেকটারই।' দীর্ঘ ব্যক্তিটি মুচকি হেসে বললেন।

সৈন্যশ্রেণীর পাশ দিয়ে উনি ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেন। ওরা ঠাণ্ডা মাটির ওপর গুটিশুটি মেরে বসে; ইনি পাশ দিয়ে যেতেই সাদা সাদা মুখগুলো পরপর, সেই গোধূলির আলোয় তাকায় তাঁর দিকে। ভাবলেন যে ওদের দুটো কথা বলা উচিত ছিল কিন্তু ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন যে কিছুতেই কিছু আসে যায় না আর। কথায় বলার মতো কিছু নেই। ভাবলেন ওদেরও কি তাঁরই মতো লাগছে—এই শেষ বেপরোয়া কার্যক্রমটির সর্বনাশা পাগলামিটা! ওরা কি ভাবছে তাঁর সম্পর্কে? ঘেন্না করছে না ভালোবাসছে, না কি ভেড়ার পালের মতো চালকের অনুসরণ করছে? সেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যেটার জন্যে এত ঝুঁকি নেওয়া—সেই মুক্তি জিনিসটা কি এতই বড়? এত যন্ত্রণা তার জন্যে সওয়া যায়, এত অনাহার, এত ঠাণ্ডা, এত খিদে?

বলতে পারেন না। একসময়ে অনেক কিছু সম্পর্কেই তিনি নিশ্চিত ছিলেন কিন্তু এখন তিনি নিশ্চিত কেবল যে অন্ধকার অদ্ভুত পথ দিয়ে তাঁকে যেতে হবে সেই পথটি সম্পর্কে। নিঃসঙ্গ তিনি। এই উতরোলের যে ফলই হোক না কেন, জয় হোক আর পরাজয়ই হোক, এই নিঃসঙ্গতার ক্ষতিপূরণ বা স্বস্তি কখনই আসবে না। তবু মনে অসুখ নেই। প্রায়ই তিনি অবশ্য

বলেছেন এবং লিখেছেন যে পৃথিবীতে কোন পুরস্কারের জন্যেই এই রকম ঘটনার মধ্যে দিয়ে আর তিনি যাবেন না, কিন্তু সেটা সম্বন্ধেও এখন আর নিশ্চয়তা নেই। একজন অভিজাত শেয়ালশিকারীর পক্ষে, আমেরিকার সেরা ধনী ব্যক্তির পক্ষে যেটা শেখা সবচেয়ে ভীষণ শক্ত সেইটি তিনি এবার শিখেছেন, কিন্তু একবার শিখে নিয়ে আর ভুলতে চাইতেন না। সবচেয়ে বেশী করে চাইতেন অন্যদের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা। এখন নিজেরই বিষণ্ণ হৃদয় থেকে সেইগুলো দান করে তিনি মনে অদ্ভুত শান্তি পেয়েছেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পদাতিকবাহিনী ঠাণ্ডায় স্থির হয়ে গুটিসুটি অপেক্ষা করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে; এইবার অবশেষে চলবার আদেশ এল। হাত-পা শীতে শক্ত হয়ে গিয়েছে, চলতে গেলে সন্ধিগুলো মটমট করছে। বন্দুকের গায়ে চাপড় মারছে তারা আর হাঁটু ঘষছে। হোঁচোট খেয়ে পড়ে গিয়ে আবার উঠছে, অন্ধকারে হাতড়ে নিচ্ছে পথ; মার্বেলহেডের লোকগুলো গাইছে "চটপট চল, তেড়ে চল।" তাই শুনে এরা অস্বস্তিকর হাসি হাসছে। এর ওর গায়ে ধাক্কা লাগে, কেউ বা পা পিছলে বরফগলা জলে পড়ে যায়; তাদের টেনে তোলা হলে তারা কাঁপতে কাঁপতে শাপমন্যি দেয়। পায়ের তলায় বরফ ভাঙার শব্দে আর কম-জোরী নৌকোগুলোর গায়ে অবিরাম ধপ ধপ শব্দে তাদের গলা কেমন কুঁকড়ে আসে তবু তারা থেমে থাকে না। কালির মতো ঐ অন্ধকারে তারা নিশ্চিত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

এত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও কাঁধে করে কামান নিয়ে যেতে গিয়ে ঘামতে থাকে, টেনে নিয়ে গিয়ে তোলে বজরায়। কেউ কেউ কোমর পর্যন্ত ঐ বরফজলে দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ নৌকোর ওপর নড়বড়ে কামানগুলোকে সামলাতে ব্যস্ত—ঐ বড় বড় অচেতন ধাতব পদার্থগুলো হঠাৎ কেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে! লোহার গোলা ক্যানেস্তারার ভারে অন্যেরা তখন টলমল টলমল করছে। স্থলবাসীদের কোমল অনভ্যস্ত হাতগুলো দেখে জেলেরা আর্তনাদ করছে, শাপমন্যি করছে, আবার বলেও দিচ্ছে, মিনতি করছে। নক্সের গমগম করা গলার আওয়াজ আর সব শব্দ স্তব্ধ করে দিয়ে গর্জন করে উঠছে আদেশে:

'এইখানটায় ধর! হ্যাঁ, ধরে থাক! কাঁধ লাগাও! উচ্ছন্নে যা সব! কাঁধ লাগাতে বলছি না!'

একটি বজরা উল্টে গিয়ে তিনটি ঘোড়া গেল জলে পড়ে। একটা আকস্মিক বিশৃঙ্খলা। জন্তুগুলো ভয়ে ভয়ে স্রোতের সঙ্গে যুঝছে, তীব্রস্বরে চিৎকার করছে। এই তিনটির মধ্যে সুলিভ্যানের ঘোড়াটি ছিল। তিনি

চিৎকার করে ওঠেন, 'ধর ওগুলোকে ধর। ভগবানের দোহাই, ওদের ডুবে মরতে দিও না।'

অন্ধকারে হোঁচোট খেতে খেতে শেয়ালশিকারী প্রাপ্তিহীন উত্ত্যক্ত গ্লোভারকে খুঁজছেন। নক্সের সঙ্গে দেখা হতেই তাঁর দুই কাঁধ ধরে জানতে চাইলেন, 'ভগবানের দোহাই, হ্যারি, মাঝরাত পার হয়ে গেছে। এখনও কেন কামানগুলো বোঝাই শেষ হল না?'

জলে ঘামে সিক্ত নক্স। কখনও শীত লাগছে, কখনও জ্বর-জ্বর ভাব। জুতোর মধ্যে বরফ-গলা কাদা। টুপি কোথায় চলে গেছে। কোট দু ফাঁক হয়ে গিয়েছে পিঠের ওপর দিয়ে। মিনতিতে তাকালেন, দীর্ঘ লোকটির দিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'যতখানি পারি করছি, স্যর। তার চেয়ে বেশী তো আর পারব না। এই বরফেই যত ঝামেলা। নৌকোগুলো গন্তব্যস্থলে যেতে পারছে না। ভাঁটায় ভেসে যেতে হচ্ছে, আবার টেনে আনতে হচ্ছে। চেষ্টা করছি গোলাবারুদ ওপারে নিয়ে যাবার। যদি হঠাৎ কামানগুলো ব্যবহার করার দরকার হয়ে পড়ে।'

'বেশ তো, নিয়ে যাও ওপারে, হ্যারি। নিয়ে যাও। আর গ্লোভারকে ডাক। আমার গলা গিয়েছে। জোরে ডাক।'

ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে আরম্ভ করলেন নক্স। কিন্তু ফের যখন ফিরে দাঁড়ালেন তখন দেখেন ভার্জিনিয়ান আর সেখানে নেই।

ভোর দুটোর সময় বাহিনীর বেশীর ভাগ সৈনিককেই নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া হয়ে গিয়েছে। দৈত্যের মতো কাজ করে ঐ জেলেরা এবারেও অসম্ভবকে সম্ভব করল—অন্ধকার রাত্রিতে তারা বাহিনী এবং কামান, বরফ আর স্রোত পার করে ট্রেনটনে জার্মানদের ছাউনি থেকে ন মাইল দূরে, ওপারে এক জায়গায় পৌঁছে দিল। গ্লোভার খবর দিতে এসে দেখেন শেয়ালশিকারী নক্স আর গ্রীনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে।

গ্লোভার বললেন, 'আমার মনে হয় আপনাদের এখন ওপারে যাওয়াই শ্রেয়। বিপদের বড় ঝুঁকিটা কেটে গিয়েছে।'

ওয়াশিংটন মাথা নেড়ে সায় দিতে গ্রীন তাঁর বাহু ধরে নৌকোয় উঠতে সাহায্য করতে এলেন কিন্তু তিনি একপাশে সরে গিয়ে বললেন, 'তুমি উঠে পড়, হ্যারি। তোমরা ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলে আমি বেশী নিরাপদ বোধ করি।'

নক্সের পক্ষে এর প্রতিক্রিয়াটি হল হিস্টিরিয়ার মতো। তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে নৌকোয় লাফিয়ে গিয়ে পড়লেন—দুই গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে

পড়ছে। তিনি বসলে গ্রীন এলেন এবং তারপর গ্রোভারের অকম্পিত হাতের সাহায্যে ভার্জিনিয়ান নৌকোয় পা দিলেন। কোথায় বসবেন তাকিয়ে দেখতে দেখতে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে গোলন্দাজবাহিনীর কর্নেলকে খোঁচা দিয়ে বললেন, 'তোমার ভারটা একটু ঘুরিয়ে নাও, হ্যারি। নৌকোখানা ঠিক হোক।'

জেলেরা হাসতে হাসতে তীর থেকে ঠেলে দিল নৌকো—দীর্ঘকায় ভার্জিনীয় জমিদার আর তাদের মধ্যে যে প্রাচীরের ব্যবধানটা ছিল সেটা একবার যেন ভাঙল। আর নক্স, তখনও হাসিতে এদিকে ওদিকে দুলতে দুলতে মনের মধ্যে পেলেন অপূর্ব সুখ, বোধ করলেন এতখানি গর্ব। কেন না, ঠিক তাঁর পাশেই একই আসনে, একেবারে কাছাকাছি বসে রয়েছেন সেই লোকটি যাঁকে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন। তিনি তাকান ওয়াশিংটনের দিকে, দেখতে পান ওয়াশিংটনের ধূসর চোখ দুটি অন্ধকার তন্নতন্ন করে দেখছে; আর নক্স বুঝলেন, গ্রীনও, অসহ্য আনন্দে বুঝলেন যে, এইটাই শেষ নয় যে তাঁদের মতো জনেদের শেষ বলে কিছু নেই—শুধু আছে নব নব আরম্ভ।

পরে একটি কথা

(সংক্ষেপিত)

সব বই শেষ পাতায় শেষ হয়; এখানি তা হচ্ছে না, কেন না, সেই রক্ত-ঝরা পাগুলোর ট্রেনটনের দিকে এগিয়ে চলার ধ্বনি ধীরে ধীরে স্ফীত হয়ে উঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল সারা বিশ্বে। দিনটি বৃথা গেল না, যাবে না; ভগবানের দয়ায় চিরকাল বেঁচে থাকবে।...

আঠার শতকের শেষেও সত্য ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর ছিল। ইতিহাস ছিল গালগল্প, উপদেশ আর মিথ্যার পশরা। কিন্তু আজ মোটামুটি ইতিহাস জেনে নিউ ইয়র্ক থেকে এই পশ্চাদপসরণের কাহিনী লিখতে বসেছি। এতে একটিও কল্পিত চরিত্র নেই। যাঁরা তখন রক্তমাংসে থেকে এই বৃহৎ কাণ্ডটি ঘটিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই এই এই নামেই তখন পরিচিত ছিলেন। দেড়শো বছরের ধুলো ঝেড়ে আজ তাঁদের সত্যরূপ দেখাবার চেষ্টা করেছি। অনেক গ্রন্থই দেখতে হয়েছে। অনেক জীবনী ওয়াশিংটনের; তবে বিশেষ উল্লেখ না করে পারছি না রুপার্ট হিউজেসের অপূর্ব জীবনীখানির।

সমাপ্ত